পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ স্বরূপ সন্ধান

জয়নাল আবেদীন

পার্বত্য চট্টগ্রাম : স্বরূপ সন্ধান

জয়নাল আবেদীন

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ স্বরূপ সন্ধান

Chittagong Hill Tracts : In Search of Reality
By *Zainal Abedin*

প্রকাশিকা ঃ
আমেনা বেগম

প্রথম প্রকাশ ঃ
স্বাধীনতা দিবস, ১৯৯৭

প্রচ্ছদ অংকনে ঃ
আবদুল্লাহ জুবাইর

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
কমপ্যাক্ট কম্পিউটার সেন্টার
চৌরঙ্গী মার্কেট, ৯৫ বেগম রোকেয়া স্মরণী
মিরপুর, ঢাকা।

মুদ্রণ ঃ
চৌকস প্রিন্টার্স লিঃ
১৩১, ডিআইটি এক্সটেন্সন রোড, ঢাকা-১০০০।

পরিবেশক ঃ
বুক মিউজিয়াম
৬/এ, ৪/১-মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

বিনিময় ঃ একশত চল্লিশ টাকা
Price : Outside Bangladesh : US $ 8.00 only.

আমার নবতিপর মাকে--

যিনি আমাকে নির্ভীক, স্পষ্টভাষী এবং স্বদেশপ্রেমী হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

যা লেখা আছে

মুখবন্ধ

সুইডেনের বিশিষ্ট নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ আর্লিং বিজল (Earling Bjol) ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রের (Rim States) নিরাপত্তা সমস্যার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বিষয়টিকে হাঙ্গরের হিংস্রতা-সজ্জাত আক্রমণ এবং তা হতে ক্ষুদ্রাকৃতির সামুদ্রিক মৎস্য 'পাইলট ফিস' এর আত্মরক্ষার কৌশলের সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে ঃ

"The Rim States" Problem is like the problem of 'Pilot fish' how to keep close to the shark without being eaten".

(ভাবানুবাদ ঃ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের সমস্যা 'পাইলট ফিস' (মাছ) এর মতোই - হাঙ্গরের কাছাকাছি থেকেও কিভাবে অভক্ষিত থাকা যায়।)

বাংলাদেশের অবস্থা সে নিরীহ ও ক্ষুদ্র অথচ কৌশলী পাইলট ফিসের মতো। সে হাঙ্গর-সদৃশ ভারতের নাগালের মধ্যে থেকেও আত্মরক্ষা করে চলেছে।

আসলে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ ইতিহাসের অধিকাংশ সময় জুড়েই উঠতি শক্তির অধিকারী বৃহত্তর প্রতিবেশীর আগ্রাসী কোপানলে পতিত হয়েছে। আঠার, ঊনিশ এবং বিশ শতকে ইউরোপের ছোট ছোট রাজ্যগুলোর স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখন্ডতা, তাদের বৃহত্তর প্রতিবেশীদের আগ্রাসী আক্রমণে বার বার বিপর্যস্ত হয়েছিল।

ইহা পোল্যান্ডের দুর্ভাগ্যই যে, সে তৎকালীন ইউরোপের তিন তিনটি বৃহৎ শক্তি – রাশিয়া, পর্শিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার প্রতিবেশী ছিল। এই কারণেই এক শতাব্দীর মধ্যে তিন তিনবার বিভক্তির ভাগ্যলিপি বরণ করে পোল্যান্ড বৃহত্তর দেশের প্রতিবেশী হবার চড়ামূল্য পরিশোধ করে। বেলজিয়াম দুই বৃহৎ দেশ জার্মানী ও ফ্রান্সের প্রতিবেশী হওয়ায় বার বার আক্রমণ ও দখলদারিত্বের সম্মুখীন হয়। মেক্সিকো'র ভূখন্ডের বিরাট অংশ তার উত্তর সীমান্তের দৈত্য-সদৃশ প্রতিবেশী গিলে ফেলে। রাশিয়ার জার সম্রাটরা মুসলিম অধ্যুষিত পুরো মধ্য এশিয়া দখল করে নেয়। রাশিয়ার কম্যুনিস্ট সংস্করণ সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ক্ষুদ্রতর প্রতিবেশী এস্তোনিয়া, লিথুনিয়া ও ল্যাটভিয়াকে গলধকরণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব ফিনল্যান্ডের ১২%, পোল্যান্ডের অংশ বিশেষ, বেসারাবিয়া (রুমানিয়া থেকে) এবং রুথনিয়া (চেকোশ্লোভাকিয়া হতে) সোভিয়েত ইউনিয়নের উদরে

চলে যায়। বলাবহুল্য, এ ধরণের বলপূর্বক সংযুক্তি ও দখলদারিত্ব যুদ্ধোত্তর শান্তি প্রক্রিয়ায় স্বীকৃতি পায়। সোভিয়েত একনায়ক স্ট্যালিন লজ্জার মাথা খেয়ে তো বলেই ফেললেন, তাঁর দেশের প্রতিরক্ষা মজবুত ও নিশ্চিত করতে ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর ভূখন্ড তাঁর চাই-ই।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর (১৯৪৫) কাল হতে আজ পর্যন্ত, এ ক্ষুদ্রতর সময়ের মধ্যে – তৃতীয় বিশ্বের বৃহৎ দেশগুলো তাদের ক্ষুদ্রতর প্রতিবেশীদের গিলে ফেলার কিংবা গিলতে চেষ্টা করার অসংখ্য নজির স্থাপন করেছে। ১৯৫০-৫১ সনে চীনের তিব্বত আক্রমণ; ১৯৪৭-৪৯ সনে ভারতের কাশ্মীর এবং প্রায় একই সময়ে জুনাগড় ও হায়দারাবাদ দখল; ১৯৬১ সনে গোয়া আত্মীকরণ এবং ১৯৭৪ সনে ভারতের সাথে সিকিমের মিশে যাবার পরিবেশ সৃষ্টি; ১৯৭৫-৭৬ সনে ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক পূর্ব তিমুর দখল; ১৯৭৮-৭৯ সনে ভিয়েতনামের কম্বোডিয়া অভিযান; ১৯৭৯ সনে ভিয়েতনামকে চীনের 'শিক্ষাদান' প্রভৃতি প্রমাণ করে যে, তৃতীয় বিশ্বের বৃহত্তর দেশ এবং তৃতীয় বিশ্ব-বহির্ভূত শক্তিধর দেশগুলো মূলতঃ একই গুরুর শিষ্য, তারা যেন একই আগ্রাসী মানসিকতা হতে উত্থিত।

ইউরোপের অতীত ইতিহাসের অনুকরণে, ভারত তার ক্ষুদ্রতর প্রতিবেশীদের গ্রাস করার প্রক্রিয়া হিসেবে ইতোমধ্যেই সিকিমের পৃথক স্বত্বা ও অস্তিত্বের বিলোপ ঘটিয়েছে। ভূটান-নেপাল অনেকটা ভারত-নির্ভর নামমাত্র স্বাধীনতা নিয়ে টিকে আছে। শ্রীলংকা ভারতীয় কূটনীতির থাবায় ক্ষত-বিক্ষত।

একই প্রক্রিয়ায় ভারত বাংলাদেশকেও অতি দ্রুত পঙ্গু ও দুর্বল করতঃ গ্রাস করতে চায় বলে মনে হয়। বেরুবাড়ীর বিনিময়ে চুক্তি মোতাবেক তিন বিঘা করিডোরের সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরে অস্বীকৃতি, তালপট্টি দখল, গঙ্গাসহ অনেকগুলি নদীপ্রবাহ বন্ধ করে বাংলাদেশকে পানি-বঞ্চিত করার কৌশল প্রভৃতির মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশকে ঘায়েল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় চক্রান্তের সর্বাধিক প্রকট ফসল হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান সংকট।

নিজদেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ৭টি রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলককে নির্মমভাবে দমনকারী ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী নামক সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে, এ কথা এখন সর্বজনবিদিত। দরিদ্র বাংলাদেশের সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশোদ্রোহী উপজাতীয়দের নেপথ্য শক্তি যে ভারত, সময়ের সাহসী গবেষক-সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা জনাব জয়নাল আবেদীন "পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ স্বরূপ সন্ধান" শীর্ষক গ্রন্থে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করে তা-ই প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ প্রসংগে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সংক্ষিপ্ত

ইতিহাস, বিভিন্ন বহিরাগত উপজাতীয়দের বসতি স্থাপন, বাঙ্গালীদের দুর্বিসহ জীবন যাপন, ৫-দফার আবরণে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চক্রান্ত, সর্বোপরি ভারতীয় স্বার্থ নির্ধারণসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় প্রতিটি বিষয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও আলোকপাতে সচেষ্ট হয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান সমস্যা সম্পর্কে লেখক এমন সব তথ্য পরিবেশন করেছেন যা দেশবাসীকে জ্ঞাত করার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

লেখকের যুক্তি ও তথ্য দেখে, সর্বোপরি বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদ যে সহজেই লয়প্রাপ্ত হয়না -- এ সত্য মনে রেখে আমার এ প্রতীতী জন্মেছে যে, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আর কোন ধরনের 'ছাড়' দেয়া হলে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতা সুনিশ্চিত সংকটের সম্মুখীন হবে।

সুপরিকল্পিত উপায়ে এ সমস্যাটিকে দীর্ঘদিন যাবত ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। বর্তমান সরকার সম্মানজনক সমাধানের যে উদ্যোগ নিয়েছেন তার সাফল্য কামনা করেও বলতে চাই, আলোচনার পাশাপাশি অবিলম্বে উপজাতীয়দের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে বাঙ্গালী বসতি পুনরারম্ভের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনার কারণে সরকার অনির্দিষ্টকাল ধরে নিজ দেশের মাটিতে বাঙ্গালীদের বসতি স্থাপন বন্ধ রাখার অর্থাৎ তাদের শাসনতান্ত্রিক অধিকার স্থগিত রাখার যে যুক্তি দেখাচ্ছেন কোনক্রমেই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বক্ষ্যমান গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং সর্বমহলের জ্ঞাতার্থে এ ধরণের একটি তথ্য-সমৃদ্ধ ও যুক্তি-নির্ভর বাংলা গ্রন্থের অভাব আমরা দীর্ঘদিন যাবত অনুভব করছি। জনাব আবেদীনের প্রয়াস সে অভাব পূরণে সহায়ক হবে বলে মনে করি। আমার বিশ্বাস গ্রন্থটি সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। ■

ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামান
রাষ্টবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা, বাংলাদেশ।
স্বাধীনতা দিবস, ১৯৯৭

আমার কথা

সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যে ভরা বাংলাদেশ। সহজ-সরল, অতিথিপরায়ণ, ভবিষ্যত সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন - প্রকৃতির মতো নিরুদ্বিগ্নই - ছিল এ জনপদের অধিবাসীরা। প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে এর সম্পদ ও সৌন্দর্যের আকর্ষণে, স্থানীয় জনগণের বন্ধুসুলভ আচরণে মুগ্ধ হয়ে ভিনদেশী বহু জাতি-উপজাতি এদেশে এসেছে। অনেকেই এদেশের সম্পদ নিয়ে ফিরে গেছে স্বদেশে। আবার কেউ কেউ ঠাঁই পেতেছে এ বাসভূমে। এ ভাবেই ক্ষুদ্র এ ভূমি বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

এ ধরণের পরিস্থিতি বিশ্বের প্রায় সব দেশেই কমবেশী হয়েছে। এ কারণে বিশ্বে কোন দেশের সমুদয় অধিবাসীই অভিন্ন রক্ত, গোষ্ঠী, ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি, আর অভ্যাসের অধিকারী নয়। সারা বিশ্বের সবদেশেই ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৃতাত্তিক গোষ্ঠী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বসবাস করছে। সারা বিশ্বের কোন দেশই এখন আর সম্পূর্ণরূপে একক ভাষাভাষী এবং একই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠির বাসভূমি নয়। সবদেশেই ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতি, উপজাতি, উপ-উপজাতি রয়েছে। উপজাতীয় কিংবা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হবার মানে এই নয় যে, দেশকে বিভক্ত করে তাদেরকে দেশের অংশ বিশেষ দিয়ে দিতে হবে। তাই কোন রাষ্ট্রেই উপজাতীয় সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ, প্রথা রক্ষার নামে (যেগুলো বাংলাদেশে সর্বোত্তমভাবে রক্ষিত আছে) আঞ্চলিক অখন্ডতা ও সার্ভৌমত্বকে দূর্বল করে তথাকথিত স্বায়ত্বশাসন প্রদানের আবরণে বিচ্ছিন্নতার পথ প্রশস্থ করেনি।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি রাজ্যে ২১৭টি উপজাতি জনগোষ্ঠী বসবাস করে। এই সাতটি রাজ্যেই ব্যাপক সংখ্যক অউপজাতীয় ভারতীয় বসবাস করছে। ত্রিপুরাতে তো এককালের সংখ্যাগুরু উপজাতীয়রা এখন নির্মম সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। ভারত এ সব রাজ্যকে এমন ধরণের কাগুজে স্বায়ত্বশাসন দিয়েছে যাতে ভারতের আঞ্চলিক অখন্ডতা কোনভাবেই বিপন্ন হবার সম্ভাবনা না থাকে।

এই ৭টি রাজ্যের কোনটিই ঐতিহাসিকভাবে ভারতীয় ভূ-খন্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। এবং এ অঞ্চল ঐতিহাসিকভাবেই ছিল উপজাতি অধ্যুষিত, যাদের অধিকাংশই ঐ অঞ্চলের ভূমিজ সন্তান। এতদসত্ত্বেও শাসনতান্ত্রিকভাবে

বহুকেন্দ্রিক রাষ্ট্র ভারত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কোন রাজ্যই উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত নয়।

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশর অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা কোনভাবেই সেখানে দখলদার শক্তি নেই। সেখানে বসবাসকারী ১৩টি উপজাতির সবাই বহিরাগত ও অভিবাসিত। সর্বোপরি, দরিদ্র বাংলাদেশের মাপকাঠিতে ঐ অঞ্চলের উপজাতীয় জনগণ কোনভাবেই শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত, কিংবা উপেক্ষিত নয়, বরং সুবিধাভোগী ও অগ্রসর। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে আরো ১৬টি উপজাতীয় জনগোষ্ঠী রয়েছে। তারা কখনোই শোষণ-বঞ্চনার কিংবা ধর্মীয় কারণে নিগৃহীত হবার অভিযোগ তোলেনি।

অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে এসব মিথ্যে অভিযোগ আসছে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতীয়দের মধ্য হতে যারা সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত। সেখানকার উপজাতীয়দের নাম ভাঙ্গিয়ে মূলতঃ চাকমা উপজাতিভুক্ত কতিপয় বিদেশী চর কেবলমাত্র উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জন্য স্বায়ত্বশাসনের আবরণে চাকমা প্রভাবিত পৃথক রাজ্য 'জুম্মল্যান্ড' প্রতিষ্ঠার বায়না ধরেছে।

এদেশের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সর্বোপরি, আঞ্চলিক অখন্ডতা নস্যাৎ করতঃ এ দেশকে গ্রাস করার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চাকমা সন্ত্রাসীদেরকে দিয়ে এ আবদার উঠানো হয়েছে। আজ আর এই সত্য গোপন নেই কারা সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে এ অঘোষিত যুদ্ধ বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে শান্তিবাহিনী নামক দেশোদ্রোহী সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে।

অথচ সে নেপথ্য শক্তি ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে প্রায় ৪ লাখ নিয়মিত সৈন্য মোতায়েন করে স্বাধীনতাকামীদের বাগে আনতে ব্যর্থ হয়ে আমাদের ভূমি ব্যবহারের প্রস্তাব রেখেছে। ট্রানজিট, এশিয়ান হাইওয়ে, উপ-আঞ্চলিক জোট সবকিছুর একটি-ই উদ্দেশ্য - 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বিদ্রোহ দমনের জন্য বাংলাদেশী ভূখন্ড চাই।' অথচ সেই ভারত তার ভূমিতে চাকমা সন্ত্রাসীদের আশ্রয় ও ট্রেনিং দিচ্ছে, তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে; আর তাদেরকে এমন ধরণের 'ছাড়' দেবার জন্য আমাদেরকে প্ররোচিত করছে যাতে বাংলাদেশ আপনাআপনিই খন্ডিত হয়ে যায়।

আলোচ্য গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এসব চক্রের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। বিশেষতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম-সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব ভারত উপজাতি-অধ্যুষিত হওয়ায়, ঐ অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবত স্বাধীনতা যুদ্ধ অব্যাহত থাকায়, সর্বোপরি

ভারত স্বয়ং শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীদের মূলশক্তি হওয়ায় এ গ্রন্থে অপরিহার্য কারণে ভারত প্রসংগ বারবার এসেছে।

"পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ স্বরূপ সন্ধান" পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় প্রতিটি সমস্যার অতি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বিশেষ। আমার বিশ্বাস এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আলোচিত প্রতিটি বিষয় আরো গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণার দাবী রাখে, যা কয়েক খন্ড বৃহদাকার গ্রন্থের অবতারণা করবে। সে ধরণের পরিবেশ ও সুযোগের প্রতীক্ষা না করে সীমিত মেধা ও শ্রমের ফসল হিসেবে অতি দ্রুততার সাথে অনেকটা অসমাপ্ত অবস্থায় এ গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করছে। এ অনিচ্ছাকৃত অসমাপ্ততার জন্য আন্তরিক দুঃখবোধ আমাকে পীড়া দেবে অনেক দিন। তথাপি শান্তনা, মন্দের ভাল কিছুতো করা হলো, কিছু কথা দেশবাসী, বিশেষতঃ পার্বত্য অঞ্চলের নিরীহ জনগণ তো শুনতে পাবেন। বিবেকবোধ বলতে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে বিপথগামী এবং তাদের সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীরা এই গ্রন্থ পাঠান্তে চোরাবালীতে নিমজ্জিত হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে আসবে।

এ বিপথগামীরা দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র .৪৫% (দশমিক চার পাঁচ) জনগোষ্ঠীর অতি সামান্য অংশ হওয়া সত্ত্বেও দেশের মোট আয়তনের এক-দশমাংশের সমন্বয়ে অবাস্তব ও কল্পনাপ্রসূত 'জুম্মল্যান্ড' প্রতিষ্ঠার আবরণে বাস্তবে বিদেশীদের চর সেজে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশেই উপজাতীয় অধিবাসী রয়েছে। জনসংহতি সমিতির কর্তাব্যক্তি কিংবা তাদের শুভানুধ্যায়ীরা এমন একটি দেশের নাম বলুন যেখানে .৪৫% উপজাতির জন্য দেশের মোট ভূ-খন্ডের ১০% স্বায়ত্বশাসনের নামে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

যেকোন বিবেকবান মানুষের বিবেচনায় জনসংহতি সমিতি তথাকথিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের যে দাবী করছে তার অন্য নাম স্বাধীনতা। ৫ দফা দাবীর আবরণে ৪৭টি বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবী উত্থাপন না করে সরাসরি স্বাধীনতার কথা বললেই তাদের সৎসাহস, সততা ও অকপটতার প্রমাণ মিলতো। সন্ত্রাসীদের কপটতা এখানেই শেষ নয়। তারা তাদের জাতি সত্ত্বার সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাচ্ছে। অথচ তারা কোন জাতি নয়। তাদের দাদা-প্রভু ব্রিটিশ সরকারই তাদেরকে উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত করে গেছে এবং তাদের পূর্ব-পুরুষরাই তা মেনে নিয়েছিলেন। চাকমা-লারমাদের চৌদ্দপুরুষরা কখনই আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের নামে আশ্রয়প্রাপ্ত দেশের (বাংলাদেশের) বিরুদ্ধে যুদ্ধেও নামেনি। আমাদের সম্পদ দিয়ে জঙ্গলবাসী লারমাদের শিক্ষিত ও সম্পদশালী করার ফলেই আজ তারা দেশদ্রোহীতায় নেমেছে। বিশ্বাসঘাতক কাকে বলে ?

আমাদের নীতি নির্ধারকরা এসব বিদ্রোহীদের শক্তহাতে দমন না করে নমনীয় পদক্ষেপ নিয়ে একের পর এক ছাড় দিয়ে যাচ্ছেন। দেশোদ্রোহী খুনীদের হাতে অস্ত্র রেখে তাদের সাথে সংলাপে বসছেন। খুনীদের শাস্তি না দিয়ে তাদের সাথে সংলাপে বসার মানে তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে বৈধ এবং পার্বত্য চট্রগ্রামে আমাদের অবস্থানকে অবৈধ বলে স্বীকার করা। জানিনা কতখানি মূল্য দিয়ে বিদেশী চরদের খুশী করতে সরকার রাজী হবেন। বিদেশী ঋণের ভারে ন্যুজ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত, জনসংখ্যার চাপে মুহ্যমান হত-দরিদ্র বাংলাদেশ তার অন্যান্য অঞ্চলকে বঞ্চিত রেখে পার্বত্য চট্রগ্রামের উপজাতীয়দের পেছনে যে অর্থ ঢালছেন, তাতে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা উৎসাহবোধ করছে। তাদের মনে এই প্রতীতী জন্মেছে যে, যতো বেশী চাপ সৃষ্টি করা যাবে, ততো ছাড় পাওয়া যাবে। শেখ মুজিব ও জিয়া পরবর্তী প্রতিটি সরকার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পার্বত্য চট্রগ্রাম প্রশ্নে নমনীয় তথা আত্মঘাতী 'ছাড়' দিয়ে চলেছেন।

এরশাদ এবং বিএনপি সরকারের মতো বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারও একই কায়দায় জনসংহতি সমিতির সাথে সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকারের প্রত্যাশা শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছা যাবে। কিন্তু বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন অধ্যয়ন করে আমার এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, বিদেশী চর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের 'ছাড়' দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের অবস্থানকে দুর্বলই করা হবে। আজকের 'ছাড়' হবে আগামী দিনের বিচ্ছিন্নতার সড়ক। আজকের জনসংহতি সমিতি - শান্তিবাহিনী আগামীকাল নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করবে। সুতরাং 'ছাড়' নয় - সাহসই হোক আমাদের পাথেয়।

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের একটিই ভরসা - তারা ভারতের চর। আর আমাদের সরকারের একটাই ভীতি -বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ভারতের আশীর্বাদপ্রাপ্ত। এই ভীতিই আমাদের নীতি নির্ধারকদের সম্ভবত সর্বদা তাড়িয়ে বেড়ায় বিধায় তারা শ্রীলংকা কিংবা ভারতের অনুকরণে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নির্মূলকরণে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণে ইতস্তত করছেন।

এ গ্রন্থ রচনায় কোন ভীতিই আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ১৯৭১ সনে যে প্রেরণা ও দেশপ্রেম নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, তা এখন আমার হৃদয়ে শতগুণ শক্তি নিয়ে দেদীপ্যমান। তাই সত্য কথা তিক্ত হলেও বলতে অভ্যস্থ। কোনরূপ রাখ-ঢাকে আমি বিশ্বাস করিনা। বিশেষতঃ স্বদেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা (যার জন্য আমি স্বয়ং লড়েছি) যেখনে বিদেশী হায়েনার হিংস্রও আগ্রাসী দৃষ্টির শিকার সেখানে রাখ-ঢাক কেবল আপোষকামিতা-

ই নয়, বরং দায়িত্বহীনতা, ভীরুতা, এমনকি দেশোদ্রোহীতার শামিল। আমি সে স্তরে নামতে পারিনা। তাই প্রতিপক্ষের মুখোশ উন্মোচনে আমি কার্পণ্য করিনি।

এখানে অকপটে বলে রাখা ভাল যে, এ গ্রন্থে চাকমা সন্ত্রাসী, দেশদ্রোহী, বিচ্ছিন্নতাবাদী বলতে কেবলমাত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী-সন্ত্রাসের সাথে সংশ্লিষ্ট জনসংহতি সমিতি, এর সামরিক শাখা - শান্তিবাহিনী এবং অন্যান্য সহযোগী গণসংগঠন সমূহকে বুঝানো হয়েছে। চলমান সমস্যার উদ্যোক্তা, ধারক ও বাহক প্রধানতঃ চাকমা উপজাতিভুক্ত কিছু উচ্চাভিলাসী বিপথগামী। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে যা কিছু লেখা হয়েছে, তাদের অধিকাংশতেই সমস্যাটিকে চাকমা সমস্যা হিসেবে দেখানো হয়েছে। আমিও সে ধারা অনুসরণ করেছি। স্বীকার করা উত্তম যে, বক্তব্য ব্যাখ্যার সুবিধার্থে একই প্রসঙ্গ কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিকবার এসেছে। এ ধরণের ইচ্ছাকৃত পুনরুক্তি যদি পাঠকের মনে সামান্যতম বিরক্তিরও উদ্রেক করে তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

এ গ্রন্থের অনেকগুলো বিষয়ই ভিন্নভাবে দৈনিক মিল্লাত, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক ইনকিলাব এবং সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান-এ আমার নামে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐসব নিবন্ধ পাঠান্তে দেশের বিভিন্নস্থান, বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রাম, হতে এ বিষয়ে আরো বিস্তৃত আকারে কাজ করার সনির্বন্ধ অনুরোধ আসে। বক্ষ্যমান রচনা ঐ অনুরোধেরই ফসল। এজন্য আমি আমার সুহৃদ পাঠক ও উল্লেখিত পত্রিকাসমূহের কাছে কৃতজ্ঞ।

যেসব গবেষক-লেখকের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ আমাকে সহায়তা করেছে তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ গ্রন্থ রচনার প্রাক্কালে সরজমিন তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরকালীন যেসব সুহৃদ দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গ আমাকে নিরাপদ আশ্রয়, উষ্ণ আতিথেয়তা ও মূল্যবান তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের কাছে আমি ঋণী। বিশেষতঃ প্রখ্যাত রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামান এ গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখে দিয়ে এর মর্যাদা ও গুরুত্ব যারপরনাই বৃদ্ধি করেছেন। এ মহান পন্ডিতের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। এ গ্রন্থের পান্ডুলিপি পুনর্লিখনে, ভুল সংশোধনে, বিশেষত সমৃদ্ধকরণে যেসব শুভানুধ্যায়ী বিশেষতঃ সর্বজনাব কবি-সাংবাদিক আবদুল হাই শিকদার, মুসলিম জাহান সম্পাদক মোস্তফা মঈন উদ্দীন খান, মুনশী করিম জামান, পার্বত্য গণপরিষদের চেয়ারম্যান চৌধুরী আলমগীর, অধ্যাপক ওসমান গণি, অধ্যাপক এম.এ. বার্ণিক, অস্ট্রেলীয় দূতাবাসের সাবেক তথ্য অফিসার আবদুল মতিন, অধ্যাপক আবদুল ওয়াহেদ, মোঃ জিয়াউল্লাহ্, ফাতেমা শাহাব, গোলাম কাদের, আনোয়ার হোসেন চৌধুরী এবং আমার পরিবারের সদস্যবর্গের কাছে ভীষণভাবে ঋণী।

এ বইয়ের সামগ্রিক সফলতা ও প্রশংসা (যদি কিছু থেকে থাকে) মহান আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাকে বিনিদ্র রজনী কাটানোর অপরিসীম ধৈর্য্য প্রদান করেছেন। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার জন্য আমার প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার অভাব ছিলনা, হয়তো সীমাবদ্ধতা ছিল। সব সীমাবদ্ধতা, অলসংলগ্নতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, সমালোচনা একান্তভাবেই আমার।

এ গ্রন্থ পাঠান্তে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপথগামীরা যদি তাদের ভ্রান্তি অনুধাবন করেন, সাধারণ উপজাতীয়রা জুম্মল্যান্ড আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য ও চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ হন, নীতি-নির্ধারকরা কোন না কোন ভাবে উপকৃত হন, সর্বোপরি, সরকার ও দেশবাসী দেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষায় সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণে অনমনীয় ও তৎপর হন, তবেই আমার এ সামান্য শ্রম সার্থকতা খুঁজে পাবে।

আল্লাহ হাফেজ

মিরপুর, ঢাকা
স্বাধীনতা দিবস, ১৯৯৭

সবিনয় নিবেদনে
জয়নাল আবেদীন

পার্বত্য চট্টগ্রাম

- সাধারণ পরিচিতি
- অর্থনৈতিক সম্ভাবনা

সাধারণ পরিচিতি

বাংলাদেশের দক্ষিন-পূর্ব সীমান্তে পাহাড়, নদী, মানবসৃষ্ট হ্রদ, ক্ষুদ্র ঝরণা, তরু-লতা ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ ভূ-খন্ডটি বর্তমানে বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার সমন্বয়ে গঠিত হলেও এর জনপ্রিয় নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম। ১৮৬০ সালের আগে ইহা চট্টগ্রাম জেলার অংশ ছিল। একেবারে প্রাচীনকালে চট্টগ্রামের অংশ হিসেবেই ইহা বাংলার হরিকেল জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বাংলাদেশের মানচিত্রের ওপর চোখ রাখলে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর অক্ষাংশের ২১°২৫′ থেকে ২৩°৪৫′ ডিগ্রীতে এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ৯১°৪৫′ থেকে ৯২°৫২′ ডিগ্রীতে অবস্থিত।[১]

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন ৫,০৯৩ বর্গমাইল[২] হলেও ১৮৬০ সনে চট্টগ্রাম হতে পৃথক করে জেলার মর্যাদা প্রদানকালে এর আয়তন ছিল ৬,৭৯৬ বর্গমাইল। ১৯০১ সনে এর আয়তন হ্রাস পেয়ে ৫,১৩৮ বর্গমাইলে দাঁড়ায়। সবশেষে ১৯৪৭ সনে ৫,০৯৩ বর্গমাইল এলাকা[৩] নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে যোগ দেয়। অর্থাৎ ৮৭ বছরে (১৮৬০ - ১৯৪৭) বছরে ১,৭০৩ বর্গমাইল এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে ছিনিয়ে নেয়া হয়। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাভাবিকভাবেই ৫,০৯৩ বর্গমাইল এলাকায় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ আয়তন ৫০৯৩ বর্গমাইল হলেও ইহার প্রাকৃতিক তথা বাস্তব আয়তন অনেক বেশী। পার্বত্যভূমি আর সমতলভূমির আয়তন প্রাকৃতিক কারণে এক ধরণের নয়। যেমন পার্বত্য অঞ্চলে ভূমির ওপর অবস্থিত একটি পাহাড় খন্ডের পাদদেশ, ঢাল, মধ্যবর্তী ভাঁজ, উপরিভাগ ও তলদেশের চড়া বা জমিসহ জ্যামিতিক পরিমাপ করলে প্রতি বর্গমাইল এলাকা

---

[১] সুগত চাকমা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতিঃ ট্রাইবাল অফিসার্স কলোনী, রাঙামাটি, বাংলাদেশ ঃ ১৯৯৩ ইং ঃ পৃঃ ১৫।

[২] পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত আয়তন সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এস মাহমুদ আলী আয়তন সম্পর্কিত তিনটি সংখ্যার উল্লেখ করেছেন। ৫০৯৩, ৫০৯৩ এবং ৫৪০০ বর্গমাইল। তার মতে পূর্ণাঙ্গ জরিপের অভাবে আয়তন সম্পর্কিত মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। S.Mahmud Ali : The Fearful State: Power, People and Internal war in South Asia : ZED Books: London & New Jersy: 1993 : P.198.

[৩] সুগত চাকমা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি ঃ পৃঃ ১৫।

বেড়ে সোয়া দুই বর্গমাইলে পরিণত হয়। এই দৃষ্টিকোণ হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তব আয়তন হবে কমপক্ষে ১১.৪৫৯.২৫ বর্গমাইল। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিরূপের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করেই একে সাধারণ সমভূমির মতো ৫০৯৩ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট বলে গণ্য করা হয়. যা দেশের মোট আয়তনের এক-দশমাংশ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম পাশে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য. পূর্বে ভারতের মিজোরাম রাজ্য এবং পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণে মায়ানমার (বর্মার) চিন ও আরাকান প্রদেশ এবং পশ্চিমে বাংলাদেশের কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলা অবস্থিত।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৩৬.৮০ কিলোমিটার, মিজোরাম রাজ্যের সাথে ১৭৫.৬৮ কিলোমিটার এবং মায়ানমারের চিন ও আরাকান প্রদেশের প্রদেশের সাথে ২৮৮.০০ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে।

সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম ছোট ছোট টিলা, পাহাড়, উপত্যকা, নালা-ঝর্ণায় পরিপূর্ণ। এখানে মানব-সৃষ্ট বৃহত্তম হ্রদ অবস্থিত। প্রধান নদী কর্ণফূলী, সাংগু, শঙ্খ, মাতামুহুরী ইত্যাদি। পাহাড় এবং নদীগুলো উত্তর থেকে দক্ষিনমুখী। পাহাড়গুলো কোন কোন স্থানে ৩০০০ ফুটেরও পরে। সর্বোচ্চ পাহাড়-শীর্ষ কাওকাডাং। মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত বৃষ্টি-বিধৌত মাঝারী ধরণের জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমিত গেরিলা যুদ্ধের জন্য আদর্শ স্থানীয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি ও অউপজাতি উভয় শ্রেণীর লোক বাস করে। সর্বমোট ১৩টি উপজাতির সবাই বহিরাগত। এরা বিভিন্ন কারণে বিশেষতঃ নিরাপদ আশ্রয় লাভের সন্ধানে তিব্বত, চীন, মায়ানমার এবং ভারতের বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চল থেকে অনধিক ৪০০ বছর আগে বাংলাদেশের ভূখন্ডে আসে। এদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে চাকমারা নবাগত। নৃতাত্তিক বিচারে এরা সবাই মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ১৩টি উপজাতিরই নিজস্ব কথ্য ভাষা আছে। দুই-একটা উপজাতির লেখা ভাষা থাকলেও কোন বাস্তব ব্যবহার নেই। এক উপজাতি অন্য উপজাতির কথ্য ভাষা বুঝেনা। এক উপজাতির সদস্য অন্য উপজাতির সাথে কথা বলার সময় বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। প্রতিটি উপজাতি (অশিক্ষিত হলেও) বাংলাভাষা বোঝে এবং নিজস্ব উপজাতির বাইরে আসলে বাংলাভাষায় কথা বলে।

আধুনিকায়ন বিশেষতঃ বাঙ্গালী বসতি স্থাপনের ফলে এদের সনাতন জীবন ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। যাযাবর জীবন পরিহার করে এরা স্থায়ী

বসতি স্থাপনে অভ্যস্থ হচ্ছে । সভ্য জগতের মানুষের মতোই এরা পরিপাটি পোশাকের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কোথাও এখন আর আগের মতো দিগম্বর তরুণ-তরুণী দেখা যায় না। জুম-নির্ভর জীবিকা বলতে গেলে উঠেই যাচ্ছে। এর বিপরীতে এরা সমতলের মতো আধুনিক কৃষিকাজ আয়ত্ব করেছে। চাকরী, ব্যবসাসহ সমতলের মানুষের মতোই এরা বিভিন্ন পেশায় আসতে শুরু করেছে। বহু উপজাতীয় এখন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরাঞ্চলে চাকরী ও শিক্ষার্জন উপলক্ষে অবস্থান করছে। অনেকেই দেশের বিভিন্ন শহরে স্থায়ী বাসগৃহ গড়ে তুলেছে। দেশের সমতলের তুলনায় পার্বত্যবাসীরা অতি দ্রুত আধুনিকতা ও শহুরে জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে ।

১৯৯১ সনের ১২ মার্চ থেকে ১৫ মার্চের মধ্যে অনুষ্ঠিত আদমশুমারী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা হলো ৯,৭৪,৪৪৫। এদের মধ্যে উপজাতীয়দের সংখ্যা হলো ৫,০১,১৪৪ এবং অউপজাতীয় অর্থাৎ বাঙ্গালী হলো ৪,৭৩,৩০১। মোট জনসংখ্যার ৫১.৪৩% হলো উপজাতীয় এবং ৪৮.৫৭% হলো বাঙ্গালী। ১৩টি উপজাতিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিবেচনা করলে বাঙ্গালীরা একক সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ১৩টি উপজাতিভিত্তিক জনসংখ্যা হলো চাকমা ২,৩৯,৪১৭: মারমা ১,৪৬,৩৩৪: ত্রিপুরা ৬১,১২৯: মুরং ২২,০৪৯: তংচঙ্গা ১৯,২১১: বম ৬,৯৭৮: চাক ২,০০০: খুমি ১,২৪৯: খিরাং ১,৯৫০; লুসাই ৬,৬২: ম্রো ১২৬: পাংখো ৩,২২৭: রাখাইন ৭০ জন। এছাড়া সাঁওতাল ২৫৩ এবং অন্যান্য ৫,০০৫ জন।[১] উপজাতীয় মধ্যে চাকমা হলো ৪৮.৫৭%, মারমা ২৯.১৯%, ত্রিপুরা ১২.১৯%, মুরং ৪.৩৯% তংচঙ্গা ৩.৮৩% ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩টি উপজাতির সম্মিলিত সংখ্যা সমগ্র বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র .৪৫% (দশমিক চার পাঁচ শাতংশ)।

তিনটি পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের সম্প্রদায়ভিত্তিক অবস্থান সাংবাদিক আলীমুজ্জামান হারুন (সাংবাদিকের চোখে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিবাহিনীঃ ঢাকাঃ মে, ১৯৯১ঃ পৃ-৪১) বেশ পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন। তার প্রদত্ত তথ্য কিছুটা পুরানো হলেও বাঙ্গালী এবং ১৩টি উপজাতির বর্তমান জনসংখ্যাগত অবস্থা অনুধাবন করতে সাহায্য করতে পারে বিধায় তা পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করছি।

---

[১] Bangladesh Population Census : 1991 Zilla Series : Khagrachhari. Bandarban, Rangamati. Published in November 1992.

অধিবাসী	জেলার ভিত্তিক জনসংখ্যা (%)			সর্বমোট (%)
বাঙ্গালী + উপজাতি	খাগড়াছড়ি	রাঙ্গামাটি	বান্দরবান	৭,৯০,৪১৪
বাঙ্গালী	১,০৮,৯৭৯ ৩৬.৩০%	১,৩২,৮১৮ ৪০.৪৯%	৬৯,৪৭০ ৪২.৭৬%	৩,১১,২৬৭ ৩৯.৩৮%
উপজাতি	১,৯১,২৩৯ ৬৩.৬৯%	১,৯৫,১০৬ ৫৯.৪৮%	৯২,৮০২ ৫৭.১৮%	৪,৭৯,১৪৭ ৬০.৬২%
চাকমা	৯৬,৫৯৫ ৩২.১৭%	১,৪১,৫৯৫ ৪২.৮৩%	৩,৪২৬ ২.০৯%	২,৪১,৬১৬ ৩০.৫৭%
মারমা	৪৬,১৬৮ ১৫.৩৭%	৩৩,৬৬৮ ১০.২৪%	৫১,৩৯৪ ৩১.৬৬%	১,৩১,২৩০ ১৬.৬০%
ত্রিপুরা	৪৬,৪৪২ ১৫.৪৬%	৫,৩৪২ ১.৬১%	৬,৬৭১ ৪.০৯%	৫৮,৪৫৫ ৭.৩৯%
মুরং	-	১৭৬ .০৫%	১৬,৯৯২ ১০.৪২%	১৭,১৬৮ ২.১৭%
তংচঙ্গা	-	১০,৬৬১ ৩.২৩%	৫,৪৭৯ ৩.৩১%	১৬,১৪০ ২.০৪%
বোম	-	১১৬ .০৩%	৫৪৬৮ ৩.৩৬%	৫৫৮৪ ০.৭১%
রিয়াং	২০৩৪ .৬৬%	৪০০ .১২%	-	২৪৩৪ ০.৩১%
পাংখো	-	১,৬৬৮ .৫১%	-	-১,৬৬৮ ০.২১%
খিয়াং	-	৮২৭ .২৪%	৫০১ .২৯%	১৩২৮ ০.১৭%
খুমি	-	-	১,০৯১ .৫৮%	৯৬৬ ০.১২%
চাক	-	-	৭৯৮ .৪৯%	৭৯৮ ০.১০%
লুসাই	-	৬৫৩ .১৯%	১৬ .০০৯%	৬৬৯ ০.৮%

অর্থনৈতিক সম্ভাবনা

কৃষি সম্পদ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ভূমির মাত্র ৫% সাধারণ কৃষির আওতাভুক্ত। তাই তিনটি পার্বত্য জেলাতেই খাদ্য ঘাটতি রয়েছে। ১৯৯০ সনে ৬০ হাজার একর জমিতে 'জুম' পদ্ধতির চাষ হয়েছিল। আধুনিকতার স্পর্শে এসে বর্তমানে ধীরে ধীরে জুম পদ্ধতিতে চাষের প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে। নদী ও খালের তীরবর্তী অঞ্চলের প্রধান ফসল ধান। উঁচু ভূমিতে ইদানীং সীমিত পরিমাণে রাবার, কপি, চা এবং তুলা চাষ শুরু হয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় (১৩৮ কোটি টাকায়) ১৯৭৯ সনে রাবার চাষ প্রকল্পের আওতায় ৮ হাজার একর বনভূমিতে রাবার বাগান গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে খাগড়াছড়িতে ৬টি এবং বান্দরবানে ৪টি রাবার বাগান রয়েছে এবং আরো কয়েকটি বাগান তৈরীর কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এগিয়ে চলছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিলে বাংলাদেশ রাবার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হবে। এছাড়া পেয়ারা, আনারস, কমলা-লেবু, কাঁঠাল, কলা প্রভৃতি এ অঞ্চলে জন্মে। অউপজাতীয়দের বসতি স্থাপনের ফলে বিরান ও পতিত ভূমিতে এখন উপরোক্ত ফসল ছাড়াও নানা ধরণের শাক-সবজি উৎপাদন শুরু হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসলে এর পতিত ভূমি, পাহাড়ের ঢাল, চড়া প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য ভরে উঠবে, যা পাহাড়ী জনগণের চাহিদা মিটিয়ে সমতলে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-শিক্ষক ডঃ মোহাম্মদ আব্দুর রব তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করে এক নিবন্ধে জানিয়েছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিতে ফসল ও ফল চাষের মাধ্যমে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে এই অঞ্চলে এক কোটি মানুষের খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যা হবে বর্তমান লোক সংখ্যার চেয়ে দশগুণ বেশী।[১]

মৎস্য সম্পদ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের বৃহত্তম মনুষ্য সৃষ্ট হ্রদ অবস্থিত। কাপ্তাইয়ে কর্ণফুলি পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলায় প্রায় ৬ শত বর্গ কিলোমিটার জলমগ্ন হয়ে এ বিশাল হ্রদের সৃষ্টি হয়। প্রতি বছর এ হ্রদ হতে গড়ে বিভিন্ন প্রকারের প্রায় দশ লাখ টন মাছ সংগ্রহ করা হয়। যথোপযুক্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এ হ্রদে বছরে ১০ লাখ টন মাছের চাষ করা সম্ভব।

কাপ্তাই হ্রদ ছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ২০ হাজার ছোট-বড় পুকুর ও দীঘি রয়েছে যেগুলো থেকে বার্ষিক ১০ থেকে ১৫ হাজার টন

---

[১] Dr. Mohammad Abdur Rob : Bangladesh Quarterly: Published by Department of Films and Publications. PRB : December, 1995.

মৎস্য সংগ্রহ করা সম্ভব।[৮] পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়েক হাজার ঝর্ণা, নালা এবং পাহাড়ী শীর্ণ স্রোতধারা রয়েছে। এসব স্থানে পরিকল্পিত উপায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধ দিয়ে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মৎস্য চাষের মাধ্যমে কয়েক হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

. **বনজ সম্পদ ঃ** সুন্দরবনের পরে বাংলাদেশের বনজ সম্পদের প্রধান উৎস হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম। বাংলাদেশের মোট বনাঞ্চলের ৬০ শতাংশই পার্বত্য চট্টগ্রামে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় অর্ধেক জমিই (৭০৪৩.৮৬ কি.মি) ঘন এবং মাঝারী জঙ্গলাকীর্ণ। ১৪শ বর্গ মাইলব্যাপী বিস্তীর্ণ অভয়ারণ্য ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলে শাল, সেগুন, গর্জন, লৌহ কাঠ, চাপালিস, তাকিজাম, শীলকড়ই প্রভৃতি কাঠ রয়েছে। এ বনভূমিতে সিভিট, গর্জন, চাপলাইস, টেলসুর, নাগেশ্বর, টিক, জারুল, গামার, চাতিম, বেত, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষ রয়েছে।

অতি সম্প্রতি সরকারী বন বিভাগ তিন পার্বত্য জেলায় টিক, মেহগনি, ইউক্লিপিটাসসহ অন্যান্য মূল্যবান বৃক্ষের বাগান গড়ে তুলেছে। গত দশকে প্রায় ২৩,১৯৬ একর পতিত জমি বৃক্ষায়নের অধীনে আনা হয়েছে। অন্যদিকে প্রায় ৬,৩১৮ একর জমিতে কাগজের মন্ড তৈরীর উপযোগী নরম কাঠের গাছ লাগানো হয়েছে। কর্ণফূলী কাগজ ও রেয়ন মিল তাদের সমুদয় কাঁচামাল অর্থাৎ কাঠ ও বাঁশ পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সংগ্রহ করে।

উপরোক্ত দুটো বৃহদায়তন মিল ছাড়াও পার্বত্যাঞ্চলের বনজ সম্পদ-নির্ভর নির্ভর আরো কতগুলো ক্ষুদ্রায়তনের কলকারখানা গড়ে উঠেছে। এগুলো হলো প্লাইউড, হার্ডবোর্ড, মন্ড, দিয়াশলাই প্রভৃতি তৈরীর কারখানা। কাঁচামালের প্রাচুর্যের কারণে এ অঞ্চলে একই ধরণের আরো শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ হতে রপ্তানীকৃত কাঠের সিংহভাগই পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে আসে।

পানি বিদ্যুৎ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী নদী সমূহে বাঁধ দিয়ে পর্যাপ্ত পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্পে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হলেও বর্তমানে মাত্র ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। মাতামুহুরী, সাংগু, মাঙ্গীনী প্রভৃতি নদীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে, সাংগু নদীতে জল বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন ধরণের জরীপ চালিয়ে অজ্ঞাত কারণে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন পদক্ষেপ নেয়া

[৮] Dr. Mohammad Abdur Rob : Ibid.

হচ্ছে না। ফলে পাহাড়ী নদ-নদীকে অর্থনৈতিকভাবে ব্যবহার করার সুযোগ হতে বাংলাদেশ নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে।

খনিজ সম্পদ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে এ পর্যন্ত কোন খনিজ সম্পদ আহরণ কিংবা উত্তোলন সম্ভব না হলেও এর ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমির স্তর ও রূপ, ভূ-তাত্ত্বিক পরিবেশ বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভবনাকে উজ্জ্বল করেছে। বিশেষতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী ভারতীয় ও বর্মী (মায়ানমার) ভূ-খন্ডে খনিজ তেলসহ নানাবিধ খনিজ সম্পদ প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে এখানেও একই ধরণের খনিজ সম্পদের মওজুদ থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্নস্থানে হাইড্রোকার্বন (অর্থাৎ প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, পেট্রোলিয়াম), কঠিন শিলা, চুনাপাথর প্রভৃতির ব্যাপক মওজুদ রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। খাগড়াছড়ি জেলায় সামতুং-এ ০.১৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ইতোমধ্যেই আবিস্কৃত হয়েছে। উচ্চমান সম্পন্ন মিথেন মিশ্রিত কঠিন শিলা কাপ্তাই ও আলীকদমে পাওয়া গেছে। রামুতে প্রাকৃতিক গ্যাস, আলীকদমে প্রেট্রোলিয়াম এবং লামায় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

ঢাকার একটি দৈনিক বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে জানিয়েছেনঃ খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি ও লক্ষ্মীছড়ি এবং রাঙ্গামাটি জেলার কয়েকটি স্থানে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক পাথরের বিরাট মওজুদ রয়েছে।

উপসংহারে বলা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি ইঞ্চি ভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহের উজ্জ্বল অর্থনৈতিক সম্ভবনা ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি গ্রাম, মৌজা, শহর-গঞ্জে বিশ্বমানের পর্যটন স্পট গড়ে উঠতে পারে, যা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ■

Dr. Mohammad Abdur Rab : Ibid. P.56

Geological Survey of Bangladesh (G.S.B) 1990.

দৈনিক সংগ্রাম ঃ ৯ নভেম্বর ঃ ১৯৯৬।

বিভিন্ন যুগে পার্বত্য চট্টগ্রাম

- ব্রিটিশ-পূর্বযুগ
- ব্রিটিশ শাসনামল
- পাকিস্তান আমল
- বাংলাদেশ আমলঃ শুরুতেই চ্যালেঞ্জ
- নাম মুছে ফেলার চক্রান্ত

ব্রিটিশ-পূর্বযুগ

বাংলাদেশের জানা ইতিহাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্বদাই বাংলাদেশের অংশ হিসেবে বিদ্যমান ছিল। সে সময়, এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের আগ পর্যন্ত, পার্বত্য চট্টগ্রাম নামক কোন জনপদ কিংবা অঞ্চল ছিল না। ১৮৬০ সনের আগ পর্যন্ত ইহা ছিল চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্ভুক্ত। ব্রিটিশরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও শাসন রক্ষার জন্য ১৮৬০ সালে চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলকে ভিন্ন জেলা হিসেবে ঘোষণা করে এর নাম দেয় পার্বত্য চট্টগ্রাম।

প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম (অর্থাৎ পার্বত্য অঞ্চলসহ) ছিল বাংলার হরিকল জনপদের অন্তর্ভুক্ত। কখনো কখনো চট্টগ্রাম সাময়িকভাবে আরাকান কিংবা টিপরাদের দখলে চলে গেলেও পুনরায় তা বাংলাদেশের শাসকদের অধীনে চলে আসে। ঐ সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন উপজাতীয় বসতি গড়ে ওঠেনি।

ব্রিটিশ-পূর্ব বাংলাদেশে মুসলিম শাসন ৫৫৩ (১২০৪-১৭৫৭) বছর স্থায়ী হয়েছিল। চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে আসে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার (১৫২৬ সাল) আনুমানিক দেড়'শ বছর পরে। তৎকালে শুধু বাংলাদেশ নয়, প্রায় সমগ্র বিশ্বে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রাজাদের অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। বাংলাদেশের সুলতান, বাদশা এবং সম্রাট এবং নবাব-সুবেদারদের শাসিত রাজ্যে এসব আঞ্চলিক জমিদার শ্রেণী সুলতান, সম্রাট, নবাব-সুবেদারদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে তাদের জমিদারী শাসন করতেন। কোন কোন অঞ্চলে জমিদাররা রাজা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও তাদের জমিদারীভুক্ত অঞ্চল কখনো রাজ্য বা রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি বা সে নামে পরিচিতও হয়নি।

মুসলিম শাসনামলে চাকমা জমিদার তথা রাজারা মুসলিম শাসকদের প্রতি পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে পার্বত্য অঞ্চলের অংশ বিশেষ শাসন করত। এসব সামন্ত রাজাদের ওপর বাংলার মুসলিম শাসকদের এতো বেশী প্রভাব ছিল যে, তারা তাদের চাকমা নাম পরিত্যাগ করে মুসলিম নাম ধারণ করেছিলেন। সুগত চাকমা তার 'চাকমা পরিচিতি' শীর্ষক গ্রন্থে চন্দন খান, জলীল খান, শেরমুস্ত খান, জান বক্স খান, ধরম বক্স খান, শুকলাল খান প্রমুখ মুসলিম নাম ধারণকারী চাকমা রাজাদের নাম উল্লেখ করেন। এদের সংখ্যা যে আরো অধিক ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এখানে উল্লেখ্য যে, সমগ্র মুসলিম আমল এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসনের একশত বছর যাবত পার্বত্য চট্টগ্রাম বলতে কোন অঞ্চলের নাম ছিল না।

ইহা ছিল চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্ভুক্ত। চাকমা রাজারা বাংলার মুসলিম শাসকদের প্রতি এতোখানি অনুগত ছিলেন যে, ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটলে বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে নাজুক সে নড়বড়ে পরিস্থিতিতেও চাকমা রাজারা নিজদেরকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করার সাহস পাননি। ইংরেজদের পুতুল মীর জাফর আলী খানের পরিবর্তে তার জামাতা মীর কাশেম আলী খান ১৭৬০ সালে বাংলার মসনদে বসলে তার ক্ষমতা গ্রহণের শর্ত মোতাবেক চট্টগ্রাম জেলা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে অর্পণ করেন। সে সুবাদে আজকের পার্বত্য চট্টগ্রাম চট্টগ্রামের তথা বাংলার অংশ হিসেবেই ইংরেজদের শাসনাধীন হয় এবং চাকমা রাজারা ইংরেজদের আনুগত্য মেনে নেয়। ইংরেজরা প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ১৮৬০ সালে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে নতুন জেলা গঠন করেন। তবে চাকমারা চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলকে চট্টগ্রামের মূল অংশ হতে বিচ্ছিন্ন করার নীতির বিরোধিতা করে। ১৮৭৫ সালে জান বক্স খান-এ পরিবর্তন মেনে নেয়।[*]

সমগ্র ইংরেজ শাসনামলে তথাকথিত চাকমা রাজারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিরোধও গড়ে তোলেনি। বরং মুসলিম নবাবীর অধীনস্থ ছিল বলেই চাকমারা নীতিগতভাবে ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। ইংরেজ আমলে ত্রিপুরা, কাশ্মীর, হায়দারাবাদ, সিকিম, কিংবা উপমহাদেশের অন্যান্য পাঁচশতাধিক দেশীয় রাজ্যের মর্যাদাও পার্বত্য চট্টগ্রামের ছিল না। আজতো এসব স্বশাসিত রাজ্যের অস্তিত্বও বিলীন। সুতরাং স্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা জুম্মল্যান্ড ইতিহাসের ধারাবাহিকতার পরিপন্থী। ■

---

[*] S. Mahmud Ali : The Fearful State : P.169.

ব্রিটিশ শাসনামল

ব্রিটিশ শাসনামলের সর্বাধিক বিতর্কিত ও সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের নীল নকশা হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধি-১৯০০। চট্টগ্রামে তথা পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার ১৪০ বছর পর (১৭৬০ - ১৯০০) ইহা প্রবর্তিত হয়। বিট্রিশদের প্রবর্তিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি (১৯০০) বলে প্রকৃত ক্ষমতা সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা জেলা প্রশাসকের হাতে চলে যায়। উপজাতি প্রধানরা কেবল উপজাতীয়দের নিকট হতে খাজনা আদায় এবং ছোটখাট বিবাদ মিটিয়ে ফেলার শালিসী দায়িত্ব পায়। এ বিধিবলে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এস.মাহমুদ আলীর মন্তব্য ঃ

"With this Act the British arrogated arbitary power over CHT, its people, and land".[১১]

(এ আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম, এর জনগণ ও ভূমির ওপর ব্রিটিশদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়)।

এই বিধি বলে জেলা প্রশাসককে (যিনি অবশ্যই বহিরাগত ইংরেজ) উপনিবেশিক শক্তির স্বার্থের অনুকূলে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে অবাধে কাজ করার আইনসম্মত অধিকার দেয়া হয়। এবং একই বিধি দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতলবাসী বাঙ্গালীদের যাতায়াতের সুযোগ সীমিত করা হয় এবং তাদের সেখানে প্রবেশাধিকার জেলা প্রশাসকের বিবেচনা ও ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। মাহমুদ আলী বলেন ঃ

"The regulation did not specifically bar Bengali immigration or land rights, but gave the British the authority to impose restrictions when it considered it".[১২]

(ভাবানুবাদ ঃ এ বিধি পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালীদের অভিভাসন কিংবা ভূমি ক্রয়ের অধিকার রহিত করেনি। বরং এ বিধি ব্রিটিশদের এ কর্তৃত্ব প্রদান করে যে, যখন তারা চাইবে তখন যেন তারা বাধা প্রদান করতে পারে।)

S.Mahmud Ali : The Fearful State : P.174.

S. Mahnmud Ali. Ibid P.174.

অর্থাৎ সমতলবাসীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে জায়গা-জমি ক্রয় ও বসবাস করার অবাধ অধিকার সংকুচিত করে তা ব্রিটিশ কর্মচারীর ইচ্ছাধীন করা হয়, এর মাধ্যমে বাঙ্গালীদের জমি ক্রয় কিংবা বসতি নির্মাণ একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়নি।

এ শাসনবিধি সাধারণ উপজাতীয়দের মর্যাদাহীন ও অধিকারহারা করেছে। তারা ভূমির মালিক না হয়ে ভূমিদাসে পরিণত হয়েছে। এই আইন বলে তাদের কিছু লোক কারবারী, হেডম্যান, দেওয়ান, রাজা ইত্যাদিতে পরিণত হয়েছে, যাদের কোন নির্বাহী ক্ষমতা ছিল না। এমনকি তথাকথিত রাজাও ছিলেন প্রতীকী, নির্বাহী ক্ষমতাবিহীন ব্রিটিশদের আজ্ঞাবহ। পার্বত্য অঞ্চলের সমুদয় উপজাতীয়রা তাদের অবস্থান ও সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে এ বিধি বলে জেলা প্রশাসকের আজ্ঞাবহ ও সেবাদাসে পরিণত হয়। রাজাকেও তিনি মনোয়নয়ন দিতেন। ভূমি বন্দোবস্তী এবং ইজারা ছাড়াও কৃষিকাজ, পশুপালন ও চারণ কিছুই করমুক্ত ছিলনা। মূলতঃ ইহা ছিল উপজাতীয় জনগণকে নির্বিঘ্নে শাসন এবং অবাধে কর আদায়ের মাধ্যমে শোষণ করার সাম্রাজ্যবাদী কৌশল।

সমতলে পরিচালিত তৎকালীন ব্রিটিশ বিরোধী গণআন্দোলন যাতে পার্বত্য অঞ্চলসমূহে পৌঁছতে না পারে এবং সীমান্ত অঞ্চল যেন সর্বদাই শান্ত ও নিরাপদ থাকে সেই উদ্দেশ্যে পার্বত্য অঞ্চলসমূহকে সমভূমির জনগণের (যারা ছিল কট্টর ব্রিটিশ বিরোধী) নাগালের বাইরে রাখার উদ্দেশ্যেই এ বিধি চালু করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, লর্ড কর্ণওয়ালিশের পর লর্ড হেস্টিংস ১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসন বিলোপ করে বাংলার শাসন সরাসরি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে নেবার পরেও পরবর্তী ১২০ বছর অর্থাৎ ১৮৯২ সালে লুসাই পাহাড় (বর্তমান মিজোরাম) দখল না করা পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্ব-সীমান্ত। ঐ সীমান্ত (অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম) রক্ষার সমস্যা মিজোরাম দখলের ফলে শেষ হওয়ায় বাঙ্গালী পুলিশ ও সৈন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রেরণের প্রয়োজনও শেষ হয়ে যায়। আর কর আদায় করার জন্য বাঙ্গালীদের ওপর নির্ভর না করে উপজাতীয়দের মধ্য হতে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। আবার বাঙ্গালীদের উপর্যুপরি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দূরীভূত করার লক্ষ্যে তাদের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ ও সীমিত করার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রয়োজনে এ ধরণের বিধি প্রবর্তিত হয়।

এ বিধি প্রবর্তনের আগে ১৮৮১ সনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি অঞ্চলে (সার্কেল) ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি অঞ্চলে উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন করে রাজা মনোনীত করা হয় প্রধানতঃ কর হয় আদায় ব্যবস্থাকে আরো জোরদার ও সুসংহত করার জন্য। এগুলো ছিল মংরাজার অধীনে ৬৫৩ বর্গমাইল নিয়ে মানিকছড়ি কেন্দ্রিক মং সার্কেল; বোমাং রাজার দায়িত্বে ১৪৪৪ বর্গমাইলের

সমন্বয়ে বান্দরবান কেন্দ্রিক বোমাং সার্কেল এবং ১৬৫৮ বর্গমাইল এলাকায় রাঙ্গামাটি কেন্দ্রিক চাকমা সার্কেল।[১৭]

এ সব রাজাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেবল খাজনা আদায় এবং সনাতন ব্যবস্থার অধীনে স্থানীয় বিরোধ মীমাংসার শালিসী কার্যক্রমের মধ্যে সীমিত ছিল। আসলে নির্বাহী, বিচার বিভাগীয় ও অর্থ-সংক্রান্ত সর্বময় ক্ষমতা জেলা প্রশাসক এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের ওপর ন্যস্ত করা হয়।[১৮]

এ বিধি (৩৪নং) সমতলভূমিবাসীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির অধিকারী হবার সুযোগ সীমিত করে, কিন্তু একে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়নি। কেননা বিধির ৩৪খ ধারা অনুযায়ী সমতলবাসীরা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বনায়ন, ৩৪গ ধারা অনুযায়ী শিল্পায়ন, ৩৪ঘ ধারা অনুযায়ী আবাসিক এবং ৩৪ঙ ধারানুযায়ী ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ভূমির মালিক হতে পারত। তবে বিধির ৫২ ধারানুযায়ী যেকোন সমতলবাসী অউপজাতীয় জেলা প্রশাসকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ কিংবা বসবাস করতে পারত না। এছাড়া ৫১ ধারা অনুযায়ী জেলা প্রশাসক যেকোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বহিস্কার করার অধিকারী ছিলেন।

ব্রিটিশ সরকার তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯০০ সনের বিধিকে ১৯২০, ১৯২৫, ১৯৩৩ ও ১৯৩৫ সনে বিভিন্ন ধারা, বিধি, আইন ও নোটিশের মাধ্যমে সংশোধন করে। ১৯২০ সনের সংশোধনীতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'পশ্চাদপদ অঞ্চল' বলে ঘোষণা করা হলেও ইহার উন্নয়নে সমুদয় ব্রিটিশ শাসনামলে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। এ বিধি উপজাতীয় জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে বা তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে কোন ভূমিকা রাখেনি, বরং তাদেরকে একেবারেই অধিকারহীন করেছে।

এ ধরণের বিধির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার মূলতঃ বাঙালী ও উপজাতীয়দের মধ্যে অবৈধ বৈষম্যের অবতারণা করে, যাতে পাহাড়ী ও সমতলের জনগণের মধ্যে কখনোই ঐক্য ও বন্ধুত্ব গড়ে না ওঠে। অন্যদিকে পার্বত্য অঞ্চলে বাঙ্গালীদের প্রবেশ ও ভূমির মালিক হবার অধিকার জেলা প্রশাসকের ইচ্ছাধীন করে তাদের অধিকারকে নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত করা হলেও উপজাতীয়দের সমতল ভূমিতে গমন কিংবা ভূমির মালিক হওয়ার ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়নি।

---

[১৭] S. Mahmud Ali : The Fearful State : PP.199.

[১৮] Dr. Mizanur Rahman Shelley : The Chittagong Hill Tract of Bangaldesh - The Untold Story : Centre for Development Research : Dhaka, Bangladesh, 1992 : P.83.

১৯০০ সনের শাসনবিধি বা পরবর্তী সংশোধনী-সংযোজনী জনগণের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত ও প্রবর্তিত হয়নি। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই সর্বভারতীয় অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলনের কথা বাদ দিলেও ১৯৩২ সনে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন ব্রিটিশদের হৃদযন্ত্রে কম্পন তোলে। অস্ত্রাগার লুন্ঠনকারী বিপ্লবীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় নেয়। ব্রিটিশ সরকার অশনি সংকেত শুনতে পায়। ব্রিটিশ সরকার আশংকা করে যে, বাংলার অন্যান্য স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীরা যদি সন্ত্রাসের পথে নামে তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম তাদের নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। ফলে রাজনৈতিক চেতনা-বিবর্জিত উপজাতীয়দের মধ্যে হয়ত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বীজ বপিত হতে পারে।

পার্বত্যবাসী রাজা, হেডম্যান, কারবারী ও সাধারণ উপজাতীয়রা ইংরেজদের প্রতি এমন আনুগত্য প্রদর্শণ করে যে, ইংরেজরা তাদের দিক হতে নিরাপদবোধ করে। এই নিরাপদ ও অনুগত শ্রেণীকে বাইরের কেউ এসে যাতে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করতে না পারে সেজন্য সে অঞ্চলে বাইরের সমতলবাসীদের আগমন নিয়ন্ত্রিত করাকে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার সহজ পন্থা বলে বিবেচনা করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলার বিপ্লবী ও স্বাধীনতাকামীদের প্রভাব হতে দূরে রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯০০ সনের শাসনবিধি সংশোধন করে সমতলবাসীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করার সুযোগ সংকুচিত ও নিয়ন্ত্রিত করে তা জেলা কমিশনারের ইচ্ছাধীন করে। এতে বলা হয় ঃ

"No person other than a Chakma, Mogh or a member of any hill tribe indigenous to Chittagong Hill Tracts, the Lushai Hills, the Arakan Hill Tracts or the state of Tripura shall enter or reside within the Chittagong Hill Tracts unless he is in Possession of a permit granted by the Deputy Commissioner at his discretion" (ভাবানুবাদ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের, লুসাই পাহাড়ের, আরাকান পার্বত্য অঞ্চলের অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের চাকমা, মগ কিংবা অন্য কোন আদিবাসী ব্যতীত যেকোন ব্যক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করতে বা সেখানে বসবাস করতে পারবে না, যদি তার কাছে জেলা প্রশাসকের কাছ হতে প্রাপ্ত অনুমতিপত্র না থাকে।)

এই সংশোধনী বা সংযোজনীতেও বাঙ্গালীদের পার্বত্যাঞ্চলে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়নি, বরং তাকে জেলা প্রশাসকের বিবেচনাধীন তথা সীমিত ও সংকুচিত করা হয়েছে।

ব্রিটিশ বিরোধী গণআন্দোলনের সূতিকাগার বাংলার পূর্বাংশের পাহাড়ী অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের উপজাতিদের আগমনকে উৎসাহিত করে এবং এদেশীয় অ-উপজাতীয়দের প্রবেশাধিকার সংকুচিত করে ব্রিটিশ সরকার পাহাড়ী অঞ্চলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অনুপ্রবেশ রোধে সচেষ্ট ছিল বলেই এ ধরণের বৈষম্যমূলক বিধির দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'বিচ্ছিন্ন বা বহিভূত এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করে।

আরাকান ও লুসাই পাহাড়ী অঞ্চল ও ত্রিপুরার আদিবাসীদের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে উন্মুক্ত রেখে কিভাবে একে বহিরাগতমুক্ত 'বিচ্ছিন্ন এলাকায়' পরিণত করা হয়, তার কোন ব্যাখ্যা ব্রিটিশদের কাছেও ছিল না। তাছাড়া বাংলাদেশের ভূ-খন্ড বাংলাদেশ অঞ্চলের জনগণের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত না রেখে বহিরাগত-বিদেশী আরাকানী, লুসাই, বা টিপ্রা উপজাতিদের স্বাগত জানানো নৈতিকভাবে আইনসংগত হতে পারে না।

আসলে ১৯০০ সনের শাসনবিধি কিংবা পরবর্তী সংশোধনী অথবা সংযোজনীতে বাঙ্গালী কিংবা অউপজাতীয়দের পার্বত্য চট্টগ্রামে গমন বা বসতি স্থাপন একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়নি। সুতরাং বর্তমান জনসংহতি সমিতি কিংবা তাদের সতীর্থরা ১৯০০ সনের শাসন বিধির পুনর্বহালের আওয়াজ তুলে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বাঙ্গালীদের বিতাড়নের যে ধূয়া তুলছে তার কোন আইনগত (১৯০০ সনের শাসন বিধি অনুযায়ী) ভিত্তি নেই। দেশের বাকী অংশের জনগণ তাদের সম্পদ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটিয়ে সেখানে বসবাস করতে পারবে না, এমন যুক্তিহীন আবদার সত্যিই অশ্রুতপূর্ব। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্রান্তমূলক আইন তাদের শাসনাবসনের অর্ধশত বছর পরে পুনর্জীবিত করা কোনভাবে যুক্তি-নির্ভর নয়।

অথচ ব্রিটিশ আমলেই ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালীদের আগমনকে উৎসাহ যোগাত। ১৮৯০ সনের মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের যে ৩,০০০ হেক্টর জমিকে চাষাবাদের আওতায় আনা হয়, তার অর্ধেকের মালিক ছিল বাঙালী।[১৫] বাঙ্গালীদের আগমনের বিরুদ্ধে পার্বত্য উপজাতীয়রা কোন অসন্তোষ প্রকাশ কিংবা আন্দোলন করেছে এমন কোন রেকর্ড ব্রিটিশদের দলিল-দস্তাবেজে নেই।

বর্তমানে যে ভূ-খন্ড নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত ব্রিটিশ আমলে তার জনসংখ্যা ছিল অনেক কম। সে সময়ে একেবারে যোগাযোগবিহীন পার্বত্যাঞ্চলের

S. Mahmud Ali : The Fearful State. P.171.

সেকেলে জীবন ব্যবস্থায় বাঙ্গালীদের বসতি স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কেননা সমভূমিতে পর্যাপ্ত জমি পতিত ছিল। আজকে যেমন ভূমির দুষ্প্রাপ্যতা এবং ভূমির ওপর প্রচন্ড চাপ তখন তেমনটি ছিল না বলেই বাঙ্গালীরা পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপক হারে গমন করেনি।

১৯০০ সনের শাসন বিধি শুধু বাঙ্গালীদের জন্যই বৈষম্যমূলক নয়, এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী অন্যান্য ক্ষুদ্রতর উপজাতীয়দের জাতিগত স্বত্ত্বা ও অধিকারকেও অস্বীকার করা হয়েছে। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে মাত্র তিনজন সার্কেল-প্রধান বা রাজার মধ্যে ভাগ করে চাকমা, মং ও বোমাংদেরকে অন্য ১০টি উপজাতির ওপর কর্তৃত্ব করার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাও 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির প্রতিফলন। পার্বত্য চট্টগ্রামের অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ও অগ্রসর উপজাতীয়দের হাতে রাখার জন্য অন্যান্য দুর্বল সম্প্রদায়ের ওপর তিনটি উপজাতির কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়। সুবিধাভোগী তিনটি বৃহত্তর উপজাতিই স্বার্থগত কারণে ব্রিটিশদের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং তারা দুর্বল শ্রেণীর ব্রিটিশ বিরোধী সম্ভাব্য আন্দোলন চরমভাবে প্রতিহত করবে তাদের শ্রেণীগত স্বার্থ রক্ষার তাগিদে - এমন প্রত্যাশা নিয়েই ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতি গ্রহণ করে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থার কারণে ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য অঞ্চলে নির্বিঘ্নে শাসনকার্য পরিচালনায় সক্ষম হয়।

১৯০০ সালের শাসন বিধি পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের জন্য বাস্তব অর্থে কোন মঙ্গলই বয়ে আনেনি। ব্রিটিশদের দীর্ঘ ১৮৭ (১৭৬০-১৯৪৭) বছরে ইতিহাসে পার্বত্যবাসীদের বিচ্ছিন্ন কিংবা বহির্ভূত এলাকার আবরণে তাদেরকে বাদবাকী বিশ্বের প্রাগ্রসরমানতা হতে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে-ফিরে যাযাবর জীবন যাপন পরিহার করে তারা আধুনিক জীবনে প্রবেশ করতে পারেনি। উপজাতীয়দের তথাকথিত স্বার্থরক্ষাকারী বিধি প্রবর্তন করা সত্ত্বেও ব্রিটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে যে উদাসীন্য প্রদর্শন করেছিল, তার প্রতি তাকালেই প্রমাণিত হয় যে, এ শাসনবিধি প্রবর্তন উপজাতীয়দের মঙ্গলের জন্য নয়, বরং ব্রিটিশদের শাসন ও শোষণ প্রলম্বিত ও বিপদমুক্ত করার জন্য।

ব্রিটিশ শাসনের সর্বশেষ বর্ষে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে কোন মহাবিদ্যালয় ছিল না। সারা পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে কেবলমাত্র রাঙ্গামাটিতে একটি মাত্র হাই স্কুল ছিল। কোথাও কোন জুনিয়ার হাই স্কুল ছিল না। সর্বমোট ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। কোন ভকেশনাল বা কারিগরি বিদ্যালয় ছিল না। শিক্ষিতের হার ছিল মাত্র ২% থেকে ৩%। সমুদয় পার্বত্য অঞ্চলে কোন বৃহদায়তন, ভারী কিংবা মাঝারী, এমনকি সরকারী উদ্যোগে কুটির শিল্প কারখানাও ছিল না। কোন হাসপাতাল, কিংবা চিত্তবিনোদন কেন্দ্র গড়ে তোলা

হয়নি। কোথাও কোন পাকা সড়ক ছিল না। টেলিফোন, বিদ্যুৎ তখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে পৌঁছানো হয়নি। অর্থাৎ সমুদয় ব্রিটিশ আমল উপজাতীয়দের সে প্রাচীন যুগেই রেখে দেয়। এমনকি তারা ভূমির মালিক ও ছিল না। এ ব্যবস্থায় সার্কেল চীফ তথা রাজাদের কেবল খাজনা আদায়কারীর ভূমিকা দেয়া হয়, যারা মূলতঃ তাবেদার হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশদের স্বার্থ দেখা শুনা করত। এতে পার্বত্য অঞ্চলের সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা রাজাদের পর্যন্ত কোন ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। এমনকি রাজারা জেলা প্রশাসক তথা ব্রিটিশ সরকার দ্বারা মনোনীত হতেন, যার প্রধান দায়িত্ব ছিল ব্রিটিশদের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করতঃ তাদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ঐ অঞ্চলের জনগণের স্বার্থে নয়, বরং ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার তাগিদে প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়। এর মধ্যে পার্বত্য জনগণের কল্যাণ নিহিত ছিল না। ■

পাকিস্তান আমল

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে উপমহাদেশে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটো পৃথক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা এবং ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সাবেক পাকিস্তানের পূর্বাংশে অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হবার কথা। কিন্তু তৎকালে মুসলিম প্রধান অঞ্চল না হবার যুক্তি দেখিয়ে ভূমি দখলকারী কংগ্রেসী লাঠিয়াল-বরকন্দাজরা চেয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতভুক্ত হোক। এ ধরণের প্রত্যাশা প্রকাশের আগে তারা বাংলাদেশের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং ভৌগোলিক অবস্থানগত নৈকট্যের দিকগুলো বিবেচনার মধ্যে আনেননি। অর্থাৎ এ দুটো উপাদানের যে কোনটি ব্যবহার করে কংগ্রেসীরা বহু মুসলিম-অধ্যুষিত পকেট ভারতভূক্ত করেছিলেন, যদিও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সেগুলো পাকিস্তানের অংশ হবার কথা। পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা উপজাতিভুক্ত দু'এক জন পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতভুক্ত করার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু এ ধরণের প্রস্তাবের পেছনে উপজাতীয় জনগণের কোন সায় ছিল না, তাই তা হালে পানি পায়নি।

অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সৃষ্ট তিনটি উপজাতীয় সার্কেলের রাজারা পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বৃহত্তর আসামের অংশ বিশেষ (অর্থাৎ উপজাতীয় অধ্যুষিত এলাকা) এবং কোচবিহারের সমন্বয়ে একটি ফেডারেশন সংগঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে।[১৬] এখানে লক্ষ্যণীয় যে, উপজাতীয় কংগ্রেসী চেলা কিংবা সার্কেলের রাজাগণ অথবা অন্যকোন গোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবী করেনি, কিংবা আন্দোলনও হয়নি। তাই চাকমা উপজাতিভুক্ত কংগ্রেস কর্মীরা ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় পতাকা এবং মারমারা বান্দরবনে বার্মার পতাকা উত্তোলন করার[১৭] পর কোন উপজাতির পক্ষ হতে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পাকিস্তানী পুলিশ ভারত ও বার্মার পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়ে দেবার পরে তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ হয়নি। আসলে ভারত কিংবা বার্মার পতাকা উড়ানো ছিল সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ঘটনা, জনগণের সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না।

---

[১৬] S. Mahmud Ali : The Fearful State : P.176.

[১৭] Life is not our's : Land and Human Rights. In the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh : The Report of the Chittagong Hill Tracts Commission : May 1991. P.122.

ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক সংশ্লিষ্টতা ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানভুক্ত হবার পেছনে ভূমি বিনিময় সংক্রান্ত কারণও ছিল। ভারতের বর্তমান পাঞ্জাব অঞ্চলের ফিরোজপুর জেলার সদর ও জিরা মহাকুমা দুটো ভারতকে প্রদানের বিনিময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১৮] অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তান ভুক্তির অন্যতম কারণ ছিল কলিকাতা বন্দরের ওপর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের দাবী। মূলতঃ এই বন্দরটির পশ্চাদভূমি ছিল তৎকালীন পূর্ব-বাংলা এবং এই বন্দর ও নগর গড়ে তুলতে পূর্ব-বাংলার জনগণের সম্পদ ব্যবহৃত হয়েছিল। উপমহাদেশ বিভক্তির সময় নেহেরু গান্ধীদের চাপের মুখে ব্রিটিশ বাংলাও ভাগ হয়ে যায়। তৎকালীন বাংলার রাজধানী কলিকাতার জনসংখ্যা হিন্দু-মুসলিম প্রায় সমান সমান হওয়া সত্ত্বেও পুরো কলিকাতা নগরী ভারতকে দেওয়া হয়। যদিও জনসংখ্যাপাতে এর কমপক্ষে অর্ধেক সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানভুক্ত হবার কথা। বঞ্চিত মুসলমানদের শান্তনা পুরস্কার হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম বন্দরের পশ্চাদভূমি বিবেচনা করে অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানভুক্ত করা হয়।[১৯]

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানভুক্ত হবার ফলে স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ প্রবর্তিত বিধি ও নীতি ধীরে ধীরে অপসৃত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে সীমিত পরিমাণ স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে তেমন সুবিধা প্রদান হয়নি।[২০] ফলে ইহা পাকিস্তানের বিশেষতঃ পূর্ব-পাকিস্তানের শাসন কাঠামোতে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার এক বছরের মধ্যে ব্রিটিশ প্রবর্তিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ায় পুলিশ রেগুলেশন আইন ১৮৮১ বাতিল হয়ে যায়। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের সমন্বয়ে সৃষ্ট স্বতন্ত্র যে পুলিশ বাহিনী ছিল তারও বিলুপ্তি ঘটে।[২১] ১৯৫৫ সনে প্রাদেশিক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা খর্ব করে[২২] এবং এর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে ১৯৬৪ সনে[২৩] আইয়ুব খানের বুনিয়াদী গণতন্ত্রসম্বলিত শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের মাধ্যমে। মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমতলের রাজনৈতিক স্রোত ধারায় মিশে যাওয়ায় সমতলের শাসন বর্হিভূত অঞ্চল (Excluded Area) এর মর্যাদারও স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

---

১৮ S. Mahmud Ali : Ibd. P.176.

১৯ Life is not ours : Ibid. P.13.

২০ Life is not ours : Ibid. P.13.

২১ Life is not ours : Ibid. P.13.

২২ S. Mahmud Ali : The Fearful State : P.177.

২৩ Life is not ours. Ibd. P.13.

পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে চোখে পড়ার মতো কমপক্ষে দুটো উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এ দুটো হলো ঃ কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং চন্দ্রঘোনাস্থ কাগজকল।

পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য কাপ্তাইয়ে বাঁধ নির্মাণের ফলে কর্ণফুলীর উজানে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ বর্গমাইল[১] নিচুভূমি স্থায়ীভাবে পানিমগ্ন হয়ে যায়। এতে ১৮ হাজার পরিবারের লক্ষাধিক উপজাতীয় (বিশেষত চাকমা) ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

পাকিস্তান সরকার ৫ কোটি টাকা ব্যয় করে ৫ হাজার ৫ শতটি পরিবারকে ১১ হাজার একর জমিতে পুনর্বাসন করে। ৬২৯৩টি পরিবারকে মৎস্য শিকারের সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য ৪৩ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ১১ লাখ টাকা ব্যয়ে ভ্যালী সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।[১] পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা বহু চাকমাই গ্রহণ করেনি। তারা তাদের সনাতন জীবন ছেড়ে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বাধাধরা জীবনে প্রবেশ করতে চায়নি বলে ষাটের দশকের মাঝামাঝি প্রায় ৪০ হাজার উপজাতি ভারতে এবং ২০ হাজার আরাকানে চলে যায়। ভারত তাদেরকে গ্রহণ করে মিজোরাম, আসাম, ও অরুনাচল প্রদেশে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসিত করে। বর্তমানে তারা ভারতের নাগরিক।

১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পার্বত্য উপজাতীয়দের ভূমিকা ছিল বিতর্কিত। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত বাঙ্গালীদের দীর্ঘ ২৩ বছরের সংগ্রামে উপজাতীয়দের তেমন কোন ভূমিকাই ছিল না। যুদ্ধ শুরু হলে চাকমা রাজা ত্রিবিদ রায় এবং বোমাং রাজার ভাই পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নেয়।[২] স্বাভাবিকভাবেই তাদের অনুগত অধিকাংশ চাকমা এবং অন্যান্য উপজাতিভুক্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তির সাথে যোগ দেয়। দেশ স্বাধীন হবার পর ত্রিবিদ রায় পাকিস্তানে চলে যায়। কিন্তু তার অনুসারী চাকমাসহ অন্যান্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামেই থেকে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সার্কেলের রাজারা ১৯৪৭ সনে পাকিস্তানের বাহিরে থাকতে চাইলেও ১৯৭১ সনে তারা এবং তাদের অধিকাংশ অনুসারী-অনুগতরা পাকিস্তান রক্ষার জন্য বাঙ্গালীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করে। ■

---

[১] S. Mahmud Ali : The Fearful State : Put Not : P.100.
দৈনিক জনতা ঃ ঢাকা ঃ ৬ এপ্রিল, ১৯৯১।

[২] Two very visible figures, the Chakma Raja and the brother of the Bomang Raja sided with Pakistan. Life is not ours. P.14.

বাংলাদেশ আমল ঃ শুরুতেই চ্যালেঞ্জ

চাকমারা যে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্বকে মেনে নিতে পারেনি তা ঢেকে রাখতে তারা চরম ভাবে ব্যর্থ হয়। যে দেশ স্বাধীন করতে তাদের সামান্যতম অবদানও নেই, তার কাছে তথাকথিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের অবাস্তব দাবী তোলে তারা এদেশের আঞ্চলিক অখন্ডতার বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে দেশ স্বাধীন হবার অল্প ক'দিনের মধ্যেই। অথচ পাকিস্তানের ২৪ বছর বয়সে তারা কোনদিন তথাকথিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন তো দূরের কথা, কোন বিষয়ে সুবিধা প্রাপ্তির দাবীও উত্থাপন করেনি। এমনকি পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত উপজাতীয়দের অবৈধভাবে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা যখন একটির পর একটির বিলুপ্তি ঘটায় তখন তার বিরুদ্ধে একটি শব্দও তারা উচ্চারণ করেনি।

অথচ দেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরেই বিধ্বস্থ স্বদেশ গড়ার অংশীদার না হয়ে চাকমারা সারা বিশ্বকে হতচকিত করে বিচ্ছিন্নতার দাবী তোলে তথাকথিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের আবরণে। শেখ মুজিব পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের যথাক্রমে ১৯ (২৯ জানুয়ারী) ও ৩৬ (১৫ ফেব্রুয়ারী) দিনের মাথায় পার্বত্য চট্টগ্রামের দু'টি উপজাতি প্রতিনিধিদল শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাত করে। নিহত মানবেন্দ্র নারায়ন লারমারা তথাকথিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী সম্বলিত যে স্মারকলিপি শেখ মুজিবের কাছে হস্তান্তরের চেষ্টা করে তা দেখে শেখ মুজিব সঙ্গত কারণে বিস্মিত এবং ক্ষুদ্ধ হন। দেশের হাল ঠিকভাবে ধরার আগেই এ ধরণের অবান্তর ও অবাস্তব দাবী শেখ মুজিবের নতুন সরকারকে বিব্রত ও ব্যর্থ করার তথা দেশের আঞ্চলিক অখন্ডতার প্রতি হুমকি সৃষ্টির সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত। এ ধরণের আজগুবি দাবী শেখ মুজিবের মতো জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্বের স্বদেশপ্রেম ও অনুভূতিতে আঘাত হানে। ক্ষুদ্ধ শেখ মুজিব লারমার প্রতিনিধিদের সাথে ৩/৪ মিনিট কথা বলেন। তিনি তাদের বসতেও বলেননি কিংবা তাদের স্মারকলিপিও গ্রহণ করেননি।[১১] হাতে নিয়ে তিনি স্মারকলিপিটি পুনরায় লারমার হাতে ফেরত দেন।

অনেকেই মনে করেন শেখ মুজিব পাকিস্তানের কাছ হতে ৬-দফা দাবীর মাধ্যমে পাকিস্তান হতে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার যে পরিবেশ সৃষ্টি

Life is not ours : Ibd. P.14.

করেছিলেন, মানবেন্দ্র লারমারও সে কৌশল শেখ মুজিব তথা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু যে বাস্তব কারণ ও পরিবেশে শেখ মুজিব ৬-দফা দাবী পেশ করে তা আদায়ের আন্দোলন শুরু করেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে তা মোটেই প্রযোজ্য ছিল না। কারণ ঃ

১. পাকিস্তান তার পূর্বাংশকে নির্মমভাবে শোষণ করেছে এবং সব উন্নয়নমূলক কাজ ও সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানকে বঞ্চিত করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রামকে কোনভাবেই শোষণ করেনি কিংবা বঞ্চিত করেনি। অথবা একান্তভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পদ দিয়েও বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে না।

২. পকিস্তান বাংলাদেশ হতে ১২শত মাইল দূরে, যার সাথে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, ইতিহাস-ঐতিহ্যের কোন মিল নেই। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে বাংলাদেশের অংশ। আমরা এর প্রকৃত ও বৈধ মালিক। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা দখলদার শক্তি নই।

৩. পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে বাস করত এবং পাকিস্তানের মোট জাতীয় আয়ের ৬০% বাংলাদেশে হতে আসত। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা হলো বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার .৪৫% এরও নীচে এবং বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের মাত্র ৩% পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে আসে। অথচ খরচ হয় অনেক বেশী।

৪. পাকিস্তানের ২৩ বছরের নির্মম শোষণ ও বঞ্চনার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ মেয়াদী আন্দোলনের পর ৬-দফা দাবী উত্থাপনের যে সঙ্গত পরিবেশ ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়, পার্বত্য অঞ্চলে তেমন আন্দোলন শুরু করার ন্যায়সঙ্গত কারণ ও পরিবেশ কখনই ছিল না। তাছাড়া আমরা দেশের ৯৯.৫৫% জনগণকে বঞ্চিত রেখে মাত্র .৪৫% উপজাতীয় জনগণের জন্য দেশের ১০% ভূমি ত্যাগ করতে পারিনা।

৫. ৬-দফা দাবীতে পূর্ব-পাকিস্তান হতে অবাঙ্গালীদের সরিয়ে নেবার, সেনাবাহিনী ও সেনানিবাস প্রত্যাহার করার মতো মারাত্মক আবদার ছিলনা।

৬, সর্বোপরি, ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য শেখ মুজিব কোন সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলেননি, কিংবা যুদ্ধও শুরু করেননি।

মানবেন্দ্র লারমাসহ অন্যান্য চাকমা নেতৃত্ব এ সব সঙ্গত বিষয়গুলো সম্পর্কে নিঃসন্দেহে ওয়াকিবহাল থাকার কথা। তারা বুঝতে পেরেছে যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে এ ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবী উত্থাপন করা যায়, তা

পার্বত্য চট্টগ্রামে নেই এবং ব্যাপক সংখ্যক উপজাতি জনগণও এ সব দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এ সব দাবী আদায় কখনোই সম্ভব হবে না।

মানবেন্দ্র লারমা ও তার সহযোগীরা শেখ মুজিবের কাছে প্রত্যাখাত হয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর শরণাপন্ন হয়। ■

'পার্বত্য চট্টগ্রাম' নাম মুছে ফেলার চক্রান্ত

ঐতিহাসিক তথ্যাদি উপস্থাপন করে ইতোপূর্বেই আমি দেখিয়েছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৭৬০ সনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার নবাব মীর কাশেম আলী খাঁর নিকট হতে চট্টগ্রামের জমিদারী লাভ করে। পরে প্রশাসনিক ও খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলকে পৃথক করে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে নতুন জেলার পত্তন করে। এখানে লক্ষ্যণীয়, নতুন জেলার মর্যাদা পেলেও ইহার 'চট্টগ্রাম' পরিচিতি অক্ষুণ্ন থাকে। সমগ্র ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও এই নাম অব্যাহত থাকে। ১৯৮৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি জেলায় বিভক্ত করা হলেও এখনও তিনটি জেলাকে একত্রে বুঝাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামই দেশে-বিদেশে সমধিক পরিচিত। অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিচিতি চট্টগ্রামের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলকে উপজাতীয় অঞ্চল হিসেবে পরিচিত করার ইতিহাস আদি এবং মৌলিক নয়, তৎকালীন বাংলার সমতল ভূমি ছিল একদিকে প্রাচুর্যময় এবং অন্যদিকে বিরল বসতি সম্পন্ন। তাই বাংলার মানুষ তাদের দেশের পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপনকে প্রয়োজন বলে মনে করেনি। তাই ঐ অঞ্চল বলতে গেলে লোক বসতিহীনই থেকে যায়। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, বহু বিদেশী তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য যুগে যুগে বাংলাদেশে আসে এবং এদেশের সম্পদ ও জনগণের উদার আচরণে মুগ্ধ হয়ে এদেশেই থেকে যায়। বিদেশাগতরা কোন সমস্যা সৃষ্টি না করলে স্থানীয় জনগণ কখনোই তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়নি।

চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে পঞ্চদশ শতাব্দীর পর হতে বিভিন্ন উপজাতির অনুপ্রবেশ ঘটলেও তারা এদেশের জনগণের জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনি। তাদের নেতৃস্থানীয় সর্দাররা (যারা রাজা হিসেবে পরিচিত) বাংলার শাসক ও শাসনের প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য প্রকাশ করে। বিভিন্ন সময়ে বিবিধ কারণে বাংলার শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন হলেও উপজাতীয়দের আনুগত্যে কোন হেরফের ঘটেনি। যখন যে ব্যক্তি, শক্তি বা বংশ বাংলাকে শাসন করেছে, উপজাতীয়রা তার প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্য বাংলাদেশের ভাগ্যের সাথে ওৎপোতভাবে জড়িত। বিগত এক হাজার বছরে স্বদেশী-বিদেশী বহুজাতি ও বংশ বাংলাদেশ শাসন করলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের মূল শাসন কাঠামো ও কেন্দ্র হতে কখনোই বিচ্ছিন্ন হয়নি, অন্যকোন দেশের সাথে মিশে যায়নি, কিংবা পৃথক অস্তিত্বের অধিকারী হয়ে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অর্জন

করেনি। এর মূল কারণ হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অস্তিত্বের সাথে এমন নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত যে একে পৃথক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করার কল্পনা কেউই করেনি। কেননা ইহা বাংলাদেশের আত্মার মতো অচ্ছেদ্য।

বিভিন্ন উপজাতি এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবত বসবাস করলেও তাদের পক্ষ হতেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী সে ব্রিটিশ, এমনকি পাকিস্তান আমলেও কেউ উত্থাপন করেনি। কারণ উপজাতীয়রা জানে যে, তারা এই অঞ্চলের ভূমিজ সন্তান নয়, বহিরাগত আশ্রয় গ্রহণকারী। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' নামটি যেহেতু বাংলাদেশের সাথে এই অঞ্চলের আদি, অকৃত্রিম ও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার প্রতীক তাই চাকমা সন্ত্রাসীরা চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পৃক্ততা মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে একে তথাকথিত জুম্মল্যান্ডে নামে অভিহিত করার দাবী তুলেছে। তাদের এই চক্রান্ত একেবারে হাল আমলের। তারা পার্বত্যবাসী উপজাতীয়দের বলে 'জুম্ম জনগন এবং তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তথাকথিত 'জুম্মল্যান্ড'। অথচ তাদের বিচ্ছিন্নতার কার্যক্রম শুরু হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিচয়ে। ১৯৭২ সনের ২৪ জুন রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয়দের এক সম্মেলন যে সংগঠনের গোড়া পত্তন হয় এবং যার অধীনে বিপথগামী চাকমরা এখন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে তার নাম 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'। মানবেন্দু লারমাসহ হাল আমলের সান্টু লারমাও পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন চেয়েছিলেন। কিন্তু অতি সম্প্রতি তারা তাদের সংগঠনের নাম অপরিবর্তিত রেখে তাদের কল্পিত স্বপ্নপুরীর নাম রেখেছেন 'জুম্মল্যান্ড'। তাদের ভাষায় একমাত্র জুম্ম জনগণের অর্থাৎ উপজাতীয় জনগণের দেশ হবে জুম্মল্যান্ড। এ ধরণের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অভিহিত তথা পরিচিত করার প্রয়াস চালানোর মাধ্যমে শান্তিবাহিনীসহ বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলো এই সংকেত দিচ্ছে যে তথাকথিত জুম্মল্যান্ডে উপজাতীয় ছাড়া অন্য কেউ অর্থাৎ বাঙ্গালীরা বসবাস করতে পারবে না। তাদের এই সংকেতের সাথে তাদের দাবীর সংগতি রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, ১৯৪৭ সনের ১৭ আগষ্টের পর হতে যে সব বাঙ্গালী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেছে, তাদের সবাইকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বহিস্কার করতে হবে।

কিন্তু এ ধরণের ধারণা কিংবা আকাংখা স্বপ্ন-বিলাস মাত্র। যতো শক্তিধর প্রভুই তাদের পেছনে থাকুক না কেন, ১২ কোটি মানুষ কখনোই একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত গুটি কয়েক সন্ত্রাসীর অবৈধ চাপের মুখে নতি স্বীকার করবে - এমন ভাবনা উম্মাদের পক্ষ্যেই সম্ভব। বাংলাদেশে যদি কোনদিন একান্তভাবেই ভারত-ঘেষা তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলেই হয়তো এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে। অন্যথায় শ্রীলংকা তার স্বদেশের অখন্ডতা রক্ষায় ভারতীয় চর তামিল

টাইগারদের যেভাবে নির্মূল করছে, চাকমা সন্ত্রাসীদের তার চেয়েও নির্মম পরিণতি ভোগ করতে হবে। তামিলরা শ্রীলংকার মোট জনসংখ্যার ১২.৫%, আর চাকমারা (যদি সব উপজাতিদের সমর্থন পেয়েও যায়) মাত্র .৪৫%। আমাদের বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, যে দেশ ৩০ লাখ শহীদের রক্ত-সাগর পেরিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় সেদেশ আরও ৩০ লাখ জীবন উৎসর্গ করাকে বেশী মূল্যবান মনে করবে না।

সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক, আদি ও অকৃত্রিম পরিচিতি ও ধারাবাহিকতা নস্যাতের যেকোন প্রচেষ্টা চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্যর্থ হতে বাধ্য। ■

অধিবাসী

- বাংলাদেশে উপজাতি জনগোষ্ঠী
- বহিরাগতদের আশ্রয়স্থল
- অজ্ঞাতস্থানের অধিবাসী-চাকমা

বাংলাদেশে উপজাতি জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশ আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এদেশে বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপজাতি সম্প্রদায় বসবাস করছে। এদের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অতি সম্প্রতি (১৯৯৬ সনের আগষ্ট মাসের দিকে) কলিকাতা হতে প্রকাশিত "পার্বত্য চট্টগ্রাম - সীমান্তের রাজনীতি ও সংগ্রাম" শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় দেবযানী দত্ত ও অনুসূয়া বসু রায় চৌধুরী "সমগ্র বাংলাদেশে ৫০টি উপজাতি জনগোষ্ঠী অন্ততঃ পক্ষে ২০টি জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে" বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তারা এই ৫০টি উপজাতির কিংবা ২০টি জেলার নাম উল্লেখ করেননি।

অন্যদিকে বাংলাদেশের উপজাতি বিষয়ক স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ ও গবেষক জনাব আবদুস সাত্তার এর এতদসংক্রান্ত গবেষণা অনেক পুরানো ও তথ্য-নির্ভর। তিনি উপজাতিদের নামের তালিকা প্রদান করে তারা দেশের কোন কোন অঞ্চলে বসবাস করছে তারও সংক্ষিপ্ত ধারণা দানে সচেষ্ট হয়েছেন।[১]

তার মতে "বাংলাদেশে মোট ২৯টি উপজাতীয় জনগোষ্ঠী বসবাস করে। এদের মধ্যে বেশী সংখ্যক উপজাতীয় লোক বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় লোকদের মধ্যে চাকমা, মগ বা মারমা, টিপরা, কুকি, লুসাই, মুরং, মুরু, সাক, দৈংনাক, তংচঙ্গ্যা, পাঙ্গো, বনজোগী, বম, সেন্দুজ ও খুমী প্রধান।

মগ সম্প্রদায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও কক্সবাজার জেলার এবং পটুয়াখালি জেলার খেপুপাড়া, নলুয়া, কলমীচর, মুকরী, চাপালী, খাপড়াভাঙ্গা, মাধবী, নিশানবাড়ী এবং কুস্রী প্রভৃতি স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছে। সিলেট জেলার উপকণ্ঠে মনিপুর পাড়া, মৌলবী বাজারের ভানুগাছ এবং হবিগঞ্জ জেলার আসাম পাড়া প্রভৃতি স্থানে রয়েছে মনিপুরী সম্প্রদায়। এদের পাশাপাশি বসবাস করছে মনিপুরীদের মৈতেই শাখার ধর্মান্তরিত আর একটি গোষ্ঠী। এদের নাম পাঙন এবং এরা মুসলমান। সিলেট জেলার জৈন্তিয়াপুর, জাপলং, তামাবিল ও সুনামগঞ্জ জেলার খাসীয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ের সীমান্তবর্তী অংশে খাসীয়াদেরকে বসবাস করতে দেখা যায়।

ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট, কলমাকান্দা, বিরিশিরি, শ্রীবর্দী, বারহাট্টা প্রভৃতি স্থানে গারো ও হাজং সমাজ ছাড়াও বসবাস করছে হদি, দালুই,

---

[১] আবদুস সাত্তার ঃ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যঃ বাংলা একাডেমীঃ ঢাকা ঃ ১৯৭৯ সনঃ পৃঃ ১-২.

বোনা ও মান্দাই জনগোষ্ঠী। গারো ও মান্দাই সম্প্রদায় টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর এলাকা এবং কিছু সংখ্যক গারো ঢাকা জেলার ভাওয়াল এবং সুনামগঞ্জ জেলার খাসিয়া-জৈন্তিয়া সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বাস করে। রংপুর জেলায়ও কিছুসংখ্যক গারো রয়েছে। রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও রাজশাহী জেলায় বাস করে সাঁওতাল, ওরাওঁ, হো, মুন্ডা, কোচ, রাজবংশী ও পালিয়া। সাঁওতালগণ চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে এবং দিনাজপুর জেলার বিরল, সেতাবগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁ জেলার তেঁতুলিয়া ও পঁচাগড় প্রভৃতি স্থানে সংখ্যায় বেশী। ওরাওঁগণ বগুড়া জেলার কদমপুর, আটাপুর এবং রংপুর জেলার বদলীপুকুর, মনিনপুর, গোপালপুর, মিঠাপুকুর, হজরতপুর, সখীপুর, দুর্গাপুর, চাঁদপুর, মেহেদীপুর, ছিড়ারপাড়, আমতলা কর্টিনাওভাঙ্গা, কুড়াপাড়া ও কুচুয়া প্রভৃতি স্থানে সংখ্যায় অধিক।

রাজবংশী সম্প্রদায় রংপুরে হলদীবাড়ী, চিলাহাটি, ডোমার ও নীলফামারী জেলাতে এবং পালিয়াগণ নওগাঁ জেলায় বেশী পরিমাণে বাস করে। হো, মুন্ডা এবং কোচ সম্প্রদায় সংখ্যায় খুব নগণ্য এবং এরা রংপুর ও দিনাজপুর জেলায়ই বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছে।"

যেহেতু আলোচ্য গ্রন্থের মূল বিষয়ই হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতি জনগোষ্ঠীর পরিচয় আরো বিস্তৃত পরিসরে হওয়া উচিত। ■

বহিরাগতদের আশ্রয়স্থল

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতিসমূহের সবগুলোই বহিরাগত। এরা কেউই এ অঞ্চলের ভূমিজ সন্তান নয়। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল হতে আগত ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও কৃষ্টি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী এ সব উপজাতি সম্প্রদায়গুলো চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এ সব উপজাতিসমূহের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতির দিকে তাকানো যাক।

মারমা ঃ মারমা'রা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মগ নামে সমাধিক পরিচিত। মারমাদের মতে মগ নামে কোন জাতি বা উপজাতি নেই। তাই তারা মারমা নামে পরিচিত হতে পছন্দ করে। পূর্বে বাংলাদেশে 'মগ' বলতে আরাকানী জলদস্যু ও লুটেরাদের বুঝানো হতো। "মারমা শব্দটি ম্রাইমা শব্দ থেকে উদ্ভূত।"[২১] লক্ষ্যণীয় যে সম্প্রতি বর্মা সরকার তাদের দেশের নাম বদলিয়ে মায়ানমার রেখেছে। 'মারমা', 'ম্রাইমা', 'মায়ানমার' প্রভৃতি শব্দ সমগোত্রীয় এবং এ থেকে বুঝা যায় যে মগ তথা আধুনিক মারমা'রা বর্মা অর্থাৎ মায়ানমারের অধিবাসী। মুঘল আমলে আরাকানী মগরা প্রায়ই বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী চট্টগ্রাম - নোয়াখালী অঞ্চলে হানা দিয়ে নানা ধরণের অত্যাচার ও লুন্ঠন করত বলে মুঘলরা মগদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। R.H.S Hutchinson এর প্রদত্ত তথ্য উদ্ধৃত করে সুগত চাকমা জানিয়েছেন মুঘলদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে মারমা রাজা ১৭৫৬ সালে আরাকানে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে পুনরায় ১৭৭৪ সালে তিনি এদিকে (অর্থাৎ তৎকালীন চট্টগ্রাম অঞ্চল) এসে প্রথমে রামুতে, ঈদগরে, তারপর মাতামুহুরী উপত্যকায় এবং সবশেষে ১৮০৪ সালে বর্তমান বান্দরবন শহরে বসতি স্থাপন করেন।[২২]

সুগত চাকমা তার উল্লেখিত গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "১৭৮৪ সালে বর্মীরাজা ভোদফ্রা (বোদপায়া)'র প্রেরিত বর্মী সেনাবাহিনী স্বাধীন আরাকান রাজ্য দখল করে। ঐ সময় আরাকান থেকে হাজার হাজার শরণার্থী এদিকে কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালীতে পালিয়ে আসে এবং এই সকল অঞ্চলগুলিতে স্থায়ীভাবে থেকে যায়।"

---

[২১] মিঃ ক্যশৈপ্রত ঃ মারমা উপজাতি পরিচিত ঃ অঙ্কুর ঃ ১ম সংখ্যা ঃ রাঙ্গামাটিঃ ১৯৮১।

[২২] সুগত চাকমা ঃ পাবর্ত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি ঃ রাঙ্গামাটি ঃ ১৯৯৩ ঃ পৃঃ ৪০। মিঃ হুচেনচনের তথ্যে সামান্য বিকৃতি রয়েছে। ঐ সময়ে চট্টগ্রাম অঞ্চল মুঘলদের নয়, বাংলার নবাবদের অধীনে ছিল, মুদ্রণ প্রমাদ বশত হয়তো সাল ভুল হয়েছে।

মুরং ঃ কয়েক শতাব্দী আগে আরাকান অঞ্চল হতে আগত মুরংরা প্রধানতঃ বান্দরবান জেলায় বাস করে।[৩১] অনেকের কাছেই তারা ম্রো হিসেবে পরিচিত। স্মরণাতীতকাল থেকে তারা বার্মার আরাকান রাজ্যে বসবাস করে আসছে। উত্তর বার্মা থেকেই ম্রো (মুরং)রা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিল।[৩২] অথচ কারো কারো মতে অন্যান্য উপজাতিদের তুলনায় মুরংরা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাচীনতম অধিবাসী।[৩৩]

ত্রিপুরা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলাতেই ত্রিপুরাদের উপস্থিতি থাকলেও তারা খাগড়াছড়িতে তুলনামূলকভাবে কেন্দ্রীভূত । বাংলাদেশী ত্রিপুরাদের আদি নিবাস ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। সেখান থেকে অতীতে তাদের লোকজন পার্বত্য চট্টগ্রামের এসেছিল।[৩৪]

একথা সত্যি যে, ত্রিপুরার রাজারা কখনো কখনো তাদের দক্ষিণের প্রতিবেশী অঞ্চল, বর্তমানের পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় নিত। ১৬৬১ সালে ত্রিপুরার সিংহাসন নিয়ে ছত্রমানিক্যের সাথে বিরোধ দেখা দিলে গোবিন্দ মানিক্য নিজেই দীঘিনালায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে গোবিন্দ মানিক্য কিংবা তার আগের বা পরের রাজাদের অনুসারী কিংবা অনুসারীদের আত্মীয়স্বজন পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে চলে আসে।

লুসাই ঃ লুসাই পাহাড়ে (বর্তমান মিজোরাম) বসবাসকারী উপজাতিরাই প্রধানতঃ লুসাই নামে পরিচিত, যদিও লুসাই পাহাড়ে অন্যান্য নামের উপজাতিও বাস করে। সুতরাং লুসাইদের মূল বসবাস ভারতের মিজোরাম রাজ্যের লুসাই পাহাড়ে।[৩৫] তারা প্রায় ১শত ৫০ বছর আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসেছিল।[৩৬] পার্বত্য চট্টগ্রামের সাজেক এলাকায় লুসাইরা কেন্দ্রীভূত।

খুমি ঃ খুমিরা প্রধানতঃ বান্দরবানের মুদ, থানচি, রুমা ও লামা এলাকায় বসবাস করছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে খুমিরা পার্বত্য চট্টগ্রামে হিজরত করার আগে মায়ানমারের আরাকান অঞ্চলে বসবাস করত।[৩৭] Captain T.

---

৩১ Mr. Mijanur Rahman Shelley : the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh : Centre for Development Research : Dhaka : 1992 : P.53.

৩২ সুগত চাকমা ঃ ঐ ঃ পৃঃ ৫৭।

৩৩ আবদুল হাফিজ ঃ পাকিস্থানের উপজাতি ঃ পাকিস্থান পাবলিকেশন্‌স ঃ ঢাকা ঃ ১৯৬৩ঃ পৃঃ ৪৫।

৩৪ সুগত চাকমা ঃ পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ৪৬।

৩৫ সুগত চাকমা ঃ ঐ ঃ পৃঃ ৮১।

৩৬ Dr. Mizanur Rahman Shelly : Ibid : P.57.

৩৭ Mr. Mizanur Rahman Shelly : Ibid : P.58.

H. Lewin এর প্রদত্ত তথ্য উদ্ধৃত করে সুগত চাকমা জানিয়েছেন যে, আরাকানে খুমি ও ম্রোদের মধ্যে একটি প্রচন্ড রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল। ঐ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জয়ী হয়ে খুমিরা ম্রোদেরকে এদিকে (অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম) বিতাড়িত করে দেয় এবং পরে সম্ভবত তারাও অন্যান্যদের চাপে পড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে আসে।[৩৮]

বোম ঃ বোমরা প্রধানত ঃ বান্দরবান জেলার রুমা অঞ্চলে বসবাস করে। সুগত চাকমা'র মতে বোমরা ১৮৩৮-৩৯ সালের দিকে লিয়ানকুং (Liankung) নামক সর্দারের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে প্রবেশ করে। এবং তৎকালীন বোমাং রাজার বিনা অনুমতিতে বান্দরবান জেলায় থেকে যায়।

খিয়াং ঃ খিয়াংরা প্রধানতঃ রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই ও চন্দ্রঘোনা অঞ্চলে বসবাস করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে খিয়াংরা আরাকানের উমাতানং (Umatanong) পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাস করত।[৩৯] তারা কবে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিল তা স্পষ্ট নয়। বান্দরবান হতে প্রকাশিত 'গিরি নির্জর' পত্রিকায় (৩য় সংখ্যাঃ ১৯৮৩) প্রকাশিত প্রদীপ চৌধুরী রচিত 'খিয়াং উপজাতি' শীর্ষক প্রবন্ধে জনশ্রুতিকে অবলম্বন করে বলা হয়েছে যে, কোন এক সময় খিয়াংদের কোন এক রাজা একযুদ্ধের সময় বার্মা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে আসেন এবং স্বদেশে ফেরার সময় তার ছোট রানীকে অন্তস্বত্তা অবস্থায় এখানে (পার্বত্য চট্টগ্রামে) ফেলে যান। খিয়াংদের ধারণা তারা এখানে ফেলে যাওয়া ছোট রানীর সাথে থেকে যাওয়া লোকদেরই বংশধর।

চাক ঃ চাকমাদের আদি পরিচয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে চাকদের আদিবাসের সাথেও আমরা পরিচিত হয়েছি। তাদের আদিবাস মায়ানমারের সীমান্তবর্তী চীনের য়ুনান প্রদেশে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলার বাইশারি, নাইক্ষ্যংছড়ি, আলিখ্যং, কোয়াংঝিরি, ক্রোক্ষাং, রাইখালী অঞ্চলে বসবাসকারী চাক'রা মূলতঃ আরাকান থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল। তারা কবে চীন থেকে আরাকানে এবং আরাকান থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যাচ্ছেনা। সুগত চাকমার স্বীকোরুক্তি -- সম্ভবতঃ অতীতে কোন এক সময় আরাকান থেকে চাকদের একটি দল বাঘখালী নদীকে অনুসরণ করে ও অতিক্রম করে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছিল।[৪০]

---

[৩৮] সুগত চাকমা ঃ প্রাগুপ্ত ঃ পৃঃ ৮১।

[৩৯] Mr. Mizanur Rahman Shelly : Ibid : P.62.

সুগত চাকমা ঃ পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ৬৪।

পাংখো ঃ পাংখো'রা ভারতের লুসাই পাহাড় বা মিজোরাম হতে বাংলাদেশে এসেছে।[৪১] পাংখোদের বিশ্বাস অতীতে তারা মিজোরামের পাংখোয়া নামক গ্রামে বাস করত।[৪২]

তংচঙ্গা ঃ চাকমারা তংচঙ্গাদের পৃথক উপজাতি বলে স্বীকৃতি দেয়না। একথা সত্যি যে তারা চাকমাদেরই একটি উপশাখা। কিন্তু তংচঙ্গারা এখন আর তা স্বীকার করেনা। তারা মনে করে তারা একটি পৃথক জাতিসত্ত্বার অধিকারী।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতীয়দের মধ্যে চাকমারা সংখ্যাগুরু। শিক্ষা-দীক্ষায়, সরকারী চাকরি তথা সহায়-সম্পদে তারা অন্যান্য উপজাতিদের চেয়ে অগ্রগামী। পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান বিচ্ছন্নতাবাদী সশস্ত্র সন্ত্রাসের উদ্যোক্তা ও অগ্রদূত তারাই। চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে একচ্ছত্র অধিপতি হবার স্বপ্নসাধে বিভোর হয়ে চলমান বিচ্ছিন্নতাবাদী পথে অগ্রসর হয়েছে। অথচ তারাও এদেশের ভূমিজ সন্তান নয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে এরাই একমাত্র উপজাতি যাদের আদি বাসস্থানের কোন হদিস নেই। এদের ব্যাপারে তাই বিশদ আলোচনায় যেতে চাই। ■

---

[৪১] Mr. Mijanur Rahman Shelly : Ibid : P.64.

[৪২] স্বগত চাকমা ঃ পূর্বোক্ত ঃ পৃ ঃ ৮৫।

অজ্ঞাতস্থানের অধিবাসী - চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করার ভারতীয় নীল নক্শা বাস্তবায়নে যে বাহকশ্রেণী সেখানে সশস্ত্র সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে তাদের অধিকাংশই হলো চাকমা উপজাতিভুক্ত বিপথগামী। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১৩টি উপজাতির মধ্যে চাকমারা জনসংখ্যায়, শিক্ষায় ও আর্থিক সমৃদ্ধিতে অগ্রগামী হওয়ায় তাদের মনে এ প্রতীতী জন্মেছে যে, ঐ অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে, তারাই হবে ঐ স্বপ্নিল রাষ্ট্রের ভাগ্যবিধাতা, মালিক-মোক্তার। এই প্রভুত্ব অর্জনের প্রচেষ্টায় তারা অন্যান্য উপজাতিদের নাম ভাঙ্গিয়ে সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল হতে বাঙ্গালীদের বিতাড়িত করে শুধুমাত্র উপজাতিদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে চাকমা কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর। অথচ চাকমাসহ অন্যান্য উপজাতিদের কেউই বাংলাদেশের তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিজ সন্তান নয়। বহিরাগত উপজাতীয়দের পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন ও বসতি নির্মাণ প্রসঙ্গে ইতোমধ্যেই আমি সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছি। যেহেতু চলমান বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাস চাকমাদেরই সৃষ্ট, তাই তাদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় যেতে চাই। চাকমাদের আদি বাসস্থান, ভাষা, সর্বোপরি "চাকমা" নামের পরিচয় খুঁজতে গেলে দেখা যাবে মূলতঃ তারা একটি শিকড়হীন যাযাবর জাতি বিশেষ, যাদের স্থায়ী ইতিহাসের সূত্রপাত হয়েছে মূলতঃ বাঙ্গালীদের সংস্পর্শে এসে, তাদের ভাষা সৃষ্টি ও সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা ভাষার প্রভাবে এবং তারা সত্যিকার স্থায়ী ও শান্তিময় আশ্রয় পেয়েছে বাংলাদেশে। বিশ্লেষণে আরো প্রমাণিত হয় যে, চাকমারা বাংলাদেশে যে অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছিল তা ছিল বাঙ্গালী অধ্যুষিত।

চাকমাদের কল্পিত গৌরব নিয়ে আজগুবি ইতিহাস রচনাকারী সতীশ চন্দ্র ঘোষ এবং তার অনুসারী স্বদেশী - বিদেশী বুদ্ধিজীবীরা চাকমাদের প্রসংগে বহু আষাঢ়ে গল্প উপস্থাপন করলেও তাদের আদিবাস যে পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, এই সত্যটিকে বিকৃত করার সুযোগ পাননি। সতীশ ঘোষের একান্ত অনুসারী বিরাজ মোহন দেওয়ান "চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত" শীর্ষক গ্রন্থে 'জাতীয় পরিচয়' পরিচ্ছেদে ৭৬ পৃষ্ঠাব্যাপী গবেষণামূলক তথ্য উপস্থাপন করে উপসংহারে মন্তব্য করেছেন, "চাকমাদের পূর্ব-পুরুষরা যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিজ সন্তান নহে তাহা ----- স্পষ্ট"।[১]

---

[১] চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত ঃ নিউ রাঙ্গামাটি ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ ১৯৬৯ ঃ পৃঃ ৯৪।

চাকমাদের আদি বাসস্থান তথা শিকড় সন্ধান করতে গিয়ে চাকমা ঐতিহাসিকগণ চম্পাপুরী বা চম্পক নগর রাজ্যের যে ফিরিস্তি দিচ্ছেন তার পেছনে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। বিরাজ মোহন তার গ্রন্থে ভারতে এবং ভারতের বাইরে কমপক্ষে ৫টি স্থানের নাম চম্পক নগর বা চম্পাপুরী রয়েছে বলে দাবী করেছেন।

চম্পক নগরের সন্ধান করতে গিয়ে বিরাজ মোহন উত্তর ব্রহ্ম (শান), প্রাচীন মগধ (বর্তমানে বিহারে), কালাবাঘা (বর্তমান আসাম), প্রাচীন মালাক্কা (বর্তমান মালয়), কৌচিনে এবং হিমালয়ের পাদদেশস্থ সাংগুপু নদীর তীর (বর্তমান ব্রহ্মপুত্র) প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে চম্পক নগরের অস্তিত্ব খুঁজে বেড়িয়েছেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি আসল চম্পক নগর কোথায়, কোন চম্পক নগর হতে চাকমারা এসেছে, এমনকি চাকমারা বাস্তব অর্থে কখনো কোন চম্পক নগরের অধিবাসী ছিল কি না। অশোক কুমার দেওয়ান তার গ্রন্থে বলেছেন, "বর্তমান ভারতে এবং ভারতের বাইরে বহু চম্পাপুরী বা চম্পক নগরের নাম পাওয়া যায়। এই জন্য এই নামটি নিয়ে বিভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক।"[২২] 'চম্পক' বা 'চম্পা' কথাটির সাথে 'চাকমা' শব্দটির কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে বলেই হয়ত চাকমারা 'চম্পক' বা 'চম্পানগর'কে তাদের আদি বাসস্থান বলে প্রমাণ করতে চান। চম্পক নগর স্থানটি চাকমাদের অস্তিত্ব আবিস্কারের জন্য একান্ত অপরিহার্য বলেই চাকমাদের কল্পনাপ্রবণ বুদ্ধিজীবীরা চম্পকনগর বা চম্পাপুরীকে তাদের আদি বাসস্থান বলে প্রচার করছে।

বিরাজ মোহনের স্বীকারোক্তি "পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতি ও চাকমাদের সম্পর্কে যেসব উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে চাকমাগণ কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং তাহাদের আদি উৎপত্তিই বা কোথায় বহু গ্রন্থকার ঐ বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছেন। কিন্তু এই জাতির (চাকমা) সঠিক পরিচয় নির্ণয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।"[২৩] তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন, "চাকমাদের কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ নেই। ----- জাতির প্রকৃত নামটিও হারাইয়া গিয়াছে।" "চাকমা জাতির ক্ষেত্রে প্রচলিত স্বীকৃত কিছু লোক কাহিনী এবং লোক কাহিনী ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ্য ইতিহাস নেই।"[২৪]

চাকমারা মূলতঃ কোন দেশের মূল অধিবাসী তা জানা যাচ্ছে না। একটি পালাগানের একটি শব্দের উপর ভিত্তি করে তারা দাবী করে যে তারা বর্মার প্রবেশ

---

[২২] চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার ঃ খাগড়াছড়ি ঃ ১৯৯১ ঃ পৃঃ ৩৫।

[২৩] বিরাজ মোহন দেওয়ান ঃ পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ২।

[২৪] দেবযানী দেত্ত ও অনসূয়া বসু রায় চৌধুরী ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্তের রাজনীতি ও সংগ্রাম ঃ ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ ও সাউথ এশিয়া ফোরাম ফর হিউম্যান রাইটস ঃ ভারতঃ ১৯৯৬ ঃ পৃঃ ১১।

করে বিজয় কুমার নামক জনৈক রাজকুমারের নেতৃত্বে। পিতৃবিয়োগের পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতামূলক পন্থায় ক্ষমতা দখলের প্রেক্ষিতে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করে তথাকথিত বিজিত অঞ্চলে থেকে যান। পরবর্তীতে তার সাথে অবস্থানকারী চাকমাদের সংগে স্বদেশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কোন সনের কোন তারিখে কোন দেশের কোন স্থান তিনি জয় করেছেন তার কোন হদিস নেই। বিজয়গিরি নামক যে কল্পিত রাজপুত্রের ফিরিস্তি ইদানিংকার চাকমা বুদ্ধিজীবীরা গাইছেন, তারা ছাড়া বিশ্বের অন্যকোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে তার কোন সাক্ষ্য বা উল্লেখ নেই। অশোক কুমার দেওয়ানের স্পষ্ট বক্তব্যঃ "রাজা বিজয়গিরি লোক কাহিনীর একজন কল্পিত পুরুষ না সত্যিই একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি সে বিষয়ে শিক্ষিত চাকমা সমাজে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই"।[১] এই সন্দেহের প্রধান কারণ - উপমহাদেশের ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র জনপদের প্রাচীন এবং তাদের পরিবর্তিত আধুনিক নাম আজো বিদ্যমান। খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগের ইতিহাস যেখানে রয়েছে, সে অবস্থায় চম্পক নগর কিংবা বিজয়গিরির কোন হদিস নেই কোন যুক্তিতে। আসলে বিজয়গিরি নামক রাজপুত্র কিংবা চম্পক নগর নামক কোন চাকমা রাজ্য বাস্তবেই ছিল না।

বস্তুতঃ চাকমারা একটি অজ্ঞাত স্থানের পাহাড়ী যাযাবর জাতি, যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূখন্ডে আশ্রয় নিয়েছিল। আবার বিভিন্ন ভূখন্ড হতে বিতাড়িত হয়েছিল। চাকমা বুদ্ধিজীবীদের মতে তারা কখনো হিমালয়ের পাদদেশে, কখনো আসামে, কখনো ত্রিপুরায় কখনো সিলেটে কখনো বার্মায় বসবাস করেছিল। এর মানে এই হলো যে, চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নয় বরং বহিরাগত ও আশ্রিত।

বিরাজ মোহন স্বীকার করেছেন "ব্রহ্মদেশীয় রাজশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে চাকমারা সেখানে শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং কেবল অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানবিক কারণে চট্টগ্রামস্থ সুবেদারের অনুমতি ও সাহায্যে সর্বপ্রথম তৈনছড়ি নদীর তীরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন"। "সেই দুর্দিনে বনানী পথে পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে উপস্থিত হন তখন চট্টগ্রামের বুকে"। সে সময় আজকের পার্বত্য চট্টগ্রাম চট্টগ্রামের সাথে সংযুক্ত ছিল। একই গ্রন্থের ভূমিকায় বিরাজ বাবু আরো স্বীকার করেছেনঃ "চাকমারা এই জেলার আদিবাসী নহে এবং চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দেই তাহারা প্রথমে সুলতানের সুনজরে বাংলায় প্রবেশ করেন।" অন্য একজন চাকমা

---

[১] অশোক কুমার দেওয়ান ঃ পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ৩৫।

বুদ্ধিজীবী স্বীকার করেছেন, ১৫০০ হতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত --- চাকমা প্রজারা দুর্গমগিরি অঞ্চলে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করে।

এসব স্বীকারোক্তি থেকে এই সত্যিই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, চাকমারা বাংলাদেশে আশ্রিত একটি উদ্বাস্ত জনগোষ্ঠী। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব চাকমা সামন্ত রাজার আবির্ভাব ঘটে তারা বংশানুক্রমে বাংলা কিংবা দিল্লীর সুলতান-বাদশাদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার অব্যাহত রাখে। চাকমারা বাংলাদেশ অঞ্চলে কখনোই বাংলার শাসক সুবেদার, সুলতানদের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীন চাকমা রাষ্ট্র বা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি বা করার প্রয়াসও চালায়নি। এ ধরণের প্রচেষ্টার প্রশ্নই উঠে না, কারণ তারা এ দেশের ভূমিজ সন্তান নয়, বরং আশ্রয়প্রাপ্ত বহিরাগত উদ্বাস্ত সম্প্রদায়।

চাকমা বুদ্ধিজীবীরা তাদের রাজাদের যে ফিরিস্তি দেন, তাতেও প্রমাণিত হয় যে তারা কোনভাবেই স্বাধীন সার্বভৌম ছিল না, বরং বাংলার সুবেদার-সুলতানদের কৃপাভাজন হয়ে নামমাত্র রাজা হিসেবে কাজ করেছেন। (যেমন বর্তমানে দেবাশীষ রায় চাকমাদের প্রতীকী রাজা) চাকমা রাজারা মুসলিম নবাব-শাসক-সুবেদার-সুলতানদের এতো বেশী প্রভাবাধীন ছিলেন যে তারা তাদের চাকমা নাম পরিহার করে মুসলিম নাম ধারণ করেন। বিরাজ মোহন দেওয়ান তার গ্রন্থে বেশ ক'জন মুসলিম নামধারী চাকমা রাজার নাম উল্লেখ করেছেন। এরা হলেনঃ রাজা সুলভ খাঁ (১৭১২ খৃঃ), রাজা ফতে খাঁ (১৭১৫ খৃঃ), রাজা সেরমুস্ত খাঁ (১৭৩৭ খৃঃ) প্রমূখ। এমনকি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার ক্ষমতা দখলের পরেও চাকমা রাজারা মুসলিম নাম গ্রহণ অব্যাহত রাখেন। এদের মধ্যে রাজা সের দৌলতখাঁ (১৭৭৬ খৃঃ), রাজা জান বক্স খাঁ (১৭৮২ খৃঃ), রাজা টব্বর খাঁ (১৮০০ খৃঃ), রাজা জান বক্স খাঁ (১৮১২ খৃঃ) প্রমূখের নাম উল্লেখযোগ্য। এসব নাম প্রমাণ করে চাকমাদের মধ্যে মুসলিম শাসক, শাসন ও সংস্কৃতির প্রভাব কত প্রবল ছিল।

চাকমা রাজারা যে স্বাধীন ছিলেন না তার সাক্ষ্য বিরাজ বাবুর স্বীকারোক্তি ঃ "রাজা সেরমুস্ত খাঁ'র সময় চট্টগ্রাম জেলার সমস্ত পার্বত্য অংশ তাহার অধিকারে ছিল। অধিকন্ত তিনি অতিরিক্ত পৃথক খাজনা দিবার কারণে নবাব সরকার হইতে কুলনা মৌজার পুনঃ বন্দোবস্তি নিয়াছিলেন। -- তাহার

(শ্রী সি আর চাকমাঃ যুগবির্বতনে চাকমা জাতি (মধ্যযুগ)ঃ লিলুয়া, হাওড়া পশ্চিম বাংলা ঃ ১৯৮৮ঃ পৃঃ ৬৭)।

বিরাজ মোহন দেওয়ান ঃ পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ৪৬।

শ্রী সি আর চাকমা ঃ যুগ বিবর্তনে চাকমা জাতি (মধ্যযুগ) ঃ লিলুয়া ঃ হাওড়া, পশ্চিম বাংলাঃ ভারত ঃ ১৯৮৮ ঃ পৃঃ৬৭।

সময়েও আরাকানদের অত্যাচার বন্ধ হয় নাই। --- আরাকানরা চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে হানা দিয়া বহু বাঙ্গালীকে বন্দী করিয়া আনে। ইহাতে সেরমুস্ত খাঁ মুঘল নায়েবের (খাজনা আদায়কারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা) সাথে মিত্রতা রক্ষা করিতে থাকেন এবং বহু চাকমা পরিবার বর্গীদের অত্যাচারের ভয়ে পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে"।[১] এখানে দুটো স্বীকৃতি মেলেঃ (১) বাংলার শাসকদের প্রতি চাকমা রাজাদের শর্তহীন আনুগত্য, এবং (২) পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের আশ্রয় গ্রহণ।

চাকমা রাজারা যে স্বাধীন নয়, বরং বাংলার শাসকদের অধীনস্থ ছিলেন - তার দেদীপ্যমান প্রমাণ হলো তাদের প্রচলিত ধাতব মুদ্রায় ফার্সী ভাষা উৎকীর্ণ থাকার ঘটনা। মুসলিম আমলে ফার্সী ছিল এদেশের রাজ-ভাষা। তাই এদেশের মুদ্রায় ফার্সী ভাষায় রাজা, রানী, সুলতান, বাদশাহদের নাম, এমনকি কোন কোনটির ওপর 'আল্লাহ্ রাব্বি' উৎকীর্ণ থাকত। চাকমা রাজারা বাংলার শাসক, সুলতানদের অনুকরণে তাদের মুদ্রার উপরও ফার্সী ভাষা ব্যবহার করে বাংলার সুলতান ও নবাবদের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করতেন। এমনকি অভিজাত চাকমা মহিলারা "বিবি" খেতাবে ভূষিত হতেন। এসব তথ্য সতীশ ঘোষ, বিরাজ মোহন দেওয়ানদের স্বীকৃত। বিরাজ মোহন দেওয়ান "পাকিস্তানের উপজাতি" (পৃঃ৫৯ ঃ প্রথম সংস্করণ ১৯৬৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৬) এবং মাসিক "মাহে নাও" (মে সংখ্যা ঃ ১৯৬১) এর তথ্য উদ্ধৃত করে আরও জানিয়েছেন, "এখনও অশিক্ষিত জনসাধারণ 'সালাম' শব্দ দিয়ে সৌজন্য বিনিময় করে এবং আশ্চর্য বা খেদসূচক আবেগে "খোদার নাম"স্মরণ করিয়া থাকে।"[২] এর পরেও কি কোন চাকমা বুদ্ধিজীবী দাবী করবেন যে, চাকমা রাজ্য বলে কোন স্বাধীন রাজ্য ছিল। সেরমুস্ত খাঁসহ তাবত চাকমা রাজারা বাস্তবে যে রাজা নয়, বরং জমিদার ছিলেন, তেমন প্রমাণ মেলে বিরাজ মোহন দেওয়ান কর্তৃক উদ্ধৃত চাকমা বিগজ'এর দুটো পঙক্তি থেকে ঃ

"আদি রাজা সেরমুস্ত খাঁ রোয়াং ছিল বাড়ী
তারপর শুকদেব রায় বান্ধে জামিদারী।"

উপরোক্ত আলোচনা হতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রমাণিত হয় ঃ

১. চাকমারা বাংলাদেশের ভূমিজ সন্তান নয়, বহিরাগত।
২. তাদের আদি বাসস্থান চম্পক নগর কিংবা পূর্বপুরুষ বিজয়গিরি সম্পর্কে কোন নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য প্রামাণ্য ইতিহাস নেই, উভয়েই কাল্পনিক।
৩. চাকমা রাজারা রাজা উপাধিধারী জমিদার, স্বাধীন রাজা নহে, সর্বোপরি, তারা ছিলেন মুসলমান শাসকদের অধীনস্থ ও প্রভাবিত।

বিরাজ মোহন দেওয়ান ঃ পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ১৫৪।
বিরাজ মোহন দেওয়ান ঃ পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ৩৯।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্বদাই বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে কখনোই স্বাধীন-সার্বভৌম চাকমা রাজ্য ছিল না।

ভাষা

একটি জাতির স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্বের জন্য তার ভাষার, বিশেষত লেখ্য ভাষার উপস্থিতি একান্তভাবে অপরিহার্য। কিন্তু চাকমাদের মধ্যে একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসেও চাকমা ভাষা নামে যে ভাষা চালু রয়েছে তা মোটেই আধুনিক কিংবা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। আধুনিক ভাষাবিদরা চাকমা ভাষাকে একটি ভাষা হিসেবে স্বীকার করেননি। ইদানীং চাকমারা তাদের ভাষাকে একটি আধুনিক ভাষায় পরিণত করার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েও সফল হয়নি। আসলে জোর করে একটি ভাষা সৃষ্টি করা যায় না, যেমন ইচ্ছা করলেই একটি সাগর তৈরী করা যায় না। ভাষা প্রকৃতির মতোই স্বয়ংক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত। নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, প্রভৃতির মতো ভাষাও যেন অনেকটা প্রকৃতিরই সৃষ্টি।

চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত কথ্য ভাষার প্রতি তাকালে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় যে, ইহা বাংলা ভাষারই বিকৃতরূপ। বিশেষত চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব চাকমা ভাষায় বেশ প্রকট। বিরাজ মোহন দেওয়ান স্বীকার করেছেন বাংলা ভাষার সাথে চাকমা ভাষার এমন সামঞ্জস্য রয়েছে যে, ইহাকে বাংলা ভাষার অপভ্রংশ বলা চলে।[১১] "ইহারা (চাকমারা) বাংগালীদের সংস্পর্শে বাস করিতেছে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত। তদুপরি চাকমা ভাষার শতকরা ৮০টির মত বাংলা ও সংস্কৃত শব্দের সংমিশ্রণ রহিয়াছে। বিগত (অর্থাৎ ১৯৬১ সনের) আদম শুমারীতে চাকমা ভাষাকে "চাকমা-বাংলা" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।"[১২] তাদের ভাষাই প্রমাণ করে তারা বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী সম্প্রদায়।

বিট্রিশ আমলে কর্মরত চট্টগ্রামের কমিশনার মিঃ জিন বিসম ৫ অক্টোবর ১৮৭৯ সনে রেভিনিউ বোর্ডের কাছে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন ঃ "চাকমাগণ অর্ধ বাংগালী। বস্তুত ইহাদের পোশাক - পরিচ্ছদ এবং ইহাদের ভাষাও বাংলা ভাষার বিকৃত অবস্থা মাত্র। এতদভিন্ন চাকমাদের উপাধি ব্যতীত নামগুলিও এমন বাংগালী ভাবাপন্ন যে তাহাদিগকে বাংগালী হইতে পৃথক করা একরূপ অসম্ভব"। এতে প্রমাণিত হয় যে, চাকমারা বাংলার যে অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছে, তা ছিল বাংগালী অধ্যুষিত। অর্থাৎ চাকমারা নয়, বাংগালীরাই হলো ঐ অঞ্চলের আদি অধিবাসী।

---

[১১] বিরাজ মোহন দেওয়ান ঃ পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ১১।
[১২] বিরাজ মোহন দেওয়ান ঃ পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ৬।

চাকমা ভাষার বর্ণমালার সাথে বর্মী বর্ণমালার মিল রয়েছে। বাংলাভাষা বিশেষতঃ চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলায় কথা বললেও চাকমাদের বর্মী আদলে বর্ণমালা গ্রহণের পেছনে দুটো কারণ সক্রিয় ছিল বলে মনে হয় ঃ (১) একসময় চাকমারা বর্মী ভূ-খন্ডের বাসিন্দা ছিল, (২) চাকমা ও বর্মীরা ধর্মীয়ভাবে গৌতম বুদ্ধের অনুসারী হওয়ায় বর্ণমালার মধ্যে বর্মী বর্ণমালার সামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

তবে চাকমাদের লেখ্য বর্ণমালা ও ভাষা তেমন ব্যবহৃত হচ্ছে না। বিরাজ মোহন দেওয়ানের ভাষায় - "কালের স্রোতে চাকমা ভাষা আজ বিলুপ্তির পথে।" মূলত একটি স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা না হলে তার অপমৃত্যু অবিসম্ভাবী।

অতি সাম্প্রতিককালের চাকমা বুদ্ধিজীবীরা চাকমা ভাষার "অন্তত দুইশত বৎসরের লিখিত রূপ আছে" বলে দাবী করেছেন। সুগত চাকমা তার গ্রন্থে গোজেন লামা, চাকমা ছড়া, প্রবাদ, ধাঁ ধাঁ প্রভৃতির যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় আমার মতো অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও অনেকখানি বুঝতে পারবেন। আসলে বাংলা ভাষার বিকৃত উচ্চারণই হলো চাকমা ভাষা। তদুপরি, বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার লোকই তাদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। পার্বত্য চট্টগ্রামেও তেমনি আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে। কিন্তু চাকমারা একে পৃথক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ইদানিং একেবারে উঠে পড়ে লেগেছেন। অথচ তাদের প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে না। বাংলা মিশ্রিত বা বাংলা প্রভাবিত চাকমা ভাষাই প্রমাণ করে চাকমারা কখনোই পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকারী ছিল না, কিংবা তারা এ অঞ্চলের আদিবাসী নয়।

চাকমা নামের উৎপত্তি নিয়ে বিভ্রান্তির কুয়াশা

একটি জাতির সঠিক পরিচিতি তথা স্বক্রীয় সত্ত্বা ও অস্তিত্বের জন্য তাদের আদি নিবাসের সঠিক ধারণা থাকা চাই। চাকমাদের তথাকথিত আদিবাস "চম্পক" বা "চম্পা" নগরের নামানুসারে "চাকমা" নামক উপজাতি বা জাতির উৎপত্তি হয়েছে বলে দাবী করা হয়। "চাকমাদের বিশ্বাস সুদূর অতীতে তারা চম্পকনগর নামক একটি রাজ্যে বাস করত।"

এ ধরণের দাবী কিংবদন্তী-নির্ভর। এর পেছনে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। স্বর্গীয় প্রাণহরি তালুকদার তার পিতামহ প্রদত্ত পুঁথির উপর ভিত্তি করে

সুগত চাকমা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি ঃ রাঙামাটি ঃ ১৯৮৩ ঃ পৃঃ ৯০।
সুগত চাকমা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি ঃ রাঙামাটি ঃ ১৯৮৩ ঃ পৃঃ ১৭।

বলেন শ্যামা বা সামা হতে ছামাং, চ্যাং, শ্যাং, পরে চাকমা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

আবার চাকমা বুদ্ধিজীবীরাই চাকমা শব্দের উৎপত্তি অনুসন্ধান করতে গিয়ে 'চাক' উপজাতির সাথে নিজেদেরকে অযৌক্তিকভাবে জড়াচ্ছেন। তারা মনে করেন চাক, ছাক, সাক, (বা ইংরেজীতে JHAK. THAK. THEK), প্রভৃতি শব্দ পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান 'চাকমা' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরণের ধারণার পেছনেও ইতিহাসসম্মত কোন তথ্য প্রমাণ নেই, সবই অনুমান ভিত্তিক - তথা ভ্রমাত্মক। যুগের বিবর্তনে অবশ্যই শব্দের পরিবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু তার জন্য চাই যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণ, পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা, পরিবর্তনের কারণ প্রভৃতি। বিশেষত একটি জাতির নামের পরিবর্তন বা বির্বতনের তো একটি ধারাবাহিক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকা অপরিহার্য।

চাকমা বুদ্ধিজীবীরা চাক, ছাক বা সাক জাতি বা শব্দ থেকে চাকমা জাতি বা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে যে দাবী করেন, তা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বর্তমানে বান্দরবান পার্বত্য জেলার দক্ষিণাংশে এবং বার্মার আরাকান অঞ্চলে বসবাসরত চাক উপজাতির প্রতি ইংগিত করতে চান। সতীশ চন্দ্র ঘোষ চাক ও চাকমাদের এক ও অভিন্ন জাতি বলে মনে করেন। কিন্তু চাকদের দৈহিক গঠন, ভাষা, ইতিহাস, আদিবাস জীবনাচরণ, বিয়ে, জন্ম-মৃত্যুকালীন অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ চাকমাদের হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। চাকদের এই পৃথক অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, চাক এবং চাকমারা কখনোই একই গোত্র বা জাতিভূক্ত ছিল না, কিংবা একই অঞ্চলে আদিকালেও বাস করেনি।

চাক ও চাকমারা যদি একই জাতি বা উপজাতি হওয়া সত্ত্বেও কালক্রমে ভিন্ন হয়ে দুটো ধারার সৃষ্টি করে থাকে, তারও প্রমাণাদি থাকতে হবে। তেমন তথ্য-প্রমাণ হাজির না করেই সতীশ চন্দ্র ঘোষের মতো কল্পনাশ্রয়ী ও অনুমানপ্রিয় ব্যক্তিরা চাক ও চাকমাদের এক ও অভিন্ন বলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। আসলে চাকমা শব্দ বা জাতির উৎপত্তি সংক্রান্ত কোন ইতিহাস বা দলিল না থাকাতে এমন বিভ্রান্তির ধুম্রজাল সৃষ্টি করে যেকোন পন্থায় চাকমাদেরকে একটি পরিচিতির উত্তরাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। চাক শব্দের সাথে চাকমা শব্দের অক্ষরগত নৈকট্য থাকার সুবাধে সতীশচন্দ্র ঘোষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে চাক জাতির সাথে চাকমাদের অভিন্নতা প্রতিষ্ঠাকে সহজতর মনে করেছেন। চাক থেকে চাকমা শব্দ এসেছে - এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা গেলেই সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, চাক বা চাকমারা প্রাচীন জাতি, তাদের রাজ্য ছিল, রাজত্ব ছিল, চাক (তাদের ভাষায় চাকমারা) একদা আরাকানে বিশাল রাজ্য গড়েছিল এবং এক সময়ে আরাকান হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল। সর্বোপরি, বিভিন্ন বিদেশী

ঐতিহাসিক চাক জাতির যে গৌরবময় ইতিহাস রচনা করেছেন তাকে চাকমাদের ইতিহাস বলে দাবী করার এবং গর্ব করার একটি যথোপযুক্ত ভিত্তিও তৈরী হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, তারাই বলে তাদের তথাকথিত আদিবাস 'চম্পক' বা 'চম্পা' রাজ্যের নামানুসারে তাদের নাম চাকমা। আবার এরাই দাবী করে এদের নাম এক সময় ছিল 'চাক'। পুনরায় তারাই বলে 'চাকোমাস' থেকে চাকমা শব্দটি এসেছে। পরস্পর বিরোধিতা কাকে বলে?

চাকমা উপজাতিরা অসংখ্য উপদলে বিভক্ত। এই উপদলগুলোকে চাকমারা 'গজা' বলে। চাকমাদের মধ্যে ৩২টি[১১] গজার সন্ধান পাওয়া গেছে। ঐ ৩২টি গজা বা উপদলের ভিতর সতীশ চন্দ্র ঘোষ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী ১২৪টি গোষ্ঠী রয়েছে। অথচ ৩২টি গজা কিংবা ১২৪টি গুথি বা গোষ্ঠীর মধ্যে 'চাক'দের কোন উল্লেখ নেই। চাক ও চাকমারা যদি অভিন্ন জাতি হতো তবে গুথি কিংবা গজার তালিকায় চাকদের নামও থাকত। চাকমাদের গজা কিংবা গুথির মধ্যে চাকদের অনুপস্থিতিই প্রমাণ করে যে চাক ও চাকমারা কোন কালেই এক ও অভিন্ন জাতিভুক্ত ছিল না।

একই শব্দ দ্বারা দু'টো জাতি (চাক ও চাকমা) কে নির্দেশ করায় এ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। চাকমা বুদ্ধিজীবীরাই এ বিভ্রান্ত সৃষ্টি করেছেন এবং চাকমা বুদ্ধিজীবীরা বিভ্রান্তির এই সুযোগ ব্যবহার করেছেন। অথচ একই শব্দ দ্বারা দু'টো জাতিকে নির্দেশ করার নজির পার্বত্য অঞ্চলে আরো রয়েছে। অধিকাংশের কাছে পার্বত্য অঞ্চলের ম্রো এবং মুরংদের পরিচয় পরিষ্কার নয়, যদিও তারা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি। তবুও অন্যরা উভয়কে মুরং নামেই চেনে। পার্বত্য অঞ্চলে কুকি নামে কোন জাতি নেই। অথচ বিভিন্ন পৃথক জাতিকে কুকি বলে অভিহিত করা হয়। মগদের নিয়েও একই ধরণের সমস্যা। বর্তমানে মার্মা পরিচয় দানকারীদের, চট্টগ্রামের বড়ুয়াদের এবং এক সময়ে (ব্রিটিশদের কাগজ পত্র অনুযায়ী) চাকমাদেরও মঘ বলে অভিহিত করা হতো। সুতরাং কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ একই উপজাতি বললেও বাস্তবে চাক ও চাকমারা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায়।

চাক ও চাকমারা যদি কোনকালে একই গোষ্ঠী বা জাতিভুক্ত থাকত, তবে উভয়ের নামের অক্ষরগত সামান্য দূরত্ব বা ভিন্নতা সৃষ্টি হলেও "তাদের দৈহিক গঠন, ভাষা-সংস্কৃতি পোশাক-পরিচ্ছদ, ইতিহাস-ঐতিহ্যের অভিন্নতা বজায় থাকতো। কিন্তু তা মোটেও নেই। তাদের (চাকদের) মেয়েরা কানে দুই

---

[১১] বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান ঃ চাকমাজাতির ইতকথা ঃ (অধুনালুপ্ত) ঝরণা ঃ ৩য় সংখ্যা ঃ বান্দরবান ঃ ১৯৬৯।

ইঞ্চি ব্যাসের রৌপ্য কর্ণ দুল 'নাতং' পরে থাকে। এটি তাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য, যা দেখে সহজেই একজন চাক রমণীকে অন্যান্য উপজাতি রমণীদের থেকে আলাদা করা যায়'।[৫৮] "মৃতদের সৎকার করার বেলায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য উপজাতির" চেয়ে "চাকদের রীতিকে ব্যতিক্রমধর্মী বলতে হবে"।[৫৯]

চাক ও চাকমাদের বিয়ের রীতি, মৃতের সৎকার এবং পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে এতো অমিল রয়েছে যে, ভুলক্রমেও বিশ্বাস করা যায় না যে. ইতিহাসের কোন পর্যায়ে উভয়ে এক ও অভিন্ন ছিল। চাক বা সাক ভাষার সাথে উত্তর বার্মার মাইতাখিনা (Myithayina) জেলার কাদু (Kadu) এবং পূর্ব-ভারতের মনিপুর রাজ্যের আন্দ্রো (Andro), সাংপাই (Shangpai) ভাষাগুলোর মিল ও ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে।[৬০] অন্যদিকে ইতোপূর্বে আমি দেখিয়েছি যে, চাকমাদের ভাষা সম্পূর্ণরূপে বাংলা ভাষার বিকৃতরূপ বিধায় বিভিন্ন আদমশুমারীতে চাকমাদের ভাষাকে "চাকমা-বাংলা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই ভাষায় অহমিয়া এবং ত্রিপুরা ভাষার কিছু শব্দের অস্তিত্ব রয়েছে। চাক ভাষায় মোটেই তেমনটি নেই। সর্বোপরি, চাকদের প্রায় দুই হাজার বছরের জ্ঞাত ইতিহাস রয়েছে, যা চাকমাদের নেই। চাকমাদের সত্যিকার পরিচয়ের বয়স বড়জোর চারশত বছরের। কানছিদ্র করার ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্য দেখে সুগত চাকমা চাকদেরকে চীনের য়ুনান প্রদেশে দু'হাজার বছর যাবত বসবাসকারী (যাদের উত্তর পুরুষরা এখনো সেখানে এবং উত্তর বার্মায় বসবাস করছে) জনগোষ্ঠীর বংশধর বলে স্বীকার করেছেন। চাকমাদেরকে অন্যদিকে এক কল্পিত চম্পক রাজ্যের আদিবাসী বলে দাবী করা হয়, যার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। কোন দেশের কোন চম্পক নগর হতে চাকমারা বাংলাদেশে বা বার্মায় এসেছে তাও তারা বলতে পারছেন না। চাক কিংবা চাকমা বুদ্ধিজীবী, অথবা বিদেশী কোন তৃতীয় ঐতিহাসিক চাক ও চাকমাদের আদিবাসভূমি একই স্থানে ছিল বলে দাবী করছে না। এমনকি চাকরাও দাবী করছেন না যে তারা ও চাকমারা একই জাতিভূক্ত। আত্মপরিচয়ের অভাবে চাকমারাই চাকদেরকে নিজেদের সাথে জড়িয়ে অভিন্ন জাতি বলে দাবী করছে। তারা প্রমাণ করতে চাইছে যে, বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ চাকদের যে ইতিহাস লিখেছেন তা চাকমাদেরই ইতিহাস। এ ধরণের দাবীর পেছনেও কোন যুক্তি বা প্রমাণ নেই। চাকদের মতো চাকমাদের নিজস্ব গৌরবময় ইতিহাস নেই বলে তারা চাকদের ইতিহাসকে

---

[৫৮] সুগম চাকমা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি ঃ পৃঃ ৬৮।
[৫৯] সুগত চাকমা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি ঃ পৃঃ ৭১-৭২।
[৬০] সুগত চাকমা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি ঃ পৃঃ ৬৮।

চাকমাদের ইতিহাস বলে দাবী করছে। বর্মী - আরাকানীরা চাকমাদেরকে চাকমা না বলে সাক বলে। সম্ভবতঃ এই সুযোগটাকেও চাকমারা ব্যবহার করছে চাকদের সমুদয় ইতিহাসকে নিজেদের ইতিহাস বলে দাবী করার জন্য

চাকমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রাচীনত্ব অনুসন্ধান ও প্রমাণ করতে গিয়ে সতীশ চন্দ্র ঘোষসহ চাকমা বুদ্ধিজীবীরা যে উৎসের সাহায্য নিয়েছেন তা হলো আরাকানী ভাষায় লেখা একটি স্বল্প-পরিচিত পুঁথি "দেংগাওয়াদী আরেদ ফুং।" প্রথম কথা হল দেংগাওয়াদী যদি চাক জাতির ইতিহাস বা পুঁথি না হয়ে চাকমাদের পুঁথি-ইতিহাসই হবে, তবে তা চাকমা ভাষায় কেন লেখা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুঁথি হতে পারে, কিন্তু পুঁথির কাহিনী কখনোই ইতিহাসের উৎস হতে পারে না। এমনকি, রামায়নে বর্ণিত রামচন্দ্র পর্যন্ত একটি কল্পিত চরিত্র। বাস্তবে যে কোন রামচন্দ্র ছিল ইতিহাস তা স্বীকার করে না। সুতরাং লোককাহিনী, পালা-পুঁথি, প্রভৃতি প্রকৃত ইতিহাসের উৎস হতে পারে না। দেংগাওয়াদী সম্পর্কে অশোক কুমার দেওয়ানের সাক্ষ্য ঃ "ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে দেংগ্যাওয়াদির মূল্য সংশয়জনক। --- আমার মনে হয় আমাদের দেশের গ্রাম্য কবিগণের রচিত কল্প সমৃদ্ধ পুঁথির ন্যায় এটিও একটি নিম্নমানের পুঁথি বিশেষ। - - - মনে রাখতে হবে যে দেংগ্যাওয়াদির রচয়িতা 'ছাক' জাতির কাহিনীই লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি কোথাও বলেননি যে ছাক ও চাকমা জাতি এক এবং অভিন্ন। সতীশ চন্দ্র ঘোষই তার "চাকমা জাতি" পুস্তকে এই ধারণা প্রকাশ করেন যে "ছাক ও চাকমারা এক ও অভিন্ন জাতি।"[১] এ দাবী খন্ডন করে অশোক কুমার দেওয়ান লিখছেন ঃ "চাকমা ও চাক জাতি এক নয়। ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বিচারে তারা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি।" অথচ সতীশের মিথ্যা ও ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাসী হয়েই চাকমা বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের প্রাচীন জাতি বলে প্রচার করছেন।

অশোক কুমার দেওয়ান মনে করেন চাক বা SAK নাম দিয়ে দেংগ্যাওয়াদী বা অন্যান্য কাহিনীতে বারবার যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা আসলে উচ্চ ব্রহ্মের কাদু গোত্রের লোক, যাদের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে 'চাক' উপজাতি নামে পরিচিত। অথচ সতীশ ঘোষরা দেংগাওয়াদীসহ অন্যান্য কাহিনীতে বর্ণিত উচ্চ ব্রহ্মের 'চাক' বা 'সাক'দের পরিবর্তিত নাম চাকমা বলে দাবী করছেন। প্রকৃত ইতিহাস না থাকাতেই তিনি 'চাক'দেরকে 'চাকমা' এবং 'চাক'দের ইতিহাসকে 'চাকমা'দের ইতিহাস বলে চালিয়ে দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। অন্য জাতির পরিচয় ও ইতিহাসকে চাকমাদের

---

[১] অশোক কুমার দেওয়ান ঃ চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার ঃ খাগড়াছড়ি ঃ ১৯৯১ ঃ পৃঃ ৫০-৫১।

পরিচিতি বা ইতিহাস বলে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা কেবল তথ্য-বিকৃতিই নয়, চৌর্যবৃত্তির চেয়েও অপরাধজনক। অশোক কুমার দেওয়ানের অভিযোগ "সতীশ চন্দ্র ঘোষ আরাকান ব্রহ্মের খিঁচুড়ি পাকানো একটি অভিনব চাকমা ইতিহাস তৈরী করেছেন।" "অপর একজাতির ইতিহাসকে সম্পূর্ণ নিজের ইতিহাস বলে আত্মস্থ করে চাকমা জাতির ইতিহাস রচনার দায়িত্ব শেষ করেছেন।"[৫৯] অশোক কুমার দেওয়ানের দুঃখ ঃ "ইতিহাসের এই বিরাট অসংগতির দিকে এতোদিন নজর দেয়া হয়নি এবং সতীশ ঘোষের চাকমা জাতির ইতিহাস রচনার পর প্রায় এক শতাব্দীর কাছাকাছি কাল পর্যন্ত একটি মিথ্যে ধারণাকে লালন করা হয়েছে।"[৬০] এই মিথ্যে ধারণা হলো চাক ও চাকমাদের এক ও অভিন্ন জাতি হিসেবে বিবেচনা করা এবং চাক, ছাক বা সাক শব্দের পরিবর্তিত নাম 'চাকমা' বলে দাবী করা।

এখানে আরো বলা যায় যে, যদি 'চাক' বা 'সাক' থেকে চাকমা জাতি বা শব্দটি এসে থাকে, তবে চাকমা বুদ্ধিজীবীরা তথাকথিত চম্পক বা চম্পা রাজ্যকে তাদের আদি বাসস্থান বলে দাবী করে কেন ? চাকদের তো আদিবাসভূমি চীনে, চম্পক নগরে নয়। সতীশচন্দ্র ঘোষ এবং তার অনুসারীদের লেখা চাকমা জাতির সমুদয় ইতিহাস পর্যালোচনা তথা গবেষণা করে অশোক কুমার দেওয়ান প্রমাণ করেছেন যে, "সতীশ ঘোষদের রচিত চাকমা জাতির ইতিহাসের প্রায় সবটাই ফাঁকা, শতকরা প্রায় একশ' ভাগই ফাঁকা"। সতীশ ঘোষরা চাকমাদের দেড় হাজার বছরের যে কল্পিত ইতিহাস তুলে ধরেছেন তা প্রত্যাখ্যান করে অশোক কুমার দেওয়ান "এতদিনের প্রকান্ড মিথ্যা, এতবড় প্রচঞ্চনা, এতদিনের বিভ্রম" হতে মুক্ত হয়ে "দিগভ্রষ্ট পূর্বপুরুষগণ যে পথ দিয়ে এগিয়েছেন সে পথ পরিত্যাগ করে নতুনভাবে আবার ইতিহাসের রেখা খুঁজে"[৬১] নেবার আহ্বান জানিয়েছেন।

দেঙ্গ্যাওয়ার্দীর সূত্রে সতীশ চন্দ্র ঘোষের চাকমা জাতির ইতিহাস প্রসঙ্গে অশোক দেওয়ানের মন্তব্য ঃ "অবিশ্বাস্য আজগুবি কাহিনীতে ভরা, ব্রহ্ম আরাকান ইতিহাসে খিঁচুড়ি পাকানো চাকমা জাতির ইতিহাস অংশটি একটি প্রকান্ড মিথ্যা বই আর কিছু নয়।"[৬২]

উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রিত এমন একটি বহিরাগত সম্প্রদায়, যাদের ইতিহাস, ভাষা, এমনকি পরিচিতি বিতর্কিত তথা অজ্ঞাত। এমন একটি বহিরাগত গোষ্ঠী বাংলাদেশে আশ্রয় পেয়ে আজ সে দেশের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলছে। ■

---

[৫৯] অশোক কুমার দেওয়ান ঃ পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ৬২-৬৩।

[৬০] অশোক কুমার দেওয়ান ঃ পূর্বোক্ত ঃ ৬৩।

[৬১] অশোক কুমার দেওয়ান ঃ পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ৮০।

[৬২] অশোক কুমার দেওয়ান ঃ পূর্বোক্ত ঃ ৭৬।

সন্ত্রাসী সংগঠন

- জনসংহতি সমিতির উত্থান
- শান্তিবাহিনী
- পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ
- গণলাইন
- গ্রাম পঞ্চায়েত
- চাকমা-সৃষ্ট সমস্যা

জনসংহতি সমিতির উত্থান

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন যে সম্পূর্ণরূপে বিদেশীদের চাপিয়ে দেয়া চক্রান্ত ইতোমধ্যেই বিভিন্নভাবে তা প্রমাণিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতীয়রা আমাদের জানা ইতিহাসে কখনো বিদেশী শাসন কিংবা সাম্প্রতিক কালের ব্রিটিশ কিংবা পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে সামান্যতম ভূমিকাও রাখেনি। এর মূল ও মনস্তাত্তিক কারণ হলো আশ্রিত - বহিরাগত এবং প্রান্তীয় সংখ্যালঘু হবার প্রেক্ষিতে তারা কখনোই কোন আন্দোলনে কোন ভূমিকা রাখার আত্মিক অনুপ্রেরণা ও তাড়না অনুভব করেনি। দেশের জন্য জীবন দিয়েছে, এমনকি জেল-জুলুমের নির্যাতন সহ্য করেছে এমন একজন উপজাতীয় ব্যক্তির নাম পাওয়া ভার। অথচ বহিরাগত চাকমা উপজাতিভুক্ত কিছু সন্ত্রাসী আজ বাংলাদেশ ভূখন্ডের প্রকৃত মালিক বাঙ্গালীদেরকে পার্বত্য অঞ্চলে বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরকে উচ্ছেদের মাধ্যমে সেখানে পৃথক রাষ্ট্র 'জুম্মল্যান্ড' প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১৯৭২ সনে। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবার মাত্র ৩৪ দিনের মাথায় ২৯ জানুয়ারী চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে সাত-সদস্য বিশিষ্ট একটি উপজাতীয় প্রতিনিধিদল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা তাকে অবহিত করেন। শেখ মুজিব আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, উপজাতীয়দের স্বার্থ, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা হবে। উপজাতীয়রা তাদের ভূমির অধিকার পূর্বের মতোই ভোগ করতে থাকবেন।[৬৬]

এ আশ্বাসের পরেও উপজাতীয়রা, বিশেষতঃ চাকমারা, সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কেননা তারা বাংলাদেশকে নিয়ে চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়েছিল। উল্লেখিত সাক্ষাতকারের ১৭ দিন পরে ১৫ ফেব্রুয়ারী মংরাজা মংপ্রু সাইনের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের অন্য একটি উপজাতীয় প্রতিনিধিদল শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাত করতে তৎকালীন গণভবনে যান। এ দলে অন্য ছয় সদস্যের নাম হলো মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মা, কে কে রায়, মিসেস বিনীতা রায়, সুবিমল দেওয়ান, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা এবং তৎকালীন বোমাং রাজা অংশুফ্র চৌধুরী।[৬৭] তারা চার

---

[৬৬] চিন্ময় মুৎসুদ্দী ঃ অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ আগামী প্রকাশনী ঃ ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা ঃ ১৯৯২ঃ পৃঃ ৪।

[৬৭] চিন্ময় মুৎসুদ্দী ঃ পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ৩। (ইদানীং অতি উৎসাহী কোন কোন চাকমা সন্ত্রাসী কিংবা তাদের শুভানুধ্যায়ীরা প্রচার করে বেড়ায় যে, মানবেন্দ্র লারমা এ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন-- লেখক।)

দফা-সম্বলিত একটি স্মারকলিপি শেখ মুজিবের কাছে অর্পণ করেন, যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বতন্ত্র এলাকা ঘোষণা করে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবী করা হয়।

এ স্মারকলিপির মূল বক্তব্য এবং ঐ বক্তব্য দেখে শেখ মুজিবেরর প্রতিক্রিয়া প্রসংগে Chittagong Hill Tracts Commission তাদের রিপোর্টে নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়েছেন ঃ

"The Memorandum sought autonomy for CHT with its own legislature, retention of the 1900 regulations. continution of the three chiefs' offices. constitutional provisions against amendment of the regulations. and a ban on the influx of non-hill peoples. Mujib rejected the demands out of hand. Upendralal Chkma recalled Sheikh Mujib saying "no, we are all Bengalis, we cannot have two systems of government. Forget your ethnic identity, be Bengalis". He is said to have threatened that the Bengali Muslims would flood into the CHT. The meeting in Sheikh Mujib's office only lasted 3 or 4 minutes. The delegation was not invited to be seated. Sheikh Mujib did not accept the memorandum. According to Upendra Lal Chakma he threw it back at Manobendra Larma".[৬৮]

(ভাবানুবাদ ঃ স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন পরিষদ-সম্বলিত স্বায়ত্বশাসন, ১৯০০ সনের বিধি পুনর্বহাল, তিনজন (উপজাতীয়) প্রধানের পদ অব্যাহত রাখার, (১৯০০ সালের) বিধি সংশোধন রহিতকরণ-সম্বলিত শাসনতান্ত্রিক বিধান, এবং ব্যাপক হারে অপাহাড়ীদের আগমনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারীকরণের দাবী জানানো হয়। শেখ মুজিব মুখের ওপর দাবীগুলো প্রত্যাখ্যান করলেন। উপেন্দ্র লাল চাকমা শেখ মুজিবের বক্তব্য স্মরণ করে বললেন, "না আমরা সবাই বাঙ্গালী। আমাদের দু'পদ্ধতির সরকার থাকতে পারে না। আপনারা আপনাদের জাতিগত পরিচয় ভুলে যান। বাঙ্গালী হউন।" শেখ মুজিব বাঙ্গালী মুসলমানদের বন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভাসিয়ে দেবার ভয় দেখিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। শেখ মুজিবের অফিসে এ সাক্ষাতকার ৩/৪ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। এমনকি, প্রতিনিধিদলকে বসতেও বলা হয়নি। শেখ মুজিব স্মারকলিপি গ্রহনও করেননি। উপেন্দ্রলাল চাকমার মতে তিনি (শেখ মুজিব) ইহা মানবেন্দ্র লারমার দিকে ছুঁড়ে মেরে ফেরত দেন।)

---

[৬৮] Life Is Not Ours. P.14.

অনেক বিশ্লেষক শেখ মুজিবের এই আচরণ, বিশেষত উপজাতীয়দের 'বাঙালী' হবার উপদেশকে আবেগাপ্লুত ভ্রান্তি বলে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। আমি এ ব্যাখ্যার সাথে দ্বিমত পোষণ করছি। শেখ মুজিব নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, এ ধরণের অযৌক্তিক দাবী উত্থাপন ছিল চক্রান্ত-প্রসূত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বিষয়টি যে তার নতুন সরকারের ওপর জঘন্য চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার শেখ মুজিবের এ ধারণা তো এখন সত্য হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এ ধরণের আচরণ অন্তত শেখ মুজিবের জন্য যথার্থই ছিল। দ্বিতীয়তঃ পরবর্তীতে বাঙ্গালী পরিচয় পরিহার করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ শাসনতান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করে উপজাতীয়দের জাতিগত পরিচয় মুছে ফেলার তথাকথিত চক্রান্তের অবসান এবং ২২টি বিষয়সহ তিনটি পার্বত্য জেলায় তিনটি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের পরেও সশস্ত্র সন্ত্রাস অব্যাহত রেখে মানবেন্দ্র লারমার সতীর্থরা শেখ মুজিবের ধারণাকেই যথার্থ বলে প্রমাণ করেছে।

আসলে শেখ মুজিবের বক্তব্যকে তারা নিছক অজুহাত হিসেবেই ব্যবহার করেছে। শেখ মুজিব তাদের সাথে আরো নমনীয় আচরণ করলেও তারা বিচ্ছিন্নতার পথেই যেত। গত ২৪ বছরে অনেক নমনীয় পদক্ষেপ নিয়েও সন্ত্রাসীদের মন জয় করা যায়নি। সুতরাং শেখ মুজিবের সঠিক অবস্থানকে তারা একটি ছুতা হিসেবে ব্যবহার করেছে।

পরবর্তীতে শেখ মুজিবের সাথে মানবেন্দ্র লারমার সুসম্পর্ক হয় এবং সে তার অনুসারীসহ বাকশালে যোগদান করলেও চক্রান্তের পথ থেকে তারা সরে আসেনি।

১৯৭২ সনের দিকে বাংলাদেশে অন্তত বামপন্থীদের জন্য গণতন্ত্র যথার্থভাবেই কার্যকর ছিল। তা সত্বেও মানবেন্দ্র লারমারা অত্যন্ত গোপনে ১৯৭২ সালের ১৬ মে রাঙামাটি কম্যুনিষ্ট পার্টি নামে একটি গোপন গ্রুপ গঠন করে। প্রথম এডহক কমিটিতে অন্যান্যের মধ্যে মানবেন্দ্র লারমা, জ্যোতিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, ভবতোষ দেওয়ান, অমিয় সেন চাকমা, কালি মাধব চাকমা, প্রমুখের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। তথাকথিত কম্যুনিষ্ট পার্টির এসব নেতাসহ অন্যান্য ক'জনের জন্য আধা-প্রকাশ্য দল জনসংহতি সমিতি গঠন করা হয়।[৬৯]

কম্যুনিষ্ট পার্টি তথা জনসংহতি সমিতি গঠিত হবার ৮ মাসের মধ্যে (১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারী) জনসংহতি সমিতি সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী গঠন

[৬৯] চিন্ময় মুৎসুদ্দি ঃ পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ৩। (আসলে এ কাগুজে কম্যুনিষ্ট পার্টি ১৯৭০ সনে গঠিত হয়। - লেখক)

করা হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাদের কার্যক্রমকে আদর্শের লড়াই হিসেবে দেখানোর উদ্দেশ্যেই তাদের সংগঠনকে সমাজতন্ত্রের অনুসারী হিসেবে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, এমনকি চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিসমূহ কখনোই লারমাদের রাঙামাটি কম্যুনিষ্ট পার্টিকে কম্যুনিষ্ট পার্টি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। কারণ কারোরই বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, কম্যুনিজমের ধ্বজাধারী এসব ব্যক্তিবর্গ কোন বিশেষ মহলের প্ররোচণায় মাঠে নেমেছে। যদিও জনসংহতি সমিতি বাহ্যত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ধারক হিসেবে প্রথম দিকে তার কর্মীদের মার্কস-লেনিন-মাও'এর রচনাবলী অধ্যয়ন করতে উৎসাহিত করত, কিন্তু পরবর্তীতে, স্বয়ং মানবেন্দ্র লারমা'র জীবদ্দশাতেই, জনসংহতি সমিতি যেন অজান্তেই লোক-দেখানো কম্যুনিষ্ট পরিচিতি বিস্মৃত হয়ে যায়। সর্বোপরি, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের চরম বিপর্যয়ের পর সমাজতন্ত্রের অসারতা ও অগ্রহণযোগ্যতা, বিশেষতঃ নির্মমতা জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ায় জনসংহতি সমিতি[১০] তার মার্কসিষ্ট পরিচিতি ভুলেও মুখে আনেনি।

বিশেষজ্ঞদের মতে সত্তর দশকে বিশ্বের অধিকাংশ বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসী আন্দোলন তাদেরকে তথাকথিত প্রগতিবাদী কম্যুনিষ্ট হিসেবে পরিচিত করত। কারণ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এ ধরণের সংগঠনের মূল পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করত বিধায় মানবেন্দ্র লারমারা ভারতের মাধ্যমে সে আশীর্বাদ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় কম্যুনিষ্ট সেজেছিল। এছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতের তৎকালীন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনগুলো চীনের আশীর্বাদপুষ্ট ছিল। জনসংহতি সমিতিকেও চীনের ক্রীড়নক হিসেবে বাহ্যতঃ চিহ্নিত করে আসলে ভারত ফায়দা লুটতে চেয়েছিল। যদিও চিন্ময় মুৎসুদ্দির মতো ভারত-ঘেষা বুদ্ধিজীবীরা বলে থাকেন যে, জনসংহতি সমিতি তাদের কম্যুনিষ্ট পরিচিতি ভারতের কাছে গোপন রেখেছিল। অথচ চিন্ময় মুৎসদ্দিই বলছেন ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের পট পরিবর্তনের পর "ভারতীয় কর্তৃপক্ষ উৎসাহী হয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সাথে

---

[১০] বর্তমানে জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ ঃ
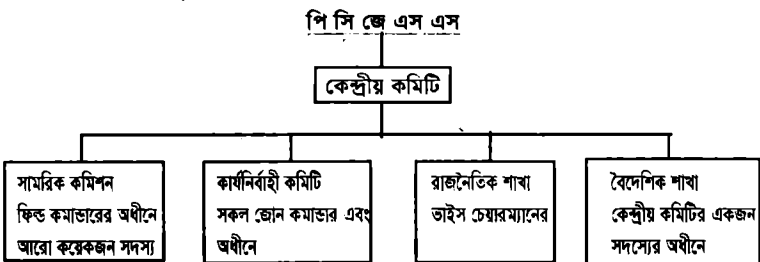
যোগাযোগ করল। --- লারমা কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতায় এসে আত্ম গোপন করলেন।"[১]

Chittagong Hill Tracts Commission উপরোক্ত মন্তব্যের সাথে একাত্মা ঘোষণা করে সরাসরি বলেছে ঃ

"It is widely known that the Indian government of Indira Gandhi gave active support to Shanti Bahini insurgents, allowing them to operate from bases in India".[১২] (ভাবানুবাদ ঃ ইহা সকলের জানা আছে যে, ভারতের ইন্দিরা গান্ধী সরকার ভারতের (অভ্যন্তরস্থ) ঘাঁটি হতে অভিযান চালাতে শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীদের সক্রিয় সমর্থন দিয়েছিলেন।)

এভাবে জনসংহতি সমিতি ভারতের ক্রীড়নক হিসেবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে এর সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, রাঙামাটি কম্যুনিষ্ট পার্টি ইত্যাদি কিছুই এখন আর নেই। জনসংহতি সমিতি এখন সুবিধাবাদী, স্বার্থন্বেষী বিদেশী চরের আখড়া। শান্তিবাহিনী নামক খুনীদল সৃষ্টি করে জনসংহতি সমিতি সম্পূর্ণরূপে আদর্শবিবর্জিত, অস্ত্র ও চাঁদা-নির্ভর একটি সন্ত্রাসী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাসের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ এবং শরণার্থীদের জন্য খয়রাতি সাহায্য হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে জনসংহতি সমিতি ও তার সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীবৃন্দ পাহাড়ী জনগণকে জিম্মী রেখে যে বিলাসী জীবন যাপন করছে, তা দেখে কেউই তাদেরকে আদর্শবাদী, জনদরদী দেশপ্রেমিক বলে চিহ্নিত করেনা। ফলে সংগঠনটি উপজাতীয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ■

চিন্ময় মুৎসুদ্দি ঃ পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ১৪

Life is Not Ours : P.16.

শান্তিবাহিনী

জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখার নাম শান্তিবাহিনী। ১৯৭৩ সনের ৭ জানুয়ারী ইহা গঠন করা হয়। মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা একাধারে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান এবং শান্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে আমৃত্যু দু'টো সংগঠনকেই আপন কর্তৃত্বে রাখেন। ১৯৮৩ সনের ১০ নভেম্বর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সশস্ত্র আক্রমণে নিহত হলে তার সহোদর অনুজ জ্যোতিন্দ্র নারায়ন বোধিপ্রিয় লারমা (সাধারণত সান্টু লারমা হিসেবে সমধিক পরিচিত) দু'টো সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মনে হচ্ছে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনিও এ দায়িত্বে বহাল থাকবেন।

জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম সম্পূর্ণরূপে উপজাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে ভারতীয় প্ররোচণায় উপজাতীয় যুবক-যুবতীদের শান্তিবাহিনীতে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করে। প্রথমদিকে অন্যান্য উপজাতিভুক্ত যুবকরা শান্তিবাহিনীতে কিছুটা স্বতঃস্ফুর্তভাবে যোগ দিলেও সময়ের ব্যবধানে ইহা চাকমা যুবকদের সংগঠনে পরিণত হয়। ব্যাপক দলত্যাগের কারণে ইহা কখনোই বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বিভিন্ন সূত্রমতে এই সংস্থা কখনোই নিয়মিত ৫ হাজার সদস্য যোগাড় করতে পারেনি। উপজাতীয়দের সংখ্যাল্পতা, চাকমাদের সাথে অন্যান্য উপজাতীয়দের অসহযোগিতা, সর্বোপরি, জুম্মল্যান্ড আন্দোলনের সফলতা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ব্যাপক সংখ্যক উপজাতীয় যুবকদের শান্তিবাহিনীতে যোগদানে নিরুৎসাহিত করছে।

শান্তিবাহিনী কোন আদর্শের ধারক ও বাহক নয়। কোন যৌক্তিক দাবী আদায়ের জন্যও তারা লড়ছে না। তারা বিদেশী প্রভুর হাতিয়ার। তা' সত্ত্বেও কেন কিছু কিছু উপজাতীয় শান্তিবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে?

শান্তিবাহিনীর সাবেক সদস্যদের মতে প্রধানতঃ তিনটি কারণে চাকমা যুবকদের একটি ক্ষুদ্রতর অংশ শান্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। কারণগুলো হলো ঃ

১. চাকমাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে;
২. অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য পেতে;
৩. শান্তিবাহিনীর চাপে;[২৫] এবং
৪. সরকারী নির্যাতন হতে রক্ষা পেতে।

---

[২৫] বান্দরবান জেলার রামু অঞ্চলের শান্তিবাহিনীর সাবেক সদস্য অজারাম ত্রিপুরা জানিয়েছেন যে, যেসব পরিবারে তিনভাই রয়েছে, তাদের একজনকে বাধ্যতামূলকভাবে অবশ্যই শান্তিবাহিনীতে যেতে হবে। সুতরাং শান্তিবাহিনীতে যোগদান স্বেচ্ছাপ্রনোদিত নয়।

অন্যদিকে তিনটি পার্বত্য জেলার প্রায় সব ক'টি উপজাতিভুক্ত সাধারণ জনগণের সাথে এ প্রসংগে আলাপ করলে তারা নিম্নোক্ত কারণগুলোর কথা জানানঃ

১. ভবিষ্যতে কোন বড় পদ দখল করে স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যাশায়;
২. চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করতে;
৩. শান্তিবাহিনীর চাপে;
৪. একেবারে না বুঝে কিংবা বন্ধু-বান্ধবের প্ররোচণায়;
৫. রক্ত-সম্পর্কীয় কিংবা নিকটতম কোন আত্মীয়-স্বজন শান্তিবাহিনীতে রয়েছে বলে;
৬. কৌতুহলবশতঃ কিংবা দুঃসাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য; এবং
৭. শান্তিবাহিনীর সদস্য হিসেবে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সরকার প্রদত্ত মোটা অংকের অর্থসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শান্তিবাহিনীতে যোগদানের পেছনে কোন আদর্শিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই। আত্মস্বার্থ চরিতার্থ কিংবা সাময়িক আবেগ-উত্তেজনা অথবা কৌতুহল-তাড়িত আদর্শ বিবর্জিত আন্দোলন কখনই স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন পায়না। তাই জনসংহতি সমিতি কিংবা শান্তিবাহিনীর জুম্মল্যান্ড আন্দোলন পার্বত্য জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন কখনই পায়নি।

শান্তিবাহিনী সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে কয়েকটি জোনে ভাগ করে তাদের সন্ত্রাসী অভিযান চালায়। নিচের ছকে শান্তিবাহিনীর অভিযানের সাংগঠনিক কাঠামো দেখানো হলো ঃ
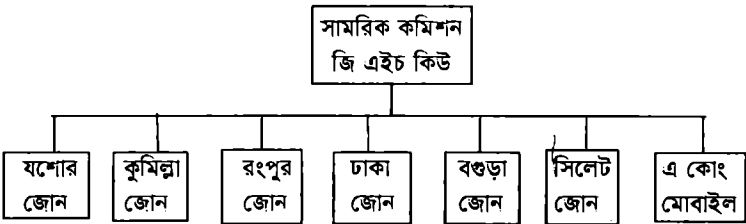
পাহাড়ী ছাত্রপরিষদ

শান্তিবাহিনীর মানবতা বিরোধী সন্ত্রাস সর্বজন বিদিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী সচেতন জনগণ এবং তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে গত ২৪ বছরে শান্তিবাহিনীর হাতে কেবল ২৫ হাজার বাঙ্গালীই নিহত হয়েছে। এসময়ে বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপজাতীয়ও শান্তিবাহিনীর হাতে প্রাণ হারায়। শান্তিবাহিনীর নির্মমতা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা।

শান্তিবাহিনীর মানবাধিকার কত নির্মম ও জঘন্য তা অনুধাবন করার জন্য তারই সহায়ক সংগঠন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের গণ নির্যাতনের সামান্য তথ্য চিত্রই যথেষ্ঠ। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বাংলাদেশের আর দশটি ছাত্র সংগঠনের মতো বৈধ হলেও এর সমুদয় কার্যক্রম দেশদ্রোহীতার শামিল। এই সংগঠনটির নির্মমতা ও মানবাধিকার লঙ্গন ইতোমধ্যেই একে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসী দলে পরিণত করেছে।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের গণ নির্যাতন এত ব্যাপক ও নির্মম যে ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য পাল্টা সংগঠন গড়ে ওঠেছে, যার নাম "পাহাড়ী ছাত্র-গণ পরিষদ ও হিল উইম্যান ফ্রেডারেশনের সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি" - সংক্ষেপে পিপিএসপিসি।

পিপিএসপিসি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) মানবাধিকার লঙ্গনজনিত নির্মমতা, হত্যা, গুম, অপহরণ, চাঁদাবাজি তথা দেশোদ্রোহীতার কিছু সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়-বিদারক ও বাস্তব তথ্য পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছে। ঐ পুস্তিকার অংশ বিশেষ আমি সুহৃদ পাঠকের সামনে উপস্থাপন করছি।

উল্লেখ যে, পিপিএসপিসি'র সদস্যদের অধিকাংশই একদা পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের একনিষ্ঠ ও স্বক্রীয় কর্মী ছিল। সুতরাং তারা পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রকাশ্য ও গোপন কার্যক্রম একেবারে কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিল। তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনন ঃ

"নেতারা (ছাত্র পরিষদের) আদেশ দিতেন কাউকে ধরে নিয়ে এসে মাথা ন্যাড়া করে দিতে। পিসিপি'র আইনের বিরুদ্ধে কেউ 'টু' শব্দ করলে তার উপর নেমে আসত নরকের অভিশাপ। রাতের অন্ধকারে তাকে খুন করা হতো। কারো স্ত্রী পছন্দ হলে কোনক্রমেই রক্ষা ছিলনা পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের হাত থেকে। প্রসীত বিকাশ খীসা ছিল আমাদের রিং লীড়ার। একদিন তারই প্ররোচণায়

বাঙ্গালীদের সাথে মেলামেশা করার অপরাধে সিনেমা হল থেকে ধরে নিয়ে আসা হলো মা কমলা দেবী (৩২) এবং মেয়ে মাধুরী চাকমা (১৪) কে এবং দুড়িয়ার পুলক চাকমা'র বাড়ীতে নিয়ে এক সাথে ধর্ষণ করা হলো তাদেরকে। দো চুয়ানী (পাহাড়ী মদ) দিয়ে ভিজিয়ে দেয়া হতে লাগলো নগ্ন মা ও মেয়েকে। ---- মা ও মেয়েকে একই সাথে বাধ্য করা হলো বিকৃত আরো কিছু কাজ করতে। --- এর কিছুদিন পর প্রিয় বন্ধু সহযোগী কালোমনি চাকমাকে বলা হলো রাতে তার নব বিবাহিতা স্ত্রীকে হোয়াং বোই বা ক্লাবে নিয়ে আসতে। কালোমনিকে দায়িত্ব দেয়া হলো পাহারা দেয়ার। কিন্তু কালোমনি প্রতিবাদ করে উঠল। সেই কালো রাত্রেই তাকে তার প্রিয় নব বিবাহিতা স্ত্রীর সামনে থেকে বের করে নিয়ে খুন করা হলো। প্যারাছড়ার বাত্তিরাম চাকমা'র জমিতে মাটি খুঁড়ে তার লাশ লুকানো হলো। এই হলো পাহাড়ী চাত্র পরিষদ।

এর প্রতিবাদ করার ফলশ্রুতিতে আমাদের ক'জনকে গণ-আদালতের মাধ্যমে চুল কেটে মাথা ন্যাড়া করে যীশুখ্রিষ্টের মতো ঝুলিয়ে রাখলো। শুধু আমরা নই সারা পার্বত্যবাসী এই আক্রমণের শিকার।[১৮]

২৩ জুন ১৯৯৬ সনে পিপিএসপিসি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে যে স্মারকলিপি পেশ করে তাতেও পাহাড়ী ছাত্রপরিষদের দেশদ্রোহীতামূলক কার্যক্রম এবং মানবাধিকার লঙ্গনের উল্লেখ রয়েছে। এতে বলা হয়েছে ঃ

তথাকথিত পাহাড়ী ছাত্র-গণ-পরিষদ উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পার্বত্য এলাকায় ছড়িয়ে দেশের মূল রাজনৈতিক স্রোতধারা থেকে পার্বত্যবাসীদের বিচ্ছিন্ন রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং বিশ্বাসী উপজাতীয় জনগণের ওপর পাহাড়ী ছাত্র-গণ-পরিষদ নামধারী সংগঠনের উগ্র নেতৃত্বে নির্যাতন, নিপীড়ন চালাচ্ছে । নিরীহ জনগণকে অপহরণ, হত্যা-গুম করছে। ----- দুর্গম পাহাড়ী গ্রামগুলোতে চাঁদা আদায়সহ গ্রাম্য শালিস করার মতো কাজ করে আসছে। পাহাড়ী ছাত্র-গণপরিষদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের প্রতি যে সব উপজাতীয় জনগণের সমর্থন নেই তাদেরকে গণ-আদালত বসিয়ে অত্যাচার করা হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রাখেন এমন অসহায় উপজাতীয়কে মারধর করা হয়। কাউকে কাউকে গ্রামবন্দী করে রাখা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পাহাড়ী ছাত্র-গণ-পরিষদ দেশের প্রচলিত আইন উপেক্ষা করে নিজেরাই আইন প্রয়োগ করছে। যেসব উপজাতীয় ছেলে-মেয়ে তাদের আনুগত্য স্বীকার করেননি এমন অনেককে মাথা ন্যাড়া করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়ে অপমান করছে। সাধারণ উপজাতীয় জনগণকে রাষ্ট্র, সরকার ও প্রশাসন বিরোধী মনোভাবাপন্ন

---

[১৮] অধিকার ঃ পিপিএসপিসি'র মুখপাত্র ঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

করে তোলার চক্রান্ত কার্যকর করার জন্য তৎপর রয়েছে। সরকারকে সহযোগিতা না দেয়ার জন্য জনগণকে জোরপূর্বক বাধ্য করতে চাইছে। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় অখন্ডতাকে বিপন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে[২২]।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের কতিপয় ঘটনা পিপিএসপিসি তাদের পুস্তিকায় তুলে ধরেছে। ঐসব ঘটনার কতিপয় উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় এখানে তুলে ধরলাম ঃ

১. ৮ জানুয়ারী '৯৪ তারিখে পিসিপি'র ৪ জন সন্ত্রাসী সিনেমা হল থেকে মহাজন পাড়া যাওয়ার জন্য মাত্র ৩ টাকায় একটি রিক্সা ভাড়া করে। রিক্সা থেকে নেমে তারা মাত্র ১ টাকা ভাড়া গরীব ও অসহায় রিক্সাওয়ালা জামালকে দেয়। জামাল তা নিতে অস্বীকৃতি জানালে তারা তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। তাদের বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ি থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি থানার মামলা নং ২, তারিখ ৯ জানুয়ারী ১৯৯৪; ধারা ৩০২/৩০৪।

২. ১০ জানুয়ারী '৯৪ তারিখে পিসিপি'র কতিপয় সদস্য রাস্তা অবরোধ ও কালভার্টের ক্ষতিসাধনসহ একটি বাস ভাংচুর করে। এ সময় তারা সরকারী প্রশাসনের জারীকৃত ১৪৪ ধারা ভংগ করে। জানা যায় পিসিজি এস এস এর পক্ষে তারা চাঁদা আদায় করেছে। তাদের বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি থানা মামলা নং ১/২/৩ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারী '৯৪। ধারা সন্ত্রাস দমন আইন ১৯৯২।

৩. ২৮মে '৯৪ তারিখে পিসিপি'র সদস্যরা বেলাল নামে এক বাঙ্গালী হকারকে ভাইবোনছড়া বাজারে প্রহার করে। মঙ্গলাদেবী চাকমা নামে এক উপজাতি মহিলার সাথে বেলালের গামছা বিক্রির সময় কথা কাটাকাটি থেকে এ ঘটনার সূত্রপাত। বাজার সেক্রেটারী মারফত সাময়িকভাবে এ সমস্যার সমাধান করা হয়। কিন্তু পরে গ্রাম্য শালিসে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান শক্তিপদ রোওয়াজার উপস্থিতিতে বেলালকে ৪০০/- টাকা জরিমানা করা হয়। কিন্তু পিসিপি'র সদস্যরা এটাকে নারী গঠিত ব্যাপার মনে করিয়া অবলাবস্থা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পরবর্তী সময় ৪ জুন তারিখ উপজাতিদের বাজারে আসতে বাধা প্রদান করে। পরবর্তীতে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসকও সমস্যাটি সমাধান করতে ব্যর্থ হন তাদের অনমনীয় মনোভাবের জন্য।

---

২২ অধিকার ঃ পূর্বোক্ত।

পরে জানা যায় তাদের আপাতঃ উদ্দেশ্য ছিল বাজারের কাছ থেকে ভিডিপি পোষ্টকে সরিয়ে ফেলা। কারণ এই পোষ্ট বিভিন্নভাবে পিসিপি'র সদস্যদের বেআইনীভাবে কাঠ আনা-নেওয়ায় বাধা দিত। তাদের দাবী ছিল পোষ্টটি সরিয়ে ফেলা। তাদের দাবী পূরণ হয়নাই বিধায় তারা উপজাতিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের বাজারে আসতে বাধা দিত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অবস্থা স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসে।

৪. ৭ আগষ্ট '৯৪ তারিখে পিসিপি'র একটি সংঘবদ্ধদল খবং পুরিয়া গ্রামের কমলা দেবী এবং তার মেয়ে মাধুরীকে ধর্ষণ করে। নির্যাতিতরা খাগড়াছড়ি থানায় একটি মামলা করে। পরের দিন পুলিশ তাদের ধরতে গেলে তারা বাধা প্রদান করে। এক পর্যায়ে তারা পুলিশের উপর চড়াও হলে ৩ জন পুলিশ আহত হয় এবং তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে আরো পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছালে তারা পালিয়ে যায়। এ নিয়ে খাগড়াছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলার নং ৪, তারিখ ৮ আগষ্ট '৯৪: ধারা ৩৭৬/৩৪২.৩২৩/১১৪।

৫. ১২ সেপ্টেম্বর '৯৪ তারিখে পুলিশ কনষ্টেবল মোঃ আকরাম হোসেনকে পিসিপি'র এক দল কর্মী খাগড়াপুরে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। যখন সে একটি উপজাতীয় মহিলার বিয়ে নিয়ে চায়ের দোকানে বসে হাসি-তামাসা করছিল তখনই এই ঘটনা ঘটে। পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই নিয়ে খাগড়াছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলার নং ৫, তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর '৯৪: ধারা ১৪৭/১৪৮/১৪৯।

৬. ১৪ ডিসেম্বর '৯৪ তারিখে পিসিপি'র সদস্যরা বাবুছড়াতে রিপন চাকমা নামে বাবুছড়া হাইস্কুলের এক শিক্ষককে মারধর করে। পিসিপি'র '৯৪ এর মিটিং এবং মিছিলে যোগ না দেওয়ায় তার এই দুর্গতি।

৭. ১২ এপ্রিল '৯৫ তারিখে পিসিপি'র সদস্যরা স্থানীয় জেলা সরকার পরিষদ অফিসে প্রবেশ করিয়া প্রহরারত পুলিশের উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌছলে তারা পালিয়ে যায়। এ নিয়ে খাগড়াছড়ি থানায় একটি মামলা হয়। মামলা নং ৭, তারিখ ২৩ এপ্রিল '৯৫: ধারা ১৪৩/৪৪৭/৪২৭।

৮. ১৩ এপ্রিল '৯৫ তারিখে পিসিপি'র সদস্যরা ফুলমিয়া নামে এক রিক্সাওয়ালাকে মারধর করে এবং তার রিক্সা ভেঙ্গে ফেলে। সে ভুল করে তাদের মিছিলের ভিতর প্রবেশ করেছিল।

৯. ১৪ এপ্রিল '৯৫ তারিখে পিসিপি'র সদস্যরা দিঘীনালা-খাগড়াছড়ি রোডে বাসভাড়া চাওয়ায় বাসের ষ্টাফদের মারধর করে।

১০. ২০মে '৯৫ তারিখে পিসিপি'র সদস্যরা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানের গাড়ীতে ইট নিক্ষেপ করে এবং গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে ফেলে যখন ড্রাইভার চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। যাহোক ড্রাইভার অবিলম্বে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

১১. ২২ মে '৯৫ তারিখে পিসিপি'র সদস্যরা পানছড়ি কলেজের কাছে একটি ট্রাককে আটকিয়ে চাঁদা দাবী করে। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ট্রাকের চাবী এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কেড়ে নেয়।

১২. ২৯মে '৯৫ তারিখে পিসিপি'র এবং পিজিপি'র সদস্যরা দিঘীনালা থানার নলকাবা গ্রামে উপজাতিদের মারধর করে। কারণ তারা প্রবীণ চন্দ্র চাকমাকে কাঠ দিতে অস্বীকার করে এবং শান্তিবাহিনীর আঞ্চলিক পরিচালককে ধরে পিটায়। যখন তিনি প্রবীণ চাকমাকে কাঠ দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন তখন তাকে পিটানো হয়। পিসিপি'র সদস্যরা পরে এক গ্রাম্য শালিশ বসায়।

১৩. ১১ জুন '৯৫ তারিখে পিসিপি'র সদস্যরা বাদশা মিয়া নামে চান্দের গাড়ীর এক কন্টাক্টারকে ধরে মারধর করে। পিসিপি'র ৩ জন সদস্য পানছড়ি-খাগড়াছড়ি রাস্তায় পেরাছড়াতে চান্দের গাড়ী থামায়। কিন্তু গাড়ী ভর্তি লোকজন থাকায় মাত্র দুইজন গাড়ীতে উঠতে পারে। যখন গাড়ীটি স্বনির্ভর বাজারে পৌছায় তখন পিসিপি'র সদস্যরা জোর করে কন্টাকটারকে গাড়ী হতে টেনে বের করে। এদিকে বাজার থেকে আরো পিসিপি'র সদস্য হতে থাকলে ড্রাইভার কন্টাকটরকে ফেলে চলে যায়। পরে অন্য গাড়ীর লোকেরা তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতলে ভর্তি করে। খাগড়াছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটির নং ৬, তারিখ ১১ জুন '৯৫; ধারা ৩২৩/৩২৪/ ৩৭৯।

১৪. ১৩ জুন '৯৫ তারিখে পিসিপি'র সদস্যরা পানছড়ি - খাগড়াছড়ি রাস্তায় পেয়ারাছড়াতে মিন্টু বিকাশ চাকমা নামে স্থানীয় সরকার পরিষদের একজন সদস্যকে মারধর করে। তার গাড়ী পুড়িয়ে ফেলা হয়। গ্রামবাসীরা তাকে উদ্ধার করলে পুলিশ ভ্যান তাকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে তাকে এমডিএস-এ স্থানান্তর করা হয়। এ নিয়ে খাগড়াছড়ি থানায় একটি মামলা করা হয়। মামলা নং ৮, তারিখ ১৩ জুন '৯৫ ধারা ১৪৭/১৪৮/১৪৯।

১৫. ১৮ জুন '৯৫ তারিখে পিসিপি'র সদস্যরা দিঘীনালাতে অরুণ বিকাশ দেওয়ান এবং তরুণ আলো দেওয়ান নামে দুই ভাইকে ধরে পিটায়। কারণ তারা মিন্টু বিকাশ চাকমার ব্যাপারে দিঘীনালা থানার পিসিপি'র সেক্রেটারীর সাথে ঝগড়া করে। এ নিয়ে দিঘীনালা থানায় একটি মামলা করা হয়। মামলা নং ২, তারিখ ১৯ জুন '৯৫; ধারা ১৪৩/৩২৪/৩২৬।

১৬. ১ জুলাই '৯৫ তারিখে পিসিপি, পিজিপি এবং এইচ ডব্লিও এফ সম্মিলিতভাবে প্রদীপন খীসার মুক্তির জন্য জেলা প্রশাসকের অফিসের সামনে মাইকযোগে মিটিং করে। জেলা প্রশাসক তাদের মাইক ব্যবহার করতে মানা করলে তারা আরও জোরে জোরে শ্লোগান দিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত জেলা প্রশাসক ঘটনাস্থলে ত্যাগ করেন। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে মাইক সরানো হয়।

১৭. ১৮ জুলাই '৯৫ তারিখে পিসিপি/পিজিপি যৌথভাবে প্রদীপ খীসার অ্যারেষ্ট এর ঘটনায় জিরো মাইলের নিকট রাস্তা অবরোধ করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে তারা পুলিশের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে ১৮ জন পুলিশ আহত হয়। অধিক সংখ্যক পুলিশ সেখানে গেলে তারা অবরোধ তুলে নেয়। পিসিপি'র সদস্যরা থানা পরিষদ অফিসের সামনে খাগড়াছড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের একটি গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে ফেলে । তারা জিরো মাইলের কাছে একটি বেসরকারী ট্রাকের কাঁচও ভেঙ্গে ফেলে। ফলশ্রুতিতে খাগড়াছড়ি থানায় একটি মামলা করা হয়। মামলার নং ৫, তারিখ ১৮ জুলাই '৯৫; ধারা ১৪৭/১৪৮/১৪৯।

১৮. ২৭ আগষ্ট '৯৫ তারিখে পিসিপি'র কতিপয় সদস্য খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজে মুসলমান ছাত্রদের আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে বাধা প্রদান করে ব্যর্থ হলে নারাক খাইয়ায় পলাশ নামে এক বাঙ্গালী ছাত্রকে মারধর করে। পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ নিয়ে খাগড়াছড়ি থানায় একটি মামলা করা হয়। মামলা নং ৬৫, তারিখ ২৮ আগষ্ট: '৯৫ ধারা ১৪৭/১৪৮/১৪৯।

১৯. ৩০ আগষ্ট '৯৫ তারিখে পিসিপি'র সদস্যরা ৩ জন বাঙ্গালী ছাত্রকে থানা পরিষদ অফিসের পার্শ্বে খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ ময়দানে মারধর করে। পার্শ্ববর্তী বাঙ্গালী দোকানদাররা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসলে তারা তাদের দোকানের উপর চড়াও হয় এবং ভাংচুর করে। এ নিয়ে খাগড়াছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলা নং ৬, তারিখ ৩০ আগষ্ট '৯৫: ধারা ১৪৩/৩২৩/৩৮০।

২০. ৭ নভেম্বর '৯৫ তারিখে পিসিপি'র সদস্যরা খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজের ৪ জন উপজাতি ছাত্রকে নারায়ন খাইয়াতে মারধর করে। পরে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

২১. ১৮ ডিসেম্বর '৯৫ তারিখে পিসিপি সদস্যরা খাগড়াছড়ি-পানছড়ি রাস্তায় নারায়ন খাইয়া এবং খাগড়াছড়ি-মহালছড়ি রাস্তায় মাইছড়িতে রাস্তা অবরোধ করে। খাগড়াছড়ি জেলার পিজিপি'র সেক্রেটারী বিম্বাইসার খীসার অপহরণ থেকে এ ঘটনার সূত্রপাত। পিসিপি-পিজিপি'র নেতারা খাগড়াছড়ি পরিবহন মালিক সমিতির কাছে খাগড়াছড়ি-দিঘীনালা সড়কে গাড়ী বের না করার জন্য চিঠি লেখে।

২২. ২০ ডিসেম্বর '৯৫ তারিখে পিসিপি'র এবং পিজিপি'র সদস্যরা প্যারাছাড়াতে ১৬টি ট্রাকের মধ্যে ৯টি ট্রাকের আংশিক ক্ষতিসাধন করে ট্রাকগুলিকে পানছড়ির এলএসডি অভিমুখে নিয়ে যাচ্ছিল। এ নিয়ে খাগড়াছড়ি থানায় একটি মামলা করা হয়। মামলা নং ৬, তারিখ ২০ ডিসেম্বর '৯৫; ধারা ১৪৩/৩৪১/৩২৩/৪২৭।

২৩. ২১ ডিসেম্বর '৯৫ তারিখে পিসিপি'র সদস্যরা পানছড়ি কলেজের কাছে অভিযুক্তকে কোর্টে নিয়া যাইতে পুলিশকে বাধা প্রদান করে। অভিযুক্তরা করুদিয়াছড়ার ব্রীজের লোহার পাত খুলতেছিল। এক পর্যায়ে তারা পুলিশের উপর চড়াও হয়। পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পরিস্থিতি আয়ত্বে আসে। এ নিয়ে পানছড়ি থানায় একটি মামলা করা হয়। মামলা নং ২, তারিখ ২১ ডিসেম্বর '৯৫; ধারা ১৪৭/১৪৮/১৪৯।

২৪. ২ জানুয়ারী '৯৬ তারিখে খাগড়াছড়িতে পিসিপি'র সদস্যরা পিপিএসপিসি'র দুই জন সদস্যের কাছ থেকে টাকা এবং হাতঘড়ি কেড়ে নেয়।

২৫. ৫ জানুয়ারী '৯৬ তারিখে পিসিপি'র সদস্যরা অমর জ্যোতি চাকমা নামে পিপিএসপিসি'র একজন সদস্যকে মেরুং বাজার থেকে অপহরণ করে। দিঘীনালা থানায় এ নিয়ে একটি মামলা করা হয়। মামলা নং ২ তারিখ ২৬ জানুয়ারী, '৯৬; ধারা ৩৬৪।

২৬. ১০ জানুয়ারী '৯৬ তারিখে পিসিপি'র এবং পিজিপি'র সদস্যরা দিঘীনালায় পিপিএসপিসি'র এক সদস্যের অনুপস্থিতিতে তার বাড়ীতে ঢুকে সমস্ত জিনিসপত্র পুড়িয়ে ফেলে। দিঘীনালা থানায় এ ব্যাপারে জিডি এন্ট্রি করা হয়। নং ১৬, তারিখ ১০ জানুয়ারী '৯৬।

২৭. ২০ জানুয়ারী '৯৬ তারিখে পিসিপি সদস্যরা পানছড়ি থেকে বিমলেন্দু নামে এক উপজাতীয়কে অপহরণ করে। এ নিয়ে পানছড়ি থানায় একটি জিডি এন্ট্রি করা হয় যার নং ৭২১, তারিখ ২৪ জানুয়ারী '৯৬।

২৮. ২৪ জানুয়ারী '৯৬ তারিখে পিসিপি'র সদস্যরা খাগড়াছড়িতে লুন্টসেন চাকমাকে পিপিএসপিসিকে সমর্থন করায় মারধর করে।

২৯. ৬ ফেব্রুয়ারী '৯৬ তারিখে পিসিপি সদস্যরা ছোরা এবং লাঠি নিয়ে পিপিএসপিসি'র কর্মীদের আক্রমণ করে। এ সময় তারা খাগড়াছড়ি বাসষ্ট্যান্ডের কাছে দেওয়ালে পোষ্টার লাগাইতেছিল। তারা ৪ জন পিপিএসপিসি'র কর্মীকে ধরে নিয়ে যায় এবং ৩ জনকে আহত করে। খাগড়াছড়ি থানায় এ নিয়ে একটি মামলা করা হয়। মামলা নং ৩, তারিখ ০৬ ফেব্রুয়ারী '৯৬: ধারা ১৪৩/৩২৩/৩৬৫।

৩০. ৮ ফেব্রুয়ারী '৯৬ তারিখে পিসিপি-পিজিপি'র সদস্যরা খাগড়াছড়িতে দুটি বাসযোগে মিছিল বের করে। তারা শাপলা স্কোয়ারের কাছে পিপিএসপিসি'র কর্মীদের আক্রমণ করে। এতে পিপিএসপিসি'র ২ জন কর্মী মারাত্মকভাবে আহত হয়। তাদের একজনকে পুলিশ উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। কিন্তু ধীমান নামে আরেকজনকে তারা অপহরণ করে। জানা যায় সে সাহায্যের জন্য 'সিংগার' নামক দোকানে প্রবেশ করলে পিসিপি'র কর্মীরা দোকানে ঢুকে পড়ে এবং কুড়াল দিয়ে তাকে আঘাত করে। পরে তাকে সাথে করে নিয়ে যায়। তারা দোকানেরও ক্ষতি করে। খাগড়াছড়ি থানায় একটি মামলা হয়। মামলা নং ৪, তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারী '৯৬; ধারা ১৪৭/৩২৬/৩৬৪।

৩১. ০৯ ফেব্রুয়ারীঃ '৯৬ তারিখে পিসিপি'র সদস্যরা লাঠিসোটা, ছোরা এবং চাইনিজ কুড়াল নিয়ে মিছিল বের করে এবং শহরে প্রদক্ষিন করার সময় রাস্তায় পিয়ারছড়ায় স্থানীয় সরকার পরিষদ অফিসে ঢুকে পড়ে এবং বিল্ডিং এর গার্ডরুমসহ দরজা-জানালা ভেঙ্গে ফেলে। খাগড়াছড়ি থানায় এ নিয়ে একটি মামলা করা হয়। মামলা নং ৫, তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারী, '৯৬; ধারা ১৪৭/৩৫৩/৪২৭।

৩২. ১০ মার্চ '৯৬ তারিখে পিসিপি-পিজিপি এবং এইচ ডব্লিও এফ কুড়াল এবং লাঠিসোটা নিয়ে একটি মিছিল বের করে। তারা আগ্নেয়াস্ত্র বহন করেছিল বলে ধারণা করা হয়। তারা শহর অতিক্রমের সময় সাপ্তাহিক পাবর্তী অফিসের ক্ষতিসাধন করে এবং রাস্তায় লাইট পোষ্টগুলি ভেঙ্গে ফেলে। এ

নিয়ে খাগড়াছড়ি থানায় একটি মামলা করা হয়। মামলা নং ০৪, তারিখ ১০ মার্চ '৯৬: ধারা ঃ ১৪৩/৪২৭।

৩৩. ১৫ মার্চ '৯৬ তারিখে পিসিপি-পিজিপি'র সদস্যরা স্বনির্ভর বাজারের কাছে ডিএসবি পুলিশের এক কনষ্টেবলকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। তার মাথায় আঘাত লাগে। পিসিপি সদস্যরা তার হাতঘড়িটিও চুরি করে। পরে তাকে এম ডি এস -এ তে ভর্তি করা হয়।

পিসিপি, পিজিপি কর্মীরা সহিদুর রহমার নামে এক মাছ ব্যবসায়ীকে ছুরিকাঘাত করে মোট ১৩৩০/= টাকা ছিনিয়ে নেয়। ঘটনাটি ঘটে পানছড়ির লতিবনে। খাগড়াছড়ি থানায় একটি মামলা করা হয়। মামলা নং ৫, তারিখ ১৫ মার্চ '৯৬: ধারাঃ ৩৩২/৩৩৫/৩০৭।

৩৪. ১৬ মার্চ '৯৬ তারিখে দিলিপ বড়ুয়া নামে এক মাছ ব্যবসায়ী যখন মাছ নিয়ে মহালছড়ি থেকে খাগড়াছড়ি আসছিলেন তখন পিসিপি'র কর্মীরা ঠাকুরছড়ায় তাকে আটকায়। তাদের ২০০/= টাকা দেওয়ার পরও তারা গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে ফেলে।

৩৫. ৩০ মার্চ '৯৬ তারিখে ১৭৩০ ঘটিকার সময় পিসিপি/পিজিপি কর্মীরা খাগড়াছড়ি বাজারের কাছে মিলন চাকমা নামে পিপিএসপিসি'র একজন নেতাকে ছুরিকাঘাত করে। খাগড়াছড়ি থানায় এনিয়ে একটি মামলা করা হয়। মামলা নং ৭ তারিখ ৩১ মার্চ '৯৬, ধারা ৪৩/৩২৪/৩০৭।

৩৬. ৩১ মার্চ '৯৬ তারিখে ১৭.৩০ ঘটিকায় সময় পিসিপি/পিজিপি কর্মীরা খাগড়াছড়ি বাজারের কাছে মিলন চাকমা নামে পিপিএসপিসি'র একজন নেতাকে ছুরিকাঘাত করে। খাগড়াছড়ি থানায় এনিয়ে একটি মামলা করা হয়। মামলা নং ৭ তারিখ ৩১ মার্চ '৯৬, ধারাঃ ১৪৩/৩২৪/৩০৭।

এদিকে ১৮.৩০ ঘটিকায় পিসিপি/পিজিপি কর্মীরা পানখাই পড়ায় বেইলী ব্রীজের পাতকে উঠাইয়া ফেলে। তারা এপি পেট্রোলকে বাধা প্রদান করে এবং পানখাইপাড়ার পোষ্টের উপর তীর ছোঁড়ে। ২০.২৫ ঘটিকার সময় তীরটি পেট্রোল কমান্ডার সুবেদার লতিফের চোখে লাগে। সাথে সাথে সুবেদার লতিফসহ সৈন্যরা পাল্টাগুলি চালালে ক্যাজাই মারমা নামে পিসিপি'র এক সদস্যের মৃত্যু ঘটে এবং উত্থান চৌধুরী নামে এর একজন গুলিবিদ্ধ হয়। মামলা নং ৮, তারিখ ৩১ মার্চ '৯৬; ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৫৩/৩৩২।

৩৭. ১ এপ্রিল '৯৬ তারিখে পিসিপি/পিজিপি'র কর্মীরা ক্যাজাই মারমা'র লাশ নিয়ে মিছিল বের করে এবং শাপলা চত্বরে এসে পুলিশের উপর চড়াও হয়। পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করলে তারা গুলিবর্ষণ করে। এতে করে বাঙ্গালী রিক্সাওয়ালা আহত হয়। পুলিশ ঘটনা আয়ত্বে আনার জন্য ফাঁকা গুলিবর্ষণ করলে দুষ্কৃতিকারীরা লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। খাগড়াছড়ি থানায় এ নিয়ে একটি মামলা হয়। মামলা নং ১, তারিখ ১ এপ্রিল '৯৬; ধারা ১৪৩/৩৫৩/৩০৭।

৩৮. ৬ এপ্রিল '৯৬ তারিখে পিসিপি/পিজিপি কর্মীরা পানছড়িতে চিনকচান কারবারীর বাড়ী ঘেরাও করে তাকে এবং তার স্ত্রীকে মারধর করে। খবর পেয়ে পানছড়ি জোন হেডকোর্য়াটার থেকে একটি টহল দল ঘটনাস্থলে গিয়ে ছোরাসহ পিসিপি'র দুইজন কর্মীকে ধরে ফেলে। জানা যায় তারা তাকে হত্যা করতে এসেছিল। পিসিপি'র কিছু কর্মী আগ্নেয়াস্ত্র বহন করছিল। টহলদল আসাতে তারা পালিয়ে যায়। ধৃতদের পানছড়ি থানায় সোপর্দ করা হয় এবং একটি মামলা দায়ের করা হয়।

৩৯. ১০ এপ্রিল '৯৬ তারিখে পিসিপি/পিজিপি কর্মীরা স্বনির্ভর বাজারে তপন কুমার নামে এক দোকান মালিককে চাঁদা না দেওয়ায় মারধর করে।

৪০. ২৫ এপ্রিল '৯৬ তারিখে উপজাতীয় ডাকাতরা একটি যাত্রীবাহী বাসকে জিরো পয়েন্টের কাছে আক্রমণ করে। যাত্রীরা তাদের ২ জনকে ধরতে সক্ষম হয়। পরে তাদের পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। জানা যায় তাদের একজন পিসিপি কর্মী। খাগড়াছড়ি থানায় এ নিয়ে একটি মামলা করা হয়। মামলা নং ৫, তারিখ ২৬ এপ্রিল '৯৬; ধারা ৩৯৪।

৪১. ২৭ এপ্রিল '৯৬ তারিখে পিসিপি কর্মী সররিন্দ্র চাকমা আরও দুজন পিসিপি'র কর্মী নিয়ে নেশাগ্রস্থ হয়ে আবদুল করিমে নামে এক বাঙ্গাঁলীকে প্রহার করে। ইহা অসন্তোষের সৃষ্টি করে। জোন হেডকোর্য়াটার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তাদেরকে পুলিশে দেওয়া হয়। এ নিয়ে দিঘীনালা থানায় একটি মামলা করা হয়। মামলা নং ৬, তারিখ ২৮ এপ্রিল '৯৬।

৪২. ১৮ মে '৯৬ তারিখে পিসিপি'র কর্মীরা শাপলা চত্বরে পিসিএসপিসি'র সভাপতি অলক চাকমাকে কুড়াল দিয়ে ডান হাতে আঘাত করে।

৪৩. ২৭ জুন '৯৬ তারিখে পিসিপি/পিজিপি/এইচ ডব্লিও এফ সম্মিলিতভাবে খাগড়াছড়িতে অর্ধ-দিবস রাস্তা অবরোধের ডাক দেয়। এইচ ডব্লিও এফ'

এর সদস্যা কল্পনা চাকমার অপহরণের প্রতিবাদে এই অবরোধের ডাক দেওয়া হয়।

৪৪. ১৭ আগষ্ট, '৯৬ তারিখে পিসিপি কর্মীরা চম্পারাণী চাকমা এবং ধনিতা নাম্নী দুই উপজাতি মহিলাকে অপহরণ করে।

উপরোক্ত বিবরণী পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কর্তৃক সংঘটিত হাজারো সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী দুষ্কর্মের অংশ বিশেষ। এখানে আরো লক্ষ্যণীয় যে এসব ঘটনার মধ্যে বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি এলাকা ঘটনা আসেনি। সব মিলিয়ে এরা সেখানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বাংলাদেশের আর দশটি সাধারণ ছাত্র সংগঠনের মতো স্বাভাবিক ও আইনসিদ্ধ কাজে লিপ্ত নয়। অথচ সরকার এ দেশোদ্রোহীদের বৈধ সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ দিয়ে প্রাকারান্তে তাদেরকে দুষ্কর্মে উৎসাহিত করছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনজীবনে সুস্থিতি ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে এবং শান্তিবাহিনীর কার্যক্রম স্তিমিত করতে এ সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রম অনতিবিলম্বে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। ■

গণলাইন

জনসংহতি সমিতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ বাইরের জগতে স্বল্প-পরিচিত সহযোগী সংস্থার নাম হলো গণলাইন। গণলাইন বাস্তব অর্থে শান্তিবাহিনীর মাঠ পর্যায়ের গোয়েন্দা সংস্থা বিশেষ। এলাকার অবস্থান বিবেচনা করে শান্তিবাহিনীর জোন ও এরিয়া কমান্ডাররা গণলাইন প্রতিষ্ঠার নীতিমালা প্রদান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলা এবং স্বল্প-বয়সী কিশোর-কিশোরীদের গণলাইনের কর্মী/সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়। স্থানীয় হেডম্যান ও কারবারীগণ গণলাইনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকে। এছাড়া প্রতিটি গ্রাম ও পাড়ার মুরুব্বী ও প্রভাবশালী উপজাতীয়দেরকে এই সংস্থার সাথে যুক্ত করা হয়, যাদের সাথে সামরিক ও বেসামরিক সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দেখা-সাক্ষাত ও মেলামেশার সুযোগ রয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো এদের মাধ্যমে সেনাবাহিনী ও প্রশাসন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং কোন সন্ত্রাসী আটক হলে এদের প্রভাব খাটিয়ে তাদেরকে মুক্ত করানো।

শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে সফল করার জন্য গণলাইন অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইহা শান্তিবাহিনীর দিক-নির্দেশনার প্রতীক বা গাইড বিশেষ। ইহা ছাড়া শান্তিবাহিনী অচল ও অন্ধ। গণলাইন প্রধানতঃ নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করে ঃ

১. নিরাপত্তা বাহিনীর স্থায়ী ছাউনী, শিবির ও টহলের ওপর সর্বাক্ষণিক নজর রাখা;
২. সেনাবাহিনীসহ নিরাপত্তা রক্ষীদের অবস্থান, চলাচল, লোকবল, সম্ভাব্য অস্ত্রসস্ত্র, পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং তা যথাস্থানে পৌছিয়ে দেয়া;
৩. শান্তিবাহিনীর কোন আস্তানা কিংবা আশ্রয়স্থলের দিকে নিরাপত্তা বাহিনী গমনের সামান্যতম সন্দেহ সৃষ্টি হলে, তৎক্ষণাৎ সে তথ্য শান্তিবাহিনীর সংশ্লিষ্ট ও সন্নিহিত আস্তানায় (যদি থাকে) পৌছিয়ে দেয়া;
৪. শান্তিবাহিনীর যেকোন অভিযান পরিচালনার আগে সংশ্লিষ্ট এলাকার অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, সম্ভাব্য প্রতিকূলতা, নিকটবর্তী সেনাশিবির, বা অন্যান্য নিরাপত্তা রক্ষীদের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য, আক্রমণের সময়, আক্রমণ স্থলে গমন ও প্রস্থানের সহজ পথ প্রভৃতি সম্পর্কিত সঠিক তথ্য শান্তিবাহিনীকে আগাম প্রদান করা;
৫. স্থানীয় জনগণের মধ্যে শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা, প্রতিবাদ, বিরূপ মন্তব্য প্রত্যক্ষ করা·

৬. শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধবাদী লোকদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করা: এবং
৭. শান্তিবাহিনীর চিঠিপত্র একস্থান হতে অন্য স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়া।

গণলাইনের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু উপজাতীয় মহিলাদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে যে, তাদের অধিকাংশই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিছক জীবন বাঁচানোর জন্য শান্তিবাহিনীর জন্য বেগার খাটছে। তারা জানান যে, প্রায় প্রতিটি পরিবারের কিশোর-কিশোরী কিংবা মহিলাদের পর্যায়ক্রমিকভাবে গণলাইনে কাজ করতে হয়। কোন এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আগাম তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার গণলাইন সদস্যদের ব্যর্থতা ও কর্তব্যে শৈথিল্য ও অবহেলার জন্য দায়ী করা হয় এবং কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়। অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থ ও শত্রুতা উদ্ধারের জন্য গণলাইনের সাথে সংশ্লিষ্টরা মিথ্যে রিপোর্ট দিয়ে নিরীহ উপজাতীয়দের নাজেহাল করে। এ উপদ্রব হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন কোন গণলাইন সদস্যদেরকে অর্থ প্রদান করতে হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ■

গ্রাম পঞ্চায়েত

জনসংহতি তৃণমূল পর্যায়ে যে সংগঠনটির বিস্তৃতি ঘটিয়েছে তা হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েত শান্তিবাহিনী ও জনসংহতি সমিতির প্রাণ বিশেষ। জনসংহতি সমিতি এবং শান্তিবাহিনীসহ ইহার অন্যান্য সহযোগী সংগঠনসমূহের সমুদয় ব্যয় নির্বাহের জন্য যে ব্যাপক অর্থের প্রয়োজন হয়, প্রধানতঃ গ্রাম পঞ্চায়েত সে অর্থ যোগাড় করে থাকে। এর প্রধান দায়িত্ব হলো পরিবার প্রতি চাঁদা ও ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করে মূল তহবিলে জমা দেয়া। চাঁদা বা ট্যাক্স আদায়ে ব্যর্থ হলে তা পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজাতীয়কে একাধিকবার সতর্ক করে দেয়া হয়। এরপরেও ঐ ব্যক্তি চাঁদা প্রদান না করলে তাকে শায়েস্তা করার জন্য শান্তিবাহিনীকে আহ্বান জানানো হয়। শান্তিবাহিনী এসে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি চাঁদা পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ বেঁধে দেয়। ঐ সময়ের মধ্যে চাঁদা প্রদান না করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মারধর, অথবা অপহরণ কিংবা হত্যা করা হয়।

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রায়ই সাধারণ উপজাতীয়দের নিয়ে ঘরোয়া বৈঠকে বসে। এ সব বৈঠকে উপস্থিত উপজাতীয়দেরকে কল্পিত জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতা ব্যাখ্যা করে তাদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। অনেক সময় এসব বৈঠকে শান্তিবাহিনী কিংবা জনসংহতি সমিতির স্থানীয় সন্ত্রাসীরা অংশ নিয়ে থাকে। তারা সংগঠনের সর্বশেষ অবস্থা, অগ্রগতি এবং ভবিষ্যত কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে উপস্থিত উপজাতীয়দের অভিহিত করা হয়। এসব বৈঠকে সেনাবাহিনীসহ নিরাপত্তা রক্ষীদের বিরুদ্ধে নানা ধরণের কুৎসা রটিয়ে উপজাতীয়দের ক্ষেপিয়ে তোলা হয়।

বাংলাদেশের প্রতি অনুগত উপজাতীয়দের সনাক্তকরণ এবং তাদেরকে পাড়াবন্দী, গৃহবন্দী কিংবা সমাজচ্যুতকরণে গ্রাম পঞ্চায়েত বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গ্রাম পঞ্চায়েত কোন উপজাতীয়কে ম্যানেজ (নিয়ন্ত্রণ) করতে ব্যর্থ হলে শান্তিবাহিনীর সাহায্য নেয়া হয় এবং শান্তিবাহিনী শক্তি প্রয়োগ করে তাকে স্বপক্ষে আনে কিংবা হত্যা করে।

সাধারণতঃ দুর্নীতিপরায়ণ ও অর্থলিপ্সু উপজাতীয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হতে উৎসাহবোধ করে। কেননা আদায়কৃত চাঁদার একটি অংশ তারা আত্মসাৎ করে বলে জানা গেছে। তাছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হিসেবে তারা সাধারণ উপজাতীয়দের ওপর নানা ধরণের অত্যাচার চালায় এবং অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করে। ■

চাকমা-সৃষ্ট সমস্যা

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১৩টি উপজাতির মধ্যে চাকমারা হলো সংখ্যাগুরু। সাংবাদিক আলিমুজ্জামান হারুন প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী চাকমাদের মোট সংখ্যা হলো ২,৪১,২১৬ জন, যাদের ৩,৪২৬ জন বান্দরবানে, ১,৪১,৫৯৫ জন রাঙ্গামাটিতে এবং ৯৬,৫৯৫ জন খাগড়াছড়িতে বাস করে। রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়িতে চাকমারা সংখ্যাগুরু হলেও বান্দরবানে তাদের অবস্থান পঞ্চম। আবার ১৩টি উপজাতির মধ্যে চাকমাদের শতকরা হার হলো ৪৮।

সংখ্যাধিক্য ছাড়াও চাকমারা শিক্ষা-দীক্ষায় এবং আধুনিক জীবনাচরণে অন্যান্যের তুলনায় অনেক অগ্রসর। শতকরা প্রায় ৬৫ জন চাকমা শিক্ষিত। অথচ এমন উপজাতি রয়েছে যাদের মধ্যে শিক্ষার অলো এখনো পৌঁছায়নি।

জনসংখ্যার আধিক্য, শিক্ষা-দীক্ষায় প্রাগ্রসরতা এবং সহায়-সম্পদে শক্তিশালী অবস্থানে থাকায় কিছু কিছু চাকমা বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের মনে এ ধারণা জন্মে যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করা গেলে তারাই এ অঞ্চলে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। জনসংহতি ও শান্তিবাহিনীর গোপন দলিল মতে অন্যান্য উপজাতির ওপর কর্তৃত্ব ও খবরদারি চালাতে এবং সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ক্ষমতা চাকমাদের হাতে নিতে হবে।

এ ধরণের মানসিকতা চাকমা বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের আচ্ছন্ন করার প্রেক্ষিতে এক শ্রেণীর রাজনীতিক উচ্চাভিলাসী চক্রান্তের অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশে হতে বিচ্ছিন্ন করার সশস্ত্র চক্রান্তে লিপ্ত হয়। জনসংহতি সমিতি এবং শান্তিবাহিনী কিংবা অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের আদি ও হালের নেতৃত্বের দিকে তাকালে বুঝা যায় এ চক্রান্ত কাদের দ্বারা, কি উদ্দেশ্যে পরিচালিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিভুক্ত জনগণ এবং বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য চাকমারা এ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সমুদয় উপজাতীয় জনগণের স্বাধিকার আন্দোলন হিসেবে চালিয়ে দেবার প্রচেষ্টা চালায়। অন্যান্য উপজাতিদের কাছে চাকমাদের চক্রান্তমূলক আন্দোলনকে প্রতিনিধিত্বমূলক সার্বজনীন ও সামগ্রিক রূপ দেবার জন্য তারা বিভিন্ন উপজাতি হতেও সামান্য সংখ্যক সুবিধা শিকারী সংগ্রহ করে। কিন্তু মূল নেতৃত্ব চাকমাদের হাতেই থেকে যায়।

চাকমাদের লক্ষ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ হতে আপাততঃ পৃথক করা সম্ভব না হলেও অন্ততঃ এমন একটি শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন আনা,

যাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারীদের উচ্ছেদ করা যায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ দায়-দায়িত্ব এই অঞ্চলের উপজাতীয় অধিবাসীদের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। এমন ধরণের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা গেলেও চাকমারা লাভবান হবে। কারণ জনসংখ্যাধিক্য এবং শিক্ষিতের হার অধিক হবার প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের মালিক মোক্তার চাকমারাই হবে।

এ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সমুদয় উপজাতি জনগণের আন্দোলন হিসেবে দাঁড় করানো উদ্দেশ্যে চাকমারা তাদের কৌশল পরিবর্তন করে এখন তাদের কল্পিত স্বদেশকে জুম্মল্যান্ড বলে অভিহিত করছে এবং বিভিন্ন উপজাতিদেরকে একত্রে 'জুম্মা' জনগন বলে অভিহিত করছে। তথাপি পার্বত্য চট্টগ্রামেরও ১৩টি উপজাতির সব ক'টির প্রতিনিধিত্ব জনসংহতি সমিতি কিংবা শান্তিবাহিনীতে নেই।

প্রথম দিকে অন্যান্য উপজাতিভুক্ত কিছু উপজাতীয় জনসংহতি সমিতি এবং শান্তি বাহিনীর গোপন লক্ষ্য সম্পর্কে ততখানি সচেতন ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে চাকমাদের মূল লক্ষ্য এবং কর্তৃত্ববাদী আচরণ চাকমারাই গোপন রাখতে পারেনি। শান্তিবাহিনী, শরনার্থী কল্যাণ সমিতিসহ জনসংহতি সমিতির যতোগুলো সহযোগী সংগঠন রয়েছে তাদের সবগুলোর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চাকমাদের দখলে। এসব সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে যেসব আঞ্চলিক বা স্থানীয় নেতৃত্ব (বিশেষতঃ শান্তিবাহিনীর অধিনায়কত্বের ক্ষেত্রে) রয়েছে, তাদের অধিকাংশ চাকমাদের হাতে। সৈয়দ মাহমুদ আলীর মতে, "The Shanti Bahini is an overwhelmingly chakma organisation"।[১৩]

জনসংহতি সমিতি কিংবা শান্তিবাহিনীসহ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য উপজাতিভুক্ত কর্মী, অনুসারী-সমর্থকরা চাকমাদের কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা এবং নেতৃত্ব দখলের প্রবণতা কালক্রমে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। ফলে অন্যান্য উপজাতিভুক্ত শান্তিবাহিনীর সদস্যরা, বিশেষতঃ ত্রিপুরা ও মারমারা ধীরে ধীরে শান্তিবাহিনী ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এবং দলত্যাগীদের বিভিন্ন ধরণের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রেক্ষিতে শান্তিবাহিনীতে দলত্যাগের প্রবণতা বেড়ে যায়। এসব কারণে শান্তিবাহিনী মূলতঃ চাকমা বাহিনীতে পরিণত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে কেন চাকমা উপজাতিকেন্দ্রীক সন্ত্রাস বলা যায়, তার ক'টি আলামত উপস্থাপন করা যেতে পারে ঃ

S. Mahmud Ali : The Fearful State : P.166.

১. ব্যাপক অনুসন্ধানের পর জানা গেছে জনসংহতি সমিতি এবং তার সহযোগী সংগঠনসমূহের সংগঠক, নেতা-কর্মী সমর্থক প্রধানতঃ চাকমা উপজাতিভুক্ত। অন্যান্য উপজাতীয়রা ভীতি ও চাপের মুখে শান্তিবাহিনীর প্রতি বাস্তব অর্থে বাহ্যিকভা সায় দেয়। এ বিচ্ছিন্নতার প্রতি তাদের আত্মিক ও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন নেই।

২. ত্রিপুরায় আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ চাকমা। জনসংখ্যানুপাতে উপজাতীয় জনগণের মধ্যে চাকমারা শতকরা ৪৮ জন হওয়ায় শরনার্থীদের শতকরা হারও ৪৮ হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। চলমান বিদ্রোহ কোন কালে সফল হলে, চাকমা উপজাতীয়রাই সর্বাধিক লাভবান হবে বিধায় জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর প্ররোচণায় চাকমারাই অধিক হারে সাড়া দিয়ে ত্রিপুরায় চলে যায় শরণার্থী সাজতে যাতে চাকমাদের আন্দোলনের প্রতি আন্তর্জাতিক সহানুভূতি আসে।

৩. শান্তিবাহিনীর সদস্যদের শতকরা ৯৫ ভাগই হলো চাকমা। স্বার্থগত কারণে চাকমাদের মধ্যে আত্মসমর্পণের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কম হওয়া সত্ত্বেও আত্মসমর্পণকারী চাকমাদের সংখ্যা অন্যান্য উপজাতিভুক্তদের চেয়ে অনেক বেশী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় যে শান্তিবাহিনী বেশী মাত্রায় চাকমা-সমৃদ্ধ। অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য সূত্র তাদের নিজস্ব উদ্যোগে ১৯৮৯ সনের ৮ই মে হতে ১৯৯৬ সনের ৯ জুলাই পর্যন্ত আত্মসমর্পণকৃত শান্তিবাহিনীর সদস্যদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করেছেন। এই তালিকায় ১২৪ জন আত্মসমর্পণকৃত শান্তিবাহিনীর সদস্যদের নাম, ঠিকানা ও উপজাতীয়তার পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। এদের মধ্যে ৯৪ জন চাকমা, ১৯ জন মারমা, ১০ জন ত্রিপুরা এবং বাকী ২ জন বোম। অথচ জন সংখ্যানুপাতে চাকমা উপজাতিভুক্ত আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৬৪ জনের মতো হওয়া উচিত ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ভিন্ন ভিন্ন উপজাতিভুক্ত জনগণ এবং দলত্যাগী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সাথে একান্তে আলাপ করে জানা গেছে যে, শান্তিবাহিনীতে বর্তমানে চাকমা ছাড়া অন্যান্য উপজাতির প্রতিনিধিত্ব নেই বললেই চলে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বশেষ (২৫ জানুয়ারী '৯৭) সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই ছিল চাকমা, কিংবা তাদের কাছে বিকিয়ে যাওয়া ২/১ জন অন্যান্য উপজাতীয়।

এসব কারণে সৈয়দ মামমুদ আলী শান্তিবাহিনীকে ব্যাপকভাবে চাকমাশ্রিত সংস্থা "Overwhelmingly Chakma Organisation" বলে মন্তব্য করেছেন।

সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মূলতঃ চাকমাদের সুদূরপ্রসারী চক্রান্তপ্রসূত চাকমা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, এর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান উপজাতিভুক্ত জনগণের আত্মার সম্পর্ক নেই। তাই তারা চাকমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাথে বাস্তব অর্থে সংশ্লিষ্ট নয়। সরকার অন্যান্য উপজাতিভুক্ত জনগনের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করলে এসব উপজাতীয়রাই শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীদের নির্মূলকরণে এগিয়ে আসবে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের যেসব অঞ্চলে চাকমারা অপেক্ষাকৃত সংখ্যাগুরু, সে সব অঞ্চলেই সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাত্রা বেশী। অন্যদিকে যে অঞ্চলে চাকমাদের উপস্থিতি তেমন ব্যাপক নয়, সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যক্রমও জোরালো নয়। তিনটি পার্বত্য জেলার মধ্যে বান্দরবান তুলনামূলকভাবে শান্ত থাকার মূল কারণ হলো ঐ জেলায় চাকমারা সংখ্যালঘু।

এসব কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান আন্দোলনকে চাকমাদের কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও স্বার্থসিদ্ধির চক্রান্ত হিসেবে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞরা চিহ্নিত করেছেন। সৈয়দ মাহমুদ আলী তাই যথার্থই বলেছেন ঃ

"One difficulty lay in reconciling the JSS claim that it represented the interests of all thirteen 'small nationalities' of CHT with its failure to persuade a large number of volunteers from other tribes to join the struggle. The JSS and the Shanti Bahini remained chakma organisations and this failure reflected in the inter-tribal cleavages that have long divided CHT."।[1] (ভাবানুবাদ ঃ অন্যান্য উপজাতীয়দের ব্যাপক সংখ্যায় স্বেচ্ছাসেবক (শান্তিবাহিনীর সদস্য) হতে রাজী করাতে জনসংহতি সমিতির ব্যর্থতা, তার এ দাবীর সাথে সামঞ্জস্য স্থাপনকে কষ্টকর প্রমাণ করে যে, ইহা পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩টি 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার' স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে। ফলে জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনী চাকমা সংগঠনে পরিণত হয়েছে এবং এ ব্যর্থতা আন্তঃউপজাতি বিভেদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, যা পার্বত্য চট্টগ্রামকে দীর্ঘদিন যাবত বিভক্ত করে রেখেছে।)

কল্পনা চাকমা উধাও হবার পর মার্কিন কংগ্রেসম্যান Stephanie Joan Goldman প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে যে চিঠি পাঠান (৭ আগষ্ট, ১৯৯৬) তা পাঠ করলে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে জনসংহতি সমিতি এবং তার প্রভুরা চলমান আন্দোলনকে চাকমাদের আন্দোলন হিসেবেই বহির্বিশ্বে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। এ চিঠিতে কংগ্রেসম্যান লিখেছেন ঃ "The Hill Woman Federation is working towards peace and justice for the chakma people." (ভাবানুবাদ ঃ পাহাড়ী মহিলা সমিতি শান্তি ও চাকমা জনগনের সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ে যাচ্ছে)। অর্থাৎ পাহাড়ী মহিলা সমিতিসহ

---

[1] S. Mahmud Ali : The Fearful State : P.191.

অন্যান্য সংগঠনসমূহ চাকমাদের জন্যই লড়ছে, অন্যান্য উপজাতীয়দের জন্য নয়। চাকমাদের তথাকথিত দুঃখ-দুর্দশার প্রতি ইঙ্গিত করে ঐ চিঠির অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ ষাটের দশকে রাঙ্গামাটিতে কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করায় হাজার হাজার চাকমা গৃহহীন হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চাকমা ছাড়াও অন্যান্য উপজাতিভুক্ত জনগণ একইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসম্যান অন্যান্য সম্প্রদায়ের কথা না বলে কেবল চাকমাদের কথা উল্লেখ করে এই সত্যই প্রমাণ করলেন যে, জনসংহতি সমিতি বিদেশীদের কাছে এই কথাই প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বলতে চাকমাদেরকে এবং চাকমা বলতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বুঝায়, এখানে অন্য কোন উপজাতির বা বাঙ্গালীদের কোন অস্তিত্ব নেই।

শুধু আমেরিকান নয়, সারা বিশ্বের, এমনকি ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় জনসংহতি সমিতি নেতাদের চাকমা নেতা নামে অভিহিত করে থাকেন। জনসংহতি সমিতির নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতিকে ভারতীয় পত্র পত্রিকাগুলো প্রায়ই চাকমা নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতি হিসাবে প্রচার করতে অধিকতর পছন্দ করেন। ১৯৯৬ সনের ৮ ও ১২ নভেম্বর কলিকাতা ভিত্তিক 'The statesman' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের দিকে তাকানো যাক। ৮ নভেম্বর এর প্রতিবেদনে জনসংহতি সমিতিকে 'চাকমা সংগঠন' (Chakma organisation) এবং এর নেতাদের ৪ বার চাকমা নেতা এবং মাত্র ১ বার উপজাতীয় নেতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে ১২ নভেম্বরের প্রতিবেদনে সত্য রঞ্জন খীসা এবং ম্রিনাল কান্তি চাকমাকে চাকমা নেতা (উপজাতীয় কিংবা জনসংহতি সমিতির নেতা নয়) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ প্রতিবেদন হতে দু'একটি বাক্যের অংশ বিশেষ ১. 'The refugee leaders and four chakma organisations urged a parliamentary committee' ২. "A memorandum submitted to the committee by the chakma organisations' ৩. 'The chakma leaders led by Mr. srota Ranjan Khisa and Mr. Nirmal Kanti Chakma' এ তিনটি বাক্যেই বার বার চাকমা কথাটি এসেছে, বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদেরকে অন্যান্য উপজাতিসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে দেখানো হয়নি।

এসব তথ্য উপস্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতীয় জনগণ এবং বিশ্বব্যাপী তাদের শুভানুধ্যায়ীদের বুঝিয়ে দেয়া যে উপজাতীয় জনগণের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে তা সম্পূর্নরূপে চাকমা উপজাতিভুক্ত কিছু বিদেশী চরের কারসাজি, যারা পার্বত্যাঞ্চলে চাকমাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ■

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ভারত

- ❑ ভূ-কৌশলগত স্বার্থ
- ❑ আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ
- ❑ বিচ্ছিন্নতার নেপথ্য শক্তি
- ❑ পুশব্যাক - চাকমা
- ❑ সম্পদ আহরণে বাধা

ভূ-কৌশলগত স্বার্থ

ভারতের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিক কৌশলগত গুরুত্ব অনেক বেশী। ভারতীয় কর্মকর্তা এবং কাউন্টার ইন্সারজেন্সী বিশারদরা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশকে ভারতের স্বার্থ, এমনকি আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষায় হুমকি বলে মনে করেন। মওসুমী বনভূমির অন্তর্ভুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম মাঝারী ধরণের গেরিলাযুদ্ধ চালানোর এবং তাদের অভয়াশ্রমের জন্য আদর্শ স্থানীয় বিধায় পাকিস্তান আমলে ভারতের নাগা-মিজো বিদ্রোহীদের গোপন ঘাঁটি এখানে গড়ে ওঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রামু, বলিপাড়া, আলী কদম, দীঘিনালা, মাওদোক, থানচিতে মিজো গেরিলাদের ঘাঁটি ছিল। সুতরাং ভারত সরকার পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে সব সময়ই ছিল উদ্বিগ্ন। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জেএন দীক্ষিত গত বছর একটি বাংলাদেশী বাংলা দৈনিক-কে প্রদত্ত সাক্ষাতকারে বলেছিলেন যে, সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে ব্যবহার করে পাকিস্তান ভারত বিরোধী যে তৎপরতা চালাচ্ছিল তাতে তারা উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি বলেন "এ ধরণের একটি ধারণা আমাদের সব মহলেই গড়ে উঠেছিল যে, একটি স্বাধীন বাংলাদেশ হয়তো এসব সমস্যার সমাধান দেবে।" ৭১-পূর্ব পরিস্থিতিতে মিজো-নাগা বিদ্রোহীদের বাগে আনতে ভারত সরকার কখনই সফল হয়নি। তাই ভারত সরকার পাকিস্তানের পূর্বাংশে এমন পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় ছিল যাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগা-মিজো কিংবা উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্য কোন সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীর আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হতে না পারে।

১৯৭১ সনে মিত্রবাহিনীর ছদ্মাবরণে ভারতীয় সেনাবাহিনী সর্বাধিক তৎপর ছিল, পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে নয়, নাগা-মিজো বিদ্রোহীদের ঘাঁটি অনুসন্ধান এবং সেগুলো ধ্বংস করার অভিযানে। 'অপারেশন ঈগল' নাম দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিযান চালিয়ে নাগা-মিজোদের ঘাঁটি তছনছ করে। এছাড়া 'র'-সৃষ্ট মুজিব বাহিনী নাগা-মিজো বিদ্রোহীদের নির্মূলকরণে ভারতীয় বাহিনীকে বিশেষভাবে সহায়তা করে। 'র' বুঝে-শুনেই মুজিব বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীর অধিনায়কত্ব মরহুম শেখ ফজলুল হক মনিকে প্রদান করে। ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার অব্যবহিত আগে এবং পরে শেখ ফজলুল হক মনি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপস্থিত থেকে ভারতকে লজিষ্টিক সহায়তা প্রদান করেন।

The Fearful State : P.182.

দৈনিক জনকণ্ঠ ঃ ঢাকা ঃ ২ এপ্রিল, ১৯৯৬।

শেখ মুজিবের অনুরোধে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারিত হওয়ায় এবং ভারতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সীমিত পরিসরে হলেও বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলায় ভারত মুজিবের জীবদ্দশাতেই ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সার্বিক ও স্থায়ী আনুগত্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে। ভারতীয় কর্তাব্যক্তি ও সমরকুশলীরা শঙ্কিত হন যে, যদি বাংলাদেশে কখনো এমন ধরণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীসমূহের প্রতিও সহানুভূতিশীল হয়, তবে তা ভারতের জন্য চরম মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি ভারতের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বৈরী মনোভাবাপন্ন কোন সরকার বাংলাদেশে অধিষ্ঠিত হয় তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্ঘাত উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীসমূহের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হবে যার পরিণতি হবে পাকিস্তানী আমলের চেয়েও ভয়াবহ এবং যা হবে ১৯৭১ সনে পাকিস্তান ভাঙ্গার অন্যতম উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

ভারতীয় নীতি-নির্ধারক ও সমরকুশলীরা তাই শেখ মুজিবের কাছ হতে এমন প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলেন যে, বাংলাদেশ কখনোই যেন ভারতের আঞ্চলিক অখন্ডতার প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী বা অন্যকোন শক্তির আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হতে না পারে। ভারত ধূর্ততার সাথে মুজিবকে দিয়ে তথাকথিত শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নেয় যার মধ্যে অন্যভাবে ঐ প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭২ সনের ১৯শে মার্চ প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী এবং মরহুম শেখ মুজিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত ঐ চুক্তির নবম অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, চুক্তি স্বাক্ষরকারী কোন দেশই তার ভূমি এমন কোন কাজে ব্যবহৃত হতে দেবে না, যাতে অন্য দেশ সামরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, কিংবা তার নিরাপত্তার জন্য

১৯৭১ সনের অক্টোবর মাসে ভারত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন তার একটি শর্তে যদিও বলা হয়েছে ঃ "বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে (কতদিন অবস্থান করবে তার সময় সীমা নির্ধারণ করা হয়নি)। ১৯৭২ সনের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছর এ সম্পর্কে পুনরীক্ষণের জন্য দু'দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের কোন সেনাবাহিনী থাকবে না।"

আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য মুক্তি বাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে।" মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের দিল্লী মিশন-প্রধান, বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ৭ম জাতীয় সংসদের স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর সাক্ষাতকার হতে সংগৃহীত। ঐ সাক্ষাতকারে জনাব চৌধুরী আরো উল্লেখ করেন যে, চুক্তি স্মাক্ষারের পরই (চুক্তির আলোচ্য শর্ত ও অন্যান্য জঘন্য শর্তাবলীর ভয়াবহতা অনুধাবন করে -- আমরা নিজস্ব ধারণা) প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অসুস্থ (মুর্চ্ছিত) হয়ে পড়েন। (মাহমুদুল হকঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে'র' এবং সিআরএঃ ৮, ওয়ারী ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩ঃ ১ ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৯১ঃ পৃঃ ১১৯)

হুমকি সৃষ্টি করতে পারে।[৮১] এ নিশ্চয়তার সহজ মানে হলো ভারতের কোন অঞ্চলের কোন বিদ্রোহী গোষ্ঠী বা তৃতীয় কোন দেশকে বাংলাদেশের মাটিতে ঘাঁটি, আশ্রয় কিংবা অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেবার কাজে ব্যবহার করার সুযোগ দেয়া হবে না।

দুঃখজনক ব্যাপার হলো ভারত বাংলাদেশের কাঁধে এ চুক্তি ঝুলিয়ে দিয়ে নিজেই শেখ মুজিবের জীবদ্দশাতেই (১৯৭৩ সনে) চাকমা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত কিছু বিপথগামীকে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করার প্রকাশ্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে চুক্তির শর্ত সরাসরি ভঙ্গ করে। ভারতের মাটি ঐ সব বিপথগামী দেশদ্রোহীদের নিরাপদ আশ্রয় ও অস্ত্র প্রশিক্ষণের ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের কুক্ষিগত হলে বাংলাদেশের ওপর ভারতের সামরিক ও মনস্তাত্তিক চাপ ও কর্তৃত্ব বহুলাংশে বেড়ে যাবে। বার্মার সাথে বাংলাদেশের যে ২৮৮ কিঃ মিঃ দীর্ঘ স্থল সীমান্ত রয়েছে তা ভারতীয় সীমান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় ডানার ভেতর চলে যাবে।

অন্যদিকে বার্মার সাথে ভারতীয় সীমান্ত আরো দক্ষিণমুখী হয়ে মিজোরাম রাজ্য হতে কমপক্ষে আরো ২৮৮ কিঃ মিঃ দীর্ঘ হবে। ফলে বার্মার অর্থনীতি, রাজনীতি, এমনকি আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ওপর ভারত আরো কার্যকরভাবে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে।

এমন পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম বন্দর ভারতের একেবারে নাগালের মধ্যে চলে আসবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বদক্ষিণ সীমান্ত হতে বঙ্গোপসাগরের দূরত্ব হবে মাত্র ৫ কিঃ মিঃ। অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামহীন বাংলাদেশ বিশেষতঃ এর প্রাণ-বিশেষ চট্টগ্রাম বন্দর কিছুতেই আজকের অবস্থায় থাকবে না। ইহা সম্পূর্ণরূপে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভারতের আধিপত্যবাদী থাবার কাছে সমর্পিত হবে।

সর্বোপরি, পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো সমুদ্র-নিকটবর্তী অঞ্চলের ওপর ভারতের কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো চীনের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পূর্বাহ্নেই নিরাপদ করিডোর তৈরী করে রাখা। ভারতীয় সমর কৌশলের বেসামরিক বিশেষজ্ঞ ইন্দ্রোর মালহোত্রা ১৯৯১ সনে "ডিফেন্স স্ট্যাটেজি এনালিসিস" ম্যাগাজিনে লিখেছেন "ভবিষ্যত চীন-ভারতের মধ্যে যুদ্ধে

---

[৮১] Each of the high contracting parties shall refrain from any aggression against the other party and shall not allow the use of its territory for committing any act that may cause military damage for or constitute a threat to the security of the other high contracting party.

ভৌগোলিক ও কৌশলগত দিক থেকে বাংলাদেশ হবে (যুদ্ধের জন্য) চমৎকার ক্ষেত্র। তিব্বতের চুম্বিভ্যালী হতে যদি চীন দক্ষিণে আক্রমণ করে, তা হলে খুব সহজেই শিলিগুড়ি করিডোরের পতন ঘটবে। ফলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল সমগ্র ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় বাংলাদেশই হবে একমাত্র ভরসা।" অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্য ও সামরিক যানবাহন ও সরঞ্জাম সরবরাহের একমাত্র রুট হবে বাংলাদেশ। আর বাংলাদেশের একেবারে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল চীন থেকে মোটামোটি বেশ দূরে এবং কিছুটা হলেও পর্বতময় হওয়ায় ইহা হবে ভারতের সম্ভাব্য সরবরাহ লাইনগুলোর মধ্যে সর্বাধিক নিরাপদ ও সহজতম। এই কারণে সাবেক মার্কিন চীপ অব ষ্টাফ জেনারেল টেলর ভারতকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন চীনের সাথে যুদ্ধের জন্য বাংলাদেশের উপর দিয়েই ভারতকে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্ত, অর্থাৎ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে স্বাধীনতা যুদ্ধ কবলিত, যা মূল ভারত হতে বিচ্ছিন্ন। বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে অবস্থিত ভারতের পশ্চিম বংগ রাজ্যের কলিকাতা বন্দর হলো উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র সরবরাহ লাইন। কিন্তু বর্তমানে কলিকাতা বন্দর মরে যাচ্ছে। ফলে চট্টগ্রাম বন্দর, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের অতি নিকটে, ভারতের আর্থিক ও সামরিক স্বার্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ■

আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ

ভূ-কৌশলগত স্বার্থ ছাড়াও ভারতের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষতঃ বাংলাদেশের মতো একটি জাত্যাভিমানী দেশকে বাগে আনতে এবং একে দুর্বল করতঃ ক্রমান্বয়ে গ্রাস করে উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের জন্য হাতিয়ার বিশেষ। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতীয় চক্রান্তের পেছনে বেশ ক'টি উদ্দেশ্য সক্রিয় রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন ঃ

১. ভারত কখনই একটি স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী বাংলাদেশ কামনা করেনা। ভারত জানে যে, শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী তৎপরতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি যুদ্ধময় পরিস্থিতি বজায় থাকলে বাংলাদেশকে তার অতি মহার্ঘ্য বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ উন্নয়ন খাতে ব্যয় না করে পার্বত্য অঞ্চল রক্ষার কাজে ব্যয় করতে হবে। ফলে দিন দিন এদেশ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হতে হতে এমন ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হবে যে, বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিজ থেকেই ছেড়ে দেবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধ বন্ধ করার অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সরে আসার জন্য জোর দাবী-সম্বলিত আন্দোলন গড়ে উঠবে। লোগাং, নানিয়ার চর প্রভৃতি হত্যাকান্ডকে ব্যবহার করে কিছু বাঙ্গালী সাংবাদিক, রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী মহল এ উদ্দেশ্যে মাঠে নেমেছিলেন। কোন কোন ব্যক্তি চাকমাদের অনুকূলে বিদেশে গিয়েও ওকালতি করে এসেছেন।

২. বাংলাদেশ যেন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতিতে কখনোই ভারত-বিরোধী শিবিরের সাথে হাত মিলাতে না পারে সে জন্য বাংলাদেশের ওপর চাপ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ভারত শান্তিবাহিনীকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। এই কারণেই ভারত চাকমা শরণার্থীদের ফেরত পাঠাতে বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করছে না। কারণ ভারত জানে শরণার্থী সমস্যা সমাধান হয়ে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে আর জিইয়ে রাখা যাবে না। ফলে চাকমা সন্ত্রাসীদের কার্যক্রমও নিস্তেজ হয়ে পড়বে।

৩. যদি কোনভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, তবুও কথিত এই রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ উভয়ের একটিও পৃথক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারবে না। তখন তারা হয়তো ভূটানের মতো আশ্রিত রাজ্য হিসেবে টিকে থাকবে অথবা সিকিমের মতো সম্পূর্ণরূপে ভারতের সাথে মিশে যাবে।

৪. উপরোক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মনিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ ইত্যাদি সমুদ্র সংযোগবিহীন ভূমিবেষ্টিত রাজ্যসমূহে বিরাজমান বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা বাংলাদেশ বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থানে টিকে থাকতে না পারলে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে সমুদ্র সংযোগ পাওয়া যাবে না বিধায় ঐসব রাজ্য স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারবেনা ফলে তারা স্বাধীনতা সংগ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

৫. যদি কথিত চাকমা রাষ্ট্র স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে টিকেও যায়, তথাপি ঐ রাষ্ট্রের ওপর ভারতের প্রভাব বিদ্যমান থাকবে। পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহ দমনে কিংবা চীনের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধের মোকাবেলা করতে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও সমরাস্ত্র অতি দ্রুত পূর্বাঞ্চলে প্রেরণ করা যাবে।

৬. মিজোরাম, নাগাল্যান্ডসহ সমগ্র পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পর্বতসংকুল সুদীর্ঘ আড়াই হাজার কিলোমিটার পথ ঘুরে কলকাতা বন্দর হতে আনা-নেয়া হয়। এতে পরিবহণ খরচ অত্যধিক বেড়ে যায় এবং সময় নষ্ট হয়। বর্তমানে পূর্বাঞ্চলে যে সামগ্রী প্রেরণে পরিবহণ ব্যয় আড়াই টাকা, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুযোগ পেলে ঐ পরিবহণ ব্যয় হবে মাত্র দশ পয়সা। ভারতের মিজোরাম হতে চট্টগ্রাম বন্দরের দূরত্ব ৬০ কিলোমিটার। ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত হতে ফেনী উপকূলবর্তী বঙ্গোপসাগরের দূরত্ব মাত্র দশ কিলোমিটার। পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বদক্ষিণ সীমান্ত নাইকংছড়ি হতে বঙ্গোপসাগরের দূরত্ব কোন কোন স্থান দিয়ে মাত্র ৫ কিলোমিটার। এই কারণে ভারতের কর্তব্যক্তিরা মনে করেন যে পশ্চাদপদ পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি মোতাবেলা করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বন্দর তথা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল ভারতের নিয়ন্ত্রণে আনা একান্ত অপরিহার্য।

৭. ভারতীয় কর্তাব্যক্তিরা মনে করেন একটি স্থিতিশীল সমৃদ্ধ বাংলাদেশ তাদের পরিকল্পিত অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার পথে তো বটেই, ভারতের বর্তমান মানচিত্র নিয়ে টিকে থাকার জন্যও মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। বাংলাদেশ টিকে থাকলে বাংলাদেশ সীমান্ত-সংলগ্ন ভারতের শোষিত-বঞ্চিত রাজ্যসমূহে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আরো তীব্রতর হবে এবং বাংলাদেশ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এবং অস্ত্রপ্রাপ্তির উৎসে পরিণত হতে পারে। ভারত সরকার এবং ভারতীয় পত্র-পত্রিকা ইতোমধ্যেই এ ধরণের অভিযোগ তুলেছে যে, পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বাংলাদেশে

আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ পাচ্ছে এবং তাদের অস্ত্র প্রাপ্তির মূল উৎস হলো বাংলাদেশ। ফ্রন্ট লাইন পত্রিকায় অভিযোগ করা হয়েছে ঃ

"...... Several insurgents groups of North-East India, such as United Liberation Front of Assam (ULFA), the Liberation Peoples' Army (P.L.A). United Liberation Front of Manipur (UNLF) and the National Socialist Council of Nagaland (NSCN) are known to enjoy sanctuary and training facilities in Bangladesh".[৮২]

(ভাবানুবাদ ঃ উত্তর-পূর্ব ভারতের অনেকগুলো সন্ত্রাসী দল, যেমন - আসাম সম্মিলিত যুক্তিফ্রন্ট, গণমুক্তিফৌজ, মনিপুর মুক্তিফ্রন্ট, নাগাল্যান্ড জাতীয় সমাজতান্ত্রিক পরিষদ বাংলাদেশে আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ পাচ্ছে বলে জানা গেছে।)

বাংলাদেশ নতুন দিল্লীর এ অভিযোগ ক্রমাগতভাবে অস্বীকার করে আসলেও ভারতীয় কর্তারা তা বিশ্বাস করছেন না। বাংলাদেশ সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতাকামী গেরিলাদের কথিত ঘাঁটি অনুসন্ধান ও সনাক্ত করার জন্য ভারতীয় কর্মকর্তাদের সরজমিনে অনুসন্ধানের প্রস্তাব দিলে, ভারত সে প্রস্তাবে সম্মত হতে সাহস পায়নি। অপরদিকে অপপ্রচারও বন্ধ করেনি। এমনকি আওয়ামী লীগ সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের গেরিলাদের আশ্রয় না দেবার প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্বেও ভারত বাংলাদেশকে সন্দেহ করছে।[৮৩] সুতরাং তাদের এ অভিযোগ পরিকল্পিত ও ইচ্ছাকৃত । তাদের দৃঢ় ধারণা যে, বাংলাদেশ ভারতের জন্য এমন একটি কাঁটা, যা উপড়ে না ফেললে ভারতের অস্তিত্ব হুমকির মুখোমুখি হবে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, ভারত বহুবিধ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে চাকমাদের লেলিয়ে দিয়েছে। ভারত একেবারে স্বার্থহীন কিংবা উদ্দেশ্যহীনভাবে চাকমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়নি। চাকমাদের জন্য ভারতের সমর্থন যদি স্বার্থহীনই হত, তবে ভারতের অরুণাচল প্রদেশ, মিকিরহীল, ত্রিপুরা, মিজোরামে যে সব চাকমা বসবাস করে তাদের জন্য ভারত একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা করে দিত। কিংবা বৃটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে যে ২৫০ বর্গমাইল এলাকা বিচ্ছিন্ন করে ভারতের বর্তমান মিজোরাম রাজ্যের সাথে যুক্ত করা হয়েছে, ভারত চাকমাদেরকে অন্ততঃ সে অঞ্চলটি ফিরিয়ে দিত। চাকমারা জানে ভারত কখনোই এই বদান্যতা দেখাবে না। ■

---

৮২ Frontline : Madrass, India : July 2, 1993.

৮৩ The INdian Express : New Delhi : January 8, 1997.

বিচ্ছিন্নতার নেপথ্য শক্তি

জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীকে প্রদত্ত ভারতীয় সহযোগিতা কেবল বাংলাদেশকে পর্যুদস্ত করার মধ্যেই সীমিত নয়, বরং ভারত তাদেরকে ভাড়াটে চর ও লাঠিয়াল হিসেবেও ব্যবহার করে। ত্রিপুরার টিএনভি, নাগাল্যান্ডের এনএসসিএন ও মিজোরামের এমএনএফ গেরিলাদলসহ ভারতীয় শাসন ও শোষণ বিরোধী অন্যান্য জঙ্গী সংগঠনগুলোকে নির্মূল করার জন্য ভারত শান্তিবাহিনীকে ব্যবহার করে। চেহারা ও আকৃতিগত সামঞ্জস্য থাকায় ভারত ব্যাপক সংখ্যক শান্তিবাহিনীর সদস্যকে নাগাল্যান্ড, মনিপুর, ত্রিপুরা, মিজোরামের জঙ্গী সংগঠনগুলোতে অনুপ্রবেশ করায়। এমনকি সাধারণ চাকমাদেরকে 'র' এর গোয়েন্দা হিসেবে ব্যবহার করে জঙ্গী সংগঠনগুলোর পরিকল্পনাসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ব্যবহার করে। খোদ কলিকাতা হতে অতি সম্প্রতি প্রকাশিত চরমভাবে চাকমাপন্থী একটি গ্রন্থের সরাসরি স্বীকোরুক্তি ঃ

"শ্রীমতি গান্ধীর শাসনের অধ্যায়ে যখন উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগা ও মিজো সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের একাংশ বিদ্রোহ শুরু করে তখন ভারত সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জনজাতিকে কাজে লাগিয়ে নাগা ও মিজোদের এই বিদ্রোহ দমন করার সিদ্ধান্ত নেন। যেহেতু ভারতীয় ভূ-খন্ডে মিজোরাম পার্বত্য চট্টগ্রামের পাশেই অবস্থিত সেই হেতু ধরে নেয়া হয়েছিল নাগা ও মিজোদের মধ্যকার খবরাখবর ভারত সরকারকে একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরাই জোগাড় করতে সাহায্য করতে পারে। সেই মর্মে ভারত সরকার নাগা-মিজোদের দমনে এই জুম্মা জনজাতিকে ব্যবহার করতে শুরু করে। কেন্দ্রীয় সরকারের মতানুযায়ী স্থির করা হয় বাংলাদেশ থেকে আগত এই শরণার্থীদের পূর্ববর্তী নেফা অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, অধুনা অরুণাচল প্রদেশের জনমানব বর্জিত এলাকায় বসবাস করার সুযোগ দেওয়া হবে। সম্ভবতঃ ১৯৬২ সনে চীন-ভারত যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে চীনের শক্তি মোকাবিলা করার বাস্তব প্রয়াস ছিল ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত। কারণ শরণার্থীদের জনমানব বর্জিত এলাকায় বসবাসের সুযোগ দিলে সেখানকার জনসংখ্যা যে শুধু বাড়বে তা নয় এর ফলে ভারতের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। এই জনজাতি বসবাসের সুযোগ লাভের জন্য ভারত সরকারের প্রতি অনুগত থাকবে এবং প্রয়োজনবোধে

এদের একাংশকে ভারতীয় সামরিক বাহিনীতেও কাজে লাগানো যেতে পারে বলে কেন্দ্রীয় সরকার ভেবেছিল।"[১১]

সে ধারা আজো অব্যাহত রয়েছে। এ কারণে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরাসহ অন্যান্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের ভারত বিরোধী শক্তিগুলোকে দাবিয়ে রাখা ভারতের পক্ষে অনেকখানি সহজতর হয়। অন্যদিকে 'র' মনে করে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী তৎপর থাকলে ভারতবিরোধী জঙ্গীরা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাময়িকভাবে হলেও আশ্রয় নেবে না, কারণ তারা জানে যে, চাকমারা ভারতের স্বার্থবাহী। সব মিলিয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌছা যায় যে, চাকমা উপজাতি বিশেষত শান্তিবাহিনী ভারতের ক্ষেতের বেড়া হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা যে সম্পূর্ণরূপে ভারতের প্রত্যক্ষ চক্রান্তের ফসল তা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর নতুন দেশকে পঙ্গু করা এবং নতুন সরকারের ওপর সার্বক্ষণিক চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, সর্বোপরি, পার্বত্য চট্টগ্রামকে গ্রাস করে উত্তর - পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসসূহের স্বাধীনতা আন্দোলন স্তব্ধ করার দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য সামনে রেখে ভারত কংগ্রেসী পান্ডা গোপাল কৃষ্ণ চাকমা, স্নেহ কুমার চাকমা ও অন্যান্যের সহায়তায় সাবেক সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র লারমাসহ কতিপয় উপজাতীয় বিশেষতঃ চাকমা উপজাতিভুক্ত উচ্চাভিলাষী ও বিপথগামী ব্যক্তির সমন্বয়ে জনসংহতি সমিতি নামে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন গড়ে তোলে। এর সামরিক শাখার নাম দেয়া হয় শান্তিবাহিনী।

অথচ ১৯৭২ সনের ১৯ মার্চ স্বাক্ষরিত ২৫ বছর মেয়াদী 'বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা' চুক্তির ৮ম অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, চুক্তিভুক্ত এক দেশ অন্য দেশের সন্ত্রাসীদের নিজ ভূখন্ড ব্যবহার করতে দেবে না এবং অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা এবং আঞ্চলিক অখন্ডতাবিরোধী কোন কাজে উৎসাহ যোগাবে না। কিন্তু ভারত চুক্তি স্বাক্ষরের এক বছরের মধ্যে মানবেন্দ্র লারমা'র নেতৃত্বাধীনে জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীদের ভারতীয় ভূ-খন্ড হতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালানোর সুযোগ দিয়ে চুক্তির শর্তাবলী লংঘন করে।

'র'-এর সাথে মানবেন্দ্র লারমা'র সরাসরি যোগাযোগের প্রতি ইঙ্গিত করে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ফ্রাইডে' পত্রিকায় বলা হয়েছে ঃ

---

[১১] দেবযানী দত্ত ও অনুসূয়া বসু রায় চৌধূরী ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম - সীমান্ত রাজনীতি ও সংগ্রাম ঃ ক্যালকাটা রিচার্স গ্রুপঃ এশিয়া সাউথ ফোরাম ফর হিউম্যান রাইটসঃ কলিকাতা ঃ ১৯৯৬ ঃ পৃ ৬৩-৬৪।

"মানবেন্দ্র লারমা ১৯৭৬ সনে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করেন।"[১] একই পত্রিকার একই সংখ্যায় আরো বলা হয়েছে যে, মানবেন্দ্র লারমা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে তৎপর হলে ভারতের চাপের মুখে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পত্রিকার বক্তব্য ঃ

"The attempt of M.N. Larma to negotiate a settlement with Zia was failed as the armed wing of the Jona Sanghati Samity was compelled to initiate armed operations under Indian pressure in mid. 1976."

পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন, মানবেন্দ্র লারমা ভারতীয় চর হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাংলাদেশ সরকারের সাথে আপোষ করতে পারেন, এই আশংকায় ভারত শান্তিবাহিনীর ভিতরে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলে। ফলে জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর ভিতর অন্তঃর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। অন্তঃর্দ্বন্দ্বীয় কলহের সূত্র ধরে ১৯৮৩ সনের ১০ ডিসেম্বর ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের অমরপুর মহকুমায় শান্তিবাহিনীর কল্যাণপুর শিবিরে মানবেন্দ্র লারমা তার ৮ জন সহকর্মীসহ প্রীতিকুমার উপদলের আক্রমণে নিহত হন।

'র'-অনুচর মানবেন্দ্র লারমাকে হত্যার পেছনে যে 'র'-এরই ইঙ্গিত ছিল, তার প্রমাণ হলো হত্যাকারী উপদলের নেতা প্রীতিকুমার চাকমা কিংবা তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে ভারত সরকার আজ পর্যন্ত কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং তাকে রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদা দিয়ে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় লালন পালন করা হচ্ছে।

ত্রিপুরায় মানবেন্দ্র লারমা এবং তার সহযোগীদের মৃত্যু নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, শান্তিবাহিনীর মূল কোথায় এবং এর উৎসাহ দাতা কে ? শান্তিবাহিনীর পেছনে যদি ভারতের হাত না-ই থাকত, ভারতের প্রতিবেশী দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীরা কিভাবে ভারতে আশ্রয় পেল এবং সশস্ত্র সংঘর্ষে ভারতের মাটিতে মৃত্যুবরণ করল ?

সম্প্রতি জনসংহতি সমিতির বর্তমান নেতা নিহত মানবেন্দ্র লারমার সহোদর অনুজ সান্টু লারমা বাংলাদেশ সরকারের সাথে সংলাপ চালাচ্ছেন। এই সংলাপ যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে 'র' পরিকল্পনার বাইরে গিয়ে ইতি টানতে না পারে সেজন্য 'র' সান্টু লারমার সংগঠনের দ্বিধা বিভক্তি সৃষ্টি

---

[১] Friday : June 3, 1988.

করে বিকল্প নেতৃত্ব তৈরি করেছে। ১৯৯৪ সনের ২ অক্টোবর ত্রিপুরার রাইসাবাড়ীতে চলমান সংলাপের ব্যাপারে মত বিরোধের প্রেক্ষিতে সান্টু লারমার সাথে জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক সচিব রূপায়ণ দেয়ানের তীব্র বাদানুবাদের ফলে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে। তাতে উভয় দলের বেশ কিছু সন্ত্রাসী আহত হয়। সান্টু লারমার অনুরোধে ভারত সরকার মুখ রক্ষার তাগিদে রূপায়ণ দেওয়ানকে সাময়িকভাবে গৃহবন্দী করে ক'দিন পর মুক্ত করে দেয়।

জনসংহতি সমিতির বিকল্প হিসেবে এবং 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'র' জনসংহতি সমিতির পাশাপাশি আরো বেশ ক'টি (সাইন বোর্ডসর্বস্ব হলেও) সংগঠন খুলেছে। এগুলো হলো ঃ জুম্মল্যান্ড রিজিওয়ানাল কাউন্সিল, জুম্ম লিবারেশন ফ্রন্ট, জুম্মকণ্ঠ, জুম্মজাতি ইত্যাদি। অন্যদিকে মানবেন্দ্র লারমার হত্যাকারী প্রীতিকুমার চাকমার উপদলকেও টিকিয়ে রাখা হয়েছে। একইভাবে মানবেন্দ্র লারমা'র বিধবা স্ত্রীর নেতৃত্বে শান্তিবাহিনীর অন্য একটি গ্রুপ গড়ে তোলা হয়েছে। এই মহিলাও ভারতের রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে আগরতলায় অবস্থান করছেন। অর্থাৎ সবগুলো সংগঠনই ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রকাশ্য কিংবা 'র'-এর ইঙ্গিতে ও পৃষ্টপোষকতায় গোপন আস্তানা খুলেছে।

'র' তত্ত্বাবধানে ১৯৮৬ সনে আমস্টারডামে; ১৯৮৭ সালে ভারতের কলিকাতায়; ১৯৮৯ সালে হামবুর্গে; ১৯৯২ সালে নিউ ইয়র্কে; ১৯৯৩ সনে নেদারল্যান্ডে, ভারতের কলিকাতায় ও অরুনাচল প্রদেশে এবং ১৯৯৭ সনে ব্যাঙ্ককে বিভিন্ন শ্লোগানের আরণে চাকমা সম্মেলন হয়। এ সব সম্মেলনের মূল লক্ষ্যই ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের অনুকূলে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। প্রতিটি সম্মেলন ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং কূটনীতিকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সনে আমষ্টারডামে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে রোমে নিযুক্ত ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত এসকে লাম্বা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান মিঃ সমীরণ দেওয়ান এক সাংবাদিক সম্মেলনে শান্তিবাহিনীর আশ্রয়, অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দানের জন্য ভারত সরকারকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন যে, শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দের আসল উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন নয়, বরং ভারতের ইচ্ছায় পরিচালিত হয়ে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি।[৭২]

---

[৭২] দৈনিক ইনকিলাব ঃ ১২ নভেম্বর, ১৯৮৯।

'র' ত্রিপুরা এবং মিজোরামে মোট ২৫টি প্রশিক্ষণ শিবিরে শান্তিবাহিনীর ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। দীর্ঘ ১৩ বছর যাবত শান্তিবাহিনীর আঞ্চলিক অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ত্রিবিদ চাকমা ১৯৯৪ সনের ২৭ জুলাই বাংলাদেশ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ সালে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে শরণার্থী সমস্যা, শান্তিবাহিনীর অপতৎপরতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ভূয়া ও ভিত্তিহীন প্রচার-প্রপাগান্ডার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে আন্তর্জাতিকীরণের প্রচেষ্টার জন্য ভারতকে অভিযুক্ত করেন। তিনি স্বীকার করেন যে, শান্তি বাহিনীর সদস্যরা ভারতের নির্দেশে বলপূর্বক উপজাতীয়দের ভারতে তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং তথাকথিত শরণার্থী শিবিরে আটকে রাখে। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের এমন নয়টি স্থানের নাম উল্লেখ করেন, যেখানে শান্তিবাহিনী আস্তানা গেড়েছে। এ স্থানগুলো হলো সাবরুম, সিলাইছড়ি, বোয়ালপাড়া, কদমতলী, দায়েক, বারাছড়ি, রালমা, ত্রিমাথা এবং রত্ন নগর। কিছু কিছু উচ্চপর্যায়ের সন্ত্রাসী দেরাদুনে প্রশিক্ষণ নিয়েছে বলে তিনি জানান। এছাড়া মায়ানমারেও তাদের কয়েকটি ঘাঁটি রয়েছে।

নেপালের রাজধানী কাঠমন্ডু হতে প্রকাশিত প্রভাবশালী পাক্ষিক 'স্পট লাইট' তার ২৯ এপ্রিল ১৯৮৮ সনে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলেছে যে, ভারতের একশ্রেণীর লোক শত্রুতামূলকভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক তৎপরতা চালাতে শান্তিবাহিনীকে প্ররোচিত করছে। পত্রিকার মতে কথিত শান্তিবাহিনীর সদস্যরা তাদের নাশকতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে তড়িগড়ি সীমান্তের ওপারে পালিয়ে যাবার সময় প্রচুর পরিমাণে ভারতের তৈরি সাবমেশিনগান, হারবাইন ও এস এল আর, ষ্টেনগান এবং ৩০৩ রাইফেল ফেলে যায়। এতে বিনা দ্বিধায় প্রত্যায়িত হয় যে, শান্তিবাহিনী সীমান্তের ওপার হতে এসব অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে। পত্রিকায় আরো বলা হয়েছে যে, শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ৩০ হাজার উপজাতি ভারতে চলে যায়। ভারতে প্রচার মাধ্যমগুলোর ক্ষতিকর প্রচারণা শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বাধা সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী বিভিন্ন সময়ে শান্তিবাহিনীর নিকট হতে যেসব অস্ত্র সংগ্রহ করেছে, সেগুলোর অধিকাংশই ছিল ভারতে নির্মিত।

ভারতীয় গবেষক সাংবাদিক অশোক রায়না তার 'Inside RAW' শীর্ষক গ্রন্থে এবং বিশিষ্ট গবেষক অশোক এ. বিশ্বাস তার 'RAW's Role In Furthering India's Foreign Policy' শীর্ষক পুস্তিকায় স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, 'র' চাকমা সন্ত্রাসীদের সার্বিক সমর্থন প্রদান করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালাচ্ছে।

নতুন দিল্লীতে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক হাই কমিশনার জনাব ফারুক ছোবহান (বর্তমান পররাষ্ট্র সচিব) 'এশিয়া এজ' কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন ঃ

The Bangladesh Government felt that the main support for the 'Shanti' Bahini' was being provided by the Research and Analysis wing in India. (বাংলাদেশ সরকার মনে করেন যে, শান্তিবাহিনীর মূল শক্তি ও সমর্থন ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রিচার্স ও এনালিসিস উইং থেকে আসছে।)

ভারত উপজাতীয় সন্ত্রাসীদের কেবল আশ্রয়, অর্থ, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ করেই ক্ষ্যান্ত থাকছে না সারা বিশ্বে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালানোর জন্যও তাদের ব্যবহার করছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের ভারতীয় পাসপোর্ট দিয়ে জাপানসহ বাংলাদেশকে সাহায্য প্রদান করে এমন ধরণের দেশে পাঠিয়ে সাহায্য প্রদান বন্ধের জন্য তদবির করেছে। মানবাধিকার লংঘনজনিত মিথ্যে ও সাজানো ঘটনা চিত্রায়িত করে 'র' বহির্বিশ্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্গনের ভূয়া প্রচারণা চালাচ্ছে।

আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সাবেক সদস্যসহ বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের কোথাও শান্তিবাহিনী কিংবা জনসংহতি সমিতির কোন দফতর, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কিংবা শিবির নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামকে যে কয়টি কোড্ বা ছদ্ম অঞ্চলে বিভক্তি করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকটির সদর দফতর ত্রিপুরা কিংবা মিজোরামে অবস্থিত। রংপুর, কুমিল্লা, ঢাকা এবং আর পি ফোর্সের সদর দফতর মিজোরামে। সিলেট জেলার সদর দফতর ত্রিপুরার বোয়ালখালির জারলছড়ি সংলগ্ন স্থানে। এ ছাড়া বিজয়পুর, বাদলছড়ি ও জিরানীতে তিনটি কেন্দ্রীয় অধিদফতর রয়েছে। আগরতলার কুঞ্জবনে দৌলতপুর নামক স্থানে একটি বৈদেশিক দূতাবাস খোলা হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার গন্ডছড়া মহাকুমার রতন নগরে একটি মিলিটারী একাডেমী স্থাপন করা হয়েছে । ক্যাডার বিশেষতঃ, সংঘর্ষে আহতদের দক্ষিণ ত্রিপুরার শ্রীপুর (বৈরাগীর দোকান) হাসপাতাল ও শান্তিপুর হাসপাতালে এবং মিজোরামের স্বর্ণশিলা (আদে বাজার) হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়। এসব হাসপাতালে আরোগ্য না হলে রোগীদের আগরতলা, কলিকাতা বা অন্য কোন উন্নততর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ত্রিপুরা ও মিজোরামে শান্তিবাহিনীর কমপক্ষে ২৫টি প্রশিক্ষণ শিবির রয়েছে। এসব শিবিরে বিএসএফ এর প্রশিক্ষকরা মূল প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করে। কিছু সংখ্যক বাছাইকৃত ক্যাডারকে দেরানদুনস্থ সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বলে জানা গেছে।

শান্তিবাহিনীর বিভিন্ন শ্রেণী/বিভাগ রয়েছে । এর মধ্যে সরাসরি যোদ্ধা ও চাঁদা সংগ্রহকারীরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কিছু সদস্য তথ্য সংগ্রহকারী (বা গোয়েন্দা) এবং বশীকরণকর্মী (motivation worker) রয়েছে।

ভারত জনসংহতি সমিতি এবং শান্তিবাহিনীকে নিঃশর্তে তার ভূমি ব্যবহারের অনুমতি দেয়। শান্তিবাহিনী সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় (অর্থাৎ ১৯৭৬ এর আগে) ভারত বিনামূল্যে পর্যাপ্ত অস্ত্র শান্তিবাহিনীকে সরবরাহ করে। ভারত যখন বুঝে যে, শান্তিবাহিনীর পক্ষে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, তখন হতে অর্থাৎ ১৯৭৬ সনের পর হতে ভারত ধীরে ধীরে অস্ত্রের মূল্য বাবধ অর্থ নিতে শুরু করে। ১৯৮৮ সন পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়। ১৯৮৮ সন হতে মোট মূল্যের অর্ধেক অর্থ প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়। এসব অস্ত্রের অধিকাংশাই ভারতে নির্মিত। এছাড়া আমেরিকা, রাশিয়া, বুলগেরিয়াসহ অন্যান্য যেসব বিদেশী অস্ত্র ভারত তার সেনাবাহিনীর জন্য বহু আগে সংগ্রহ করেছিল সেসব পুরানো অস্ত্র (যা ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোন কাজে আসেনা) শান্তিবাহিনীকে সরবরাহ করা হয়।

শান্তিবাহিনীকে প্রশক্ষিণ প্রদানে ভারত কিভাবে সহযোগিতা দিচ্ছে তার যথার্থ ও বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন শান্তিবাহিনীর সাবেক সার্জেন্ট মেস্তারাম ত্রিপুরা এবং তার সহযোগীরা। তারা ভারতের মিজোরাম রাজ্যের কান্তলুই ঘাঁটিতে গেরিলা প্রশিক্ষণ নেন। তারা জানালেন ঃ

"শান্তিবাহিনীর সাথে ভারতীয় সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন মহলের হরদম যোগাযোগ রয়েছে। মিজোরাম প্রদেশের সীমান্তে পাহাড়ী এলাকায় তাদের কান্তলুই ঘাঁটির নিকটতম অপর দু'টি ঘাঁটিতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র', এসআইবি, সিআইডি, এসবি'সহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিয়মিতভাবে যাতায়াত করে শান্তিবাহিনীর নেতাদের সাথে প্রায়ই শলা-পরামর্শ করে থাকে। তাছাড়া ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর ক্যাম্পও শান্তিবাহিনীর ঘাঁটির নিকট অবস্থিত। --- প্রশিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় সরকারী-বেসরকারী মহলের লোকজন। শান্তিবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, রসদপত্রসহ যাবতীয় মালামালের যোগান পায় ভারতে বসেই।"[৮৭]

ভারত সরকার কেবল শান্তিবাহিনীকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করেই বসে নেই, অতি জরুরী মুহূর্তে ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষীরা বাংলাদেশের

---

[৮৭] দৈনিক সংগ্রাম ঃ ১ জুন ঃ ১৯৯৫ ইং

অভ্যন্তরে প্রবেশ কিংবা শান্তিবাহিনীর আক্রমণের সময় পেছনে থেকে তাদেরকে মনস্তাত্তিকভাবে উদ্দীপ্ত করে।

শান্তিবাহিনীর গ্রেফতারকৃত সদস্যরা স্বীকার করেছে যে, ১৯৯১ সনের ২৯ জুন রামগড়ের খাগড়াবিলে যে ১০জন ঘুমন্ত মানুষকে হত্যা করা হয় তার সাথে বিএসএফ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা সংলগ্ন সীমান্তবাসীরা জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশ-ত্রিপুরা সীমান্ত বরাবর ফেনী নদী পার হতে বিএসএফ প্রায়ই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। কখনো কখনো বিএসএফ বাংলাদেশ সীমান্তে অকারণে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ শুরু করে, বিশেষতঃ ঐ সব অঞ্চলে, যেখানে বিডিআর' এর ঘাঁটি রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো বিডিআরকে সীমান্ত টহল হতে বিরত রেখে বিএসএফ'এর আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্ত রাখা, যাতে ঐ সুযোগে শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে।

আশির দশকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জনৈক ক্যাপ্টেনসহ বেশ ক'জন ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার কাহিনী তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নির্ভরযোগ্যসূত্র মতে এর পরেও বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় নিরাপত্তা রক্ষীরা বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ধরা পড়লেও কূটনৈতিক কারণে ঐসব ঘটনা জনসাধারণ্যে প্রকাশ করা হয় নি।■

পুশব্যাক - চাকমা

চাকমাদের নিয়ে ভারত পরস্পর বিরোধী দ্বিমুখী নির্মম নীতি অবলম্বন করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা প্রভাবিত শান্তিবাহিনী এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে তিনটি পার্বত্য জেলার সমন্বয়ে তথাকথিত 'জুম্মল্যান্ড' প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কানি ও সাহায্য প্রদান করে ভারত প্রমাণ করতে চাইছে ভারতের মতো বিশ্বস্ত, অকৃত্রিম ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু চাকমাদের আর নেই। তাদেরকে অন্ন, অর্থ, অস্ত্র, আশ্রয়, প্রশিক্ষণ, সামরিক ও কূটনৈতিক সমর্থন প্রদান করে বাংলাদেশের এক দশমাংশ ভূমি বিচ্ছিন্ন করার নীল নক্শা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভারত চাকমাদের বন্ধু সেজেছে।

কিন্তু ভারতীয় চাকমাদের ভারত হতে বহিস্কার করার পটভূমি প্রস্তুত করতে ভারত সরকার এবং এর গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যে নির্মম ও অমানবিক পন্থা অবলম্বন করছে, তা প্রমাণ করে ভারত কারোরই প্রকৃত বন্ধু নয়। ভারতের এ দ্বিমুখো নীতি এই সত্যিই প্রমাণ করে ভারত কারো বন্ধু হলে তার পতনের জন্য কোন শত্রুর প্রয়োজন নেই।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে বিশেষতঃ মিজোরাম, অরুনাচল প্রদেশ, আসাম ও ত্রিপুরায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চাকমা উপজাতি রয়েছে। পুরুষানুক্রমে ভারতীয়, এমন চাকমা ছাড়াও কাপ্তাই পানিবিদ্যুত প্রকল্পের কাজ শুরু হলে কিছু সংখ্যক চাকমা ও হাজং উপজাতির লোক সাবেক পূর্ব পাকিস্তান হতে ১৯৬৪-৬৫ সনের দিকে ভারতে চলে যায়। হাজংরা প্রধানতঃ মায়ানমারে এবং চাকমারা ভারতে গমন করে। প্রথম দিকে আন্দামান নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে পুনর্বাসিত করার চিন্তা-ভাবনা করা হলেও পরবর্তীতে তাদেরকে উত্তর-পূর্ব ভারতে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়। ভারত অন্ততঃপক্ষে দুটো কারণে এদেরকে স্বাগত জানিয়েছিল ঃ

১. বিচ্ছিন্ন-প্রবণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এমন একটি অনুগত শ্রেণী সৃষ্টি করা যারা ভারত সরকারের প্রতি সর্বদা অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করে ভারতের অখন্ডতা রক্ষায় সহযোগিতা করবে, এবং
২. এ সব আশ্রিত উপজাতিদের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাবেক পাকিস্তান বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের সূচনা করা যাবে।

প্রথমোক্ত উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হলেও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আশ্রিত চাকমাদের ব্যবহারের কোন প্রয়োজনই হয়নি। কারণ তাদের আশ্রয়দানের ৬/৭ বছরের মধ্যে (১৯৭১) খোদ পাকিস্তানই ভেঙ্গে যায়।

ঐ সব চাকমা-হাজংদের অধিকাংশকেই অরুনাচল প্রদেশে পুনর্বাসিত করা হয়। কিছু সংখ্যককে মিজোরাম, ত্রিপুরা ও আসামে থাকতে দেয়া হয়, কারণ তাদের আত্মীয়-স্বজন বংশানুক্রমে ঐসব এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিল। মিজোরাম, ত্রিপুরা ও আসামে আশ্রয় গ্রহণকারী চাকমা-হাজংদের ভারত সরকার সাথে সাথেই ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করে। এমনকি, মিজোরামে ১৯৭১ সনে চাকমাদের পৃথক স্বত্তা ও অস্তিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ একটি স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়। কিন্তু অরুনাচলে আশ্রয় গ্রহণকারী চাকমা-হাজংদের অজ্ঞাত কারণে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়নি। যদিও তাদেরকে নাগরিক-সুলভ সার্বিক সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার প্রদান করা হয় এবং তারাও মনে-প্রাণে ভারতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। আশ্রিত চাকমা-হাজংদের জন্মহার মোটামোটি অধিক হওয়ায় গত ৩০ বছরের ব্যবধানে তাদের সংখ্যা লক্ষাধিক হয়ে যায়। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি রাজ্যের মধ্যে অরুনাচল প্রদেশে বিচ্ছিন্নাতাবাদী আন্দোলন তুলনামূলকভাবে এত দুর্বল হবার অন্যতম কারণ হলো সেখানে ব্যাপক সংখ্যক চাকমা-হাজংদের সক্রিয় উপস্থিতি। তারা কঠোর পরিশ্রমী এবং স্থানীয় অধিবাসীরা যে সব পাথুরে-জঙ্গলাকীর্ণ বিরাণভূমিতে কখনোই চাষাবাদ করেনি, চাকামা-হাজংরা সেগুলোকে সুফলা ভূমিতে পরিণত করেছে। তাদের সাফল্যে এবং সংখ্যাবৃদ্ধিতে স্থানীয় অলস অরুনাচলীরা উদ্বিগ্ন এবং ঈর্ষান্বিত।

ভারত সরকার এবং এর গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ চাকমা-হাজংদের সর্বদা স্থানীয় অধিবাসী হতে দূরে অবস্থান করতে। প্ররোচিত করে আসছে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন সে চাকমাদের রক্ষার জন্য ভারত সরকার তার দায়িত্ব পালন করছে না। অরুনাচল প্রদেশে পুনর্বাসিত চাকমা-হাজংদের সব নাগরিক সুবিধা ও অধিকার ভোগের সুযোগ দিয়ে নাগরিকত্ব প্রদান করা না হলেও ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি মোতাবেক ভারত চাকমাসহ সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান হতে ভারতে গমনকারীদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ঐ চুক্তিতে বলা হয়েছিল ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ পর্যন্ত যারা সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান হতে ভারতে প্রবেশ করেছে, তারা ভারতীয় নাগরিক।

এতদসত্বেও রাজ্য সরকার স্পষ্ট বলেছে চাকমা-হাজংদের অরুনাচল ছাড়তে হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ জিগং আপাঙ প্রকাশ্যে বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার চাকমা-হাজংদের অরুনাচল হতে বহিস্কার না করলে তিনি এবং তার সহযোগীরা কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ হতেও সরে দাঁড়াবেন। ফলে সারা অরুনাচল প্রদেশে চাকমা খেদাও আন্দোলন জোরদার হয়েছে। নিখিল অরুনাচল প্রদেশ ছাত্র ইউনিয়নের জঙ্গী কর্মীরা হাজং-চাকমাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভীতি

প্রদর্শন করে। তাদের ঘরের সামনে মৃত্যু-পরোয়ানা-সম্বলিত পোষ্টার টাঙ্গিয়ে আসে। চাকমা-হাজংরা নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যেতে পারছে না। তারা শাক-সব্জি বা অন্যান্য সামগ্রী বিক্রির জন্য যে-কোন বাজারে বা গঞ্জে যেতে পারে না। ফলে তাদের আর্থিক অবস্থা চরম বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদেরকে কোন ভূমি ক্রয় করতে দেয়া হচ্ছে না। এমন কি যেসব চাকমা গত ৫০ বছর ধরে উত্তরাধিকারসূত্রে ভূমির মালিক ছিল তাদেরকে ঐ ভূমি হতে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার চাকমা-হাজংদের ভূমি চাষের যে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন সেগুলো এখন নিছক কাগজে পরিণত হয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সুযোগ দেয়া হচ্ছেনা। সৌভাগ্যক্রমে এখনো যেসব চাকমা-হাজং শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যেতে পারছে, তারা চরম বর্ণবাদী বৈষম্যের শিকার। তাদেরকে শ্রেণী কক্ষে পেছনের সারিতে বসতে হয়।

ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট এই মর্মে রায় দিয়েছে যে চাকমা-হাজংরা ভারতীয় নাগরিক।[**] তা সত্বেও ভারত সরকার কিংবা রাজ্য সরকার তাদেরকে রক্ষার জন্য কোন কার্যকর ভূমিকা রাখছে না। এমনকি হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নি সংযোগের মতো অমানবিক ঘটনারও বিচার হয়না। পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন ভারত সুপরিকল্পিত উপায়ে উদ্দেশ্য-প্রনোদিত হয়ে চাকমা-হাজংদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার ও তার সমর্থক-সহযোগীদের লেলিয়ে দিয়েছে।

মিজোরামী চাকমাদের উৎখাতকরণের একই ধরণের প্রক্রিয়া দেখে উপরোক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। মিজোরামের চাকমারা যে বৈধভাবেই ভারতীয় নাগরিক সে কথা আগেই বলা হয়েছে। অরুনাচল প্রদেশের মতো মিজোরামের কংগ্রেস শাসিত রাজ্য সরকার প্রায় একই পদ্ধতি অনুসরণ করে চাকমাদের অবৈধ বহিরাগত বাংলাদেশী হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরকে বহিস্কারের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। মিজোরাম সরকারও হুমকি দিয়েছে যে, চাকমাদের বহিস্কার করা না হলে তারা কংগ্রেস ত্যাগ করবে। সেখানও চাকমাদের ওপর 'কুইট নোটিশ' জারী করা হয়েছে। ১৯৯২ সালের ২৬ অক্টোবর মিজোরাম সরকার রাজ্যের ভোটার নিবন্ধীকরণ কর্মকর্তাকে এক পত্রে জানিয়েছেন যে, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারীতে অর্থাৎ ১৯৫০ সাল হতে ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চের মধ্যে যারা বাংলাদেশ হতে মিজোরাম প্রবেশ করেছে তারা মিজোরামে ভোটার হতে অর্থাৎ সেখানে বসবাস করতে পারবে না। রাজ্য সরকারের এ ধরণের পত্র ভারত সরকারের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ হওয়া সত্বেও

[**] ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি এ,এইচ আহমদী এবং মাননীয় বিচারপতি সুহাস চন্দ্র সেন-এর নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ চাকমা-হাজংদের দেখা-শুনা করতে ভারত সরকার বাধ্য বলে রায় দিয়েছেন।

ভারত সরকার এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এর ফলে মিজোরাম সরকার বিনা বাধায় চাকমা বিরোধী জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছে। ভারতীয় ইংরেজী দৈনিক দ্য স্টেটসম্যান (১২ ডিসেম্বর ১৯৯৫) জানিয়েছেন মিজোরাম রাজ্যের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ চাকমা ভোটারের নাম নতুন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী লাল থানওয়ালা মন্ত্রীসভার একমাত্র চাকমা মন্ত্রী মিঃ নিরুপম চাকমাকেও ভোটার করা হয়নি। অথচ তিনি ১৯৮৯ সনে রাজ্য বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সাবেক এম.এল.এ. মিঃ এস পি দেওয়ানের নামও ভোটার তালিকায় নেই। মিঃ সিধিয়া চাকমা ১৯৫৫ সাল হতে দীর্ঘকাল যাবৎ জেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন। এখন তার পরিবারের সব সদস্যদের নাম ভোটার তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে।

অন্যদিকে অন্যান্য স্থান হতে আগত অবৈধ বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে মিজোরাম সরকার একই ধরণের পদক্ষেপ নিচ্ছে না। দৈনিক 'স্টেট্সম্যান' (২৭ ডিসেম্বর ঃ ১৯৯৫) পুনরায় জানিয়েছেন মায়ানমার হতে আগত অবৈধ বসবাসকারীদের বহিস্কারের জন্য সাধারণ মিজো কিংবা সরকার মোটেই তৎপর নয়। অথচ বৈধ নাগরিক চাকমাদের বিতাড়নের জন্য তারা সোচ্চার। এই পত্রিকার ১২ ডিসেম্বর সংখ্যায় বলা হয়েছে ঃ "Though there were thousands of Myanmarese and other immigrnts in the state, "the Chakmas" are the main target in Mizoram". (যদিও রাজ্যে হাজার হাজার মায়ানমার ও অন্যান্য বহিরাগত রয়েছে, তথ্যাদি মিজোরামে চাকমারাই হলো প্রধান লক্ষ্যবস্তু।)

১৯৯৫ সনের অক্টোবর মাসে চাকমাদেরকে সরকারীভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে দু'মাসের মধ্যে (অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর, '৯৫) মিজোরাম ত্যাগ করতে হবে। ঐ সময় অতিক্রান্ত হবার পর মিজোরাম সরকার চাকমাদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে বহিস্কারের জন্য একটি ট্রাক্সফোর্স গঠন করে। মিজোরাম সরকার বলেছিলেন কেবল অবৈধদের খুঁজে বের করাই হবে ট্রাক্সফোর্সের কাজ। কিন্তু বাস্তবে ইহা বৈধ চাকমাদের অবৈধ বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করার কাজে লিপ্ত।

সরকারী হয়রানির পাশাপাশি চলছে সরকারী মদদপুষ্ট বেসরকারী গোষ্ঠীগুলোর অমানবিক ও বেআইনী কার্যক্রম। ১৯৯২ সনের আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে চাকমাদের ২৭৮টি বাসগৃহ মিজোরা পুড়িয়ে দেয়। ১৯৯৫ সনের ২ ফেব্রুয়ারী চাকমাদের ঝালপুরস্থ মন্দিরের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে বৌদ্ধমূর্তিকে অপবিত্র করা হয়। এমন কি চাকমা মহিলারা মিজো পুলিশের হাতে একাধিকবার ধর্ষিতা হয়েছিল। অথচ এসব ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের কোন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কিংবা প্রতিকার হয়নি।

সম্প্রতি পূর্ব-ভারতীয় বৌদ্ধ সমিতি আগরতলায় একটি প্রামাণ্য দলিল প্রকাশ করেছে যাতে বলা হয়েছে যে, বিদেশী হটাও অভিযানের অজুহাতে আসলে ভারত সরকার ভারতীয় নাগরিকদেরকেই বাংলাদেশী হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশে ঠেলে দেবার চেষ্ট করছে। তাদের দুর্ভাগ্য যে. চাকমা নামে একটি উপজাতি বাংলাদেশে রয়েছে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশী চাকমারা ভারতের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে ভারতীয় চাকমাদের ওপর পরিচালিত অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার নৈতিক সাহস বাংলাদেশী চাকমাদের নেই। এমনকি ভারতীয় চাকমারা কেমন বিপর্যয়ের সম্মুখীন তা পার্বত্য অঞ্চলের সাধারণ চাকমাদের জানানো হচ্ছে না। বাংলাদেশী চাকমাদের মনে ভারতকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু হিসেবে চিত্রিত করে যে ভাবমূর্তি গড়ে তোলা হয়েছে শান্তিবাহিনী এবং ভারত সরকার তা অক্ষুণ্ন রাখতে চায়। ফলে ভারতীয় চাকমাদের সমস্যা ঢাকা পড়েই আছে।

কোন কোন মহল মনে করেন বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভারত হঠাৎ করে চাকমাদেরকে বাংলাদেশী হিসেবে চিহ্নিত করার এবং তাদেরকে বাংলাদেশে ঠেলে দেবার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। আবার অনেকেই মনে করেন ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি বাতিল করার একটা মহড়া চালানো হচ্ছে চাকমা খেদাও অভিযানের নামে। বাংলাদেশের সাথে বৈরী সম্পর্ক আরো জোরদার ও বহুমুখী করার জন্য ভারত এ জঘন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। কারো কারো মতে ভারতীয় চাকমা যুবকদের শান্তিবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করার জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ভারতে চাকমা-বিরোধী আন্দোলন জোরদার করার মাধ্যমে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। তাদের মতে শান্তিবাহিনী ও জনসংহতি সমিতি ভারতে চাকমা-বিরোধী আন্দোলনের সমর্থক। তারা মনে করে পার্বত্য অঞ্চলে বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারী এবং অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়গুলোর ওপর চাকমাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভারতীয় চাকমাদের বাংলাদেশের ঠেলে দেয়া হচ্ছে। তা হলে তাদের জুম্ম ল্যান্ড আন্দোলন জোরদার হবে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়গুলোকে কোণঠাসা করা যাবে।

চাকমাদের নিয়ে এমন স্ববিরোধী খেলায় লিপ্ত হয়ে ভারত তার আসল চেহারাই প্রকাশ করলো। ভারত যে আদৌ কারো বন্ধু নয় এবং কোন প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সে অভ্যস্থ নয় - এই সত্যিই প্রমাণিত হলো। যে চাকমাদের ভারত বাংলাদেশ ভাঙ্গার কাজে ব্যবহার করছে, সে চাকমাদেরকেই নিজ দেশ হতে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করার নির্মম তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের চাকমাসহ অন্যান্য উপজাতিরা ভারতের আসল চেহারা দেখতে পারছেন কি ? ■

সম্পদ আহরণে বাধা

পার্বত্য চট্টগ্রাম অর্থনৈতিক সম্পদের উজ্জল সম্ভাবনময় অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও ভারত এবং তার গোয়েন্দাচক্র শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীদের সাহায্যে অঘোষিত যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে আর্থিকভাবে লাভবান হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখছে। শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণের সম্ভবনা থাকায় পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ও ব্যবহারে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করছে। এর মূল লক্ষ্য হলো ঃ

১. যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা; ভারতীয় ভূখন্ডের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষতঃ তেল ও গ্যাসের মওজুদ অক্ষুন্ন রাখা। কারণ ভারত মনে করে আসামসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের তেল ক্ষেত্রগুলো শুকিয়ে যেতে পারে যদি বাংলাদেশ সিলেট কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তেল উত্তোলন শুরু করে। সুতরাং যেকোন মূল্যে এবং অজুহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে তেল উত্তোলন বন্ধ রাখা ভারতের স্বার্থে অত্যন্ত জরুরী।
২. পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার করতে সক্ষম হলে বাংলাদেশ আর্থিকভাবে এমন সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে যাতে তাকে ভারতের হাতের মুঠোয় রাখার ভারতীয় চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে ভেস্তে যাবে।

১৯৭৪ সনে বাংলাদেশ তার উপকূলীয় অঞ্চলে খনিজ তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বিদেশী কোম্পানীসমূহকে আমন্ত্রণ জানায়। দু'বছর পর চট্টগ্রামের স্থলভাগে অনুসন্ধান চালানোর জন্যও বিদেশী কোম্পানীকে সুযোগ দেয়া হয়। ১৯৮১ সনে বাংলাদেশ 'শেল ওয়েল'-এর (নবতর) শেল পেট্রোলিয়াম ডেভেলপমেন্ট (ইট) এর সাথে বাংলাদেশ সমঝোতায় পৌছে এবং পরের বছর জুন মাসে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। 'শেল'কে সর্বমোট ৫২৫০ বর্গমাইল এলাকায় অনুসন্ধান চালানোর সুযোগ দেয়া হয় যার মধ্যে মূলতঃ সমুদয় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলই পড়ে। বাংলাদেশ স্বাক্ষর বোনাস হিসেবে ৫০ লাখ ডলার লাভ করে। চুক্তি স্বাক্ষরের ৮ বছরের মধ্যে কোন তেল পাওয়া না গেলে ২৫ বছর মেয়াদী এই চুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবার শর্ত ছিল। শর্তানুযায়ী খনন কাজের সমুদয় ব্যয়ভার শেল কোম্পানী বহন করবে। স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রাপ্ত তেলের ৭৬% থেকে ৮৭.৫% বাংলাদেশ পাবে। দৈনিক তেল উৎপাদনের পরিমাণ ৫ লাখ ব্যারেলের বেশী হলে অংশ ভাগাভাগি নতুন করে নির্ধারিত হবে। খনন কাজ চলাকালে কোম্পানী ১২০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার কথা ছিল।

উৎপাদিত তেলের সিংহভাগ বাংলাদেশকে প্রদান করার শর্ত থাকা সত্ত্বেও শেল কোম্পানীর এত বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ প্রমাণ করে যে পার্বত্য অঞ্চলে খনিজ তেল প্রাপ্তির ব্যাপারে কোম্পানী একেবারে সুনিশ্চিত ছিল।

এ চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং এ বিশাল প্রকল্পের কাজ বন্ধ করার জন্য শান্তিবাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। তদানুযায়ী এতো সম্ভবনাময় সম্পদ আহরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করার উদ্দেশ্যে শান্তিবাহিনী ১৯৮৪ সালের ১৯ জানুয়ারী খনন স্থল হতে ৫ জন কর্মচারীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং কতিপয় দাবী উত্থাপন করে। তারা তাদের দাবী কর্তৃপক্ষের কাছে পৌছানোর জন্য অপহৃত ৫ জনের মধ্যে ২ জনকে মুক্তি দেয়। বাকী ৩ জনের মুক্তির জন্য দু'লাখ পাউন্ড স্টার্লিং মুক্তিপণ হিসেবে দাবী করে, যা বাংলাদেশী ও ভারতীয় মুদ্রায় পরিশোধযোগ্য।

চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনজন কর্মচারীর মুক্তির বিনিময় "শান্তিবাহিনীকে সাড়ে ৮ লাখ দেশীয় মুদ্রা, সাড়ে ৪ হাজার মার্কিন ডলার, ৫ হাজার ৬শত বৃত্রিশ পাউন্ড, ১৯ কেজি স্বর্ণ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি"[৩১] প্রদান করা হয়।

লন্ডন হতে প্রকাশিত 'দ্য গার্ডিয়ান' (৬ মার্চ১৯৮৪) জানিয়েছেন যে, ভারতীয় মুদ্রায় মুক্তিপণ পরিশোধের শর্তারোপ করে শান্তিবাহিনী নিজেই প্রমাণ করল, এই অর্থ কোথায় ব্যয় হবে। গার্ডিয়ানের মতে এই শর্তারোপ বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের এই স্পষ্ট ধারণা দিয়েছে যে, শান্তিবাহিনী সরাসরি ভারতের নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত এবং ভারতের স্বার্থ ও কৌশল রক্ষার উদ্দেশ্যেই অপহরণের মাধ্যমে শেল কোম্পানীকে তেল অনুসন্ধান ও আহরণ হতে সরে যেতে বাধ্য করে। ভারত যে বাংলাদেশকে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলন হতে বঞ্চিত রাখতে চায় শেল কোম্পানীর কার্যক্রম বন্ধ করার পরিস্থিতি সৃষ্টি তা-ই পুনর্বার প্রমাণ করেছে।

শেল কোম্পানী থেকে মুক্তিপণ প্রাপ্তির ফলে শান্তিবাহিনীর মনোবল বেড়ে যায়। তারা নতুন নতুন শর্তারোপ করতে থাকে। তারা শেল কোম্পানীর কাছে এই নিশ্চয়তা চেয়েছিল যে, প্রাপ্ত তেলের অংশ হতে শেল কোম্পানীকে অংশ বিশেষ শান্তিবাহিনীকে দিতে হবে। এ ধরণের শর্তারোপ ও পরিস্থিতিতে শেল কোম্পানী বিব্রতবোধ করে এবং সমুদয় কার্যক্রম পরিত্যক্ত ঘোষণা করে।

এভাবে একটি সম্ভবনাময় খনিজ দ্রব্য ব্যবহারের সুযোগ হতে বাংলাদেশ বঞ্চিত হলো। এর ফলে অন্যান্য বিদেশী কোম্পানীও বাংলাদেশে খনিজ সম্পদ উত্তোলনে নিরুৎসাহিত হয়। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। ■

---

[৩১] চিন্ময় মুৎসুদ্দী ঃ পূর্বোক্তঃ পৃঃ - ৩১

বিচ্ছিন্নতার সড়ক

- বিশেষ মর্যাদার দাবী ও বাস্তবতা
- ৫-দফা কেন গ্রহণযোগ্য নয়

বিশেষ মর্যাদার দাবী ও বাস্তবতা

বিচ্ছিন্নতাবাদীচক্র এবং চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়ের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদীচক্রের শুভানুধ্যায়ী কোন কোন বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের "অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা"[১] "পশ্চাদপদ" সম্প্রদায় হিসেবে উল্লেখ করে বিট্রিশ আমলে প্রবর্তিত "পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধি (ম্যানুয়াল) ১৯০০" পুনর্জ্জীবনের এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে পার্শ্ববর্তীদেশ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উপজাতি অধ্যুষিত রাজ্যসমূহের মতো তথাকথিত শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা দানের দাবী জানাচ্ছেন। ইহা জনসংহতি সমিতিরও অন্যতম প্রধান দাবী।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধি কেন এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়, তা আমি অন্যত্র ব্যাখ্যা করেছি। এখানে পার্শ্ববর্তীদেশ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উপজাতি অধ্যুষিত রাজ্যসমূহের দিকে তাকানো যাক, শাসনতান্ত্রিকভাবে বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত ঐ সব রাজ্যসমূহকে ভারত বাস্তবে কেমন রেখেছে। ভারতের প্রসঙ্গ এখানে আনা হচ্ছে এ কারণেই যে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ভারতেই অবস্থান করছে এবং তারা ভারতে বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত উপজাতীয়দের উদাহরণ প্রায়ই দিয়ে থাকে।

এখানে সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের অবস্থান কোনভাবেই আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মনিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ডের মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছ হতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পররাজ্যে ভারতের অবস্থানের মতো নয়। তাই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতি অধ্যুষিত রাজ্যসমূহে ভারতের মালিকানা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের মালিকানা এক ধরণের নয়। এই কারণেই ভারত ঐসব রাজ্যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের প্রবর্তিত নিয়ম-রীতির ধ্বংসাবশেষ কাগজে-কলমে হলেও বজায় রাখতে ঐতিহাসিক ও নৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় "সাংবিধানিক স্বীকৃতি" এবং "সংরক্ষিত এলাকার" মর্যাদাপ্রাপ্ত ঐ রাজ্যসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামের তুলনায় কয়েক দশক পিছিয়ে আছে।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অবস্থা ও ঘটনাপ্রবাহের ওপর যারা নজর রাখেন, তারা জানেন যে, কাগুজে মর্যাদা ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ঐ সব রাজ্যগুলো শুধুমাত্র যে অউপজাতীয় ভারতীয়দের চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে, তা-ই নয়, তারা নির্মম শাসন, শোষণ, বৈষম্য ও অবহেলার শিকার। বিশিষ্ট অহমিয়া বুদ্ধিজীবি ও

---

[১] দেবাশীষ রায় ঃ পাহাড়ী জনগণ ও বাংলাদেশের সংবিধান ঃ দৈনিক ভোরের কাগজ ঃ ঢাকা ঃ ২ মার্চ ঃ ১৯৯৬।

গবেষক মিঃ অমিয় কুমার দাশ তার "ASSAM'S AGONY" শীর্ষক গ্রন্থে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারতীয় উপনিবেশবাদীদের শোষণক্ষেত্র হিসেবে অভিহিত করেছেন। তার কথা শুনুন ঃ

"In the treatment of this region by the Government of India following colonial characteristics are present: 1. Exploitation of the resources by taking out raw materials from the North-East and developing industries outside the region; 2. Employment of own people of the colonizer as much as possible specially in the key positions in administration, industry, law enforcement, military etc; 3. Neglect in over all development, such as transportation and communication, electricity, education, agriculture, health and social service, etc; 4. Market the products of the colonizer in the colony; 5. Taking the lion's share of the revenue created by the colony; 6. Deprivation of democratic rights such as, mass opinion, freedom of speech, self-determination, right to exist as an ethnic group, non-application of constitutional provisions and non-protection from invasion; and 7. Subjugation through political tactics, deprivation of democratic rights and repressive measures including terrorism by military".[৯]

(ভাবানুবাদঃ এ অঞ্চলে ভারত সরকারের আচরণে নিম্নোক্ত উপনিবেশিক বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়ঃ ১. উত্তর-পূর্বাঞ্চল হতে কাঁচামাল বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং ঐ অঞ্চলের বাহিরে শিল্প-কারখানা স্থাপন করে সম্পদ শোষণ: ২. যতদূর সম্ভব বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বিশেষতঃ প্রশাসনে, শিল্প-কারখানায়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থায়, সেনাবাহিনীতে উপনিবেশিক শক্তির নিজস্ব লোক বসানো: ৩. পরিবহন ও যোগযোগ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য ও সমাজ সেবার মতো উন্নয়ন কার্যক্রমে অবহেলা প্রদর্শন: ৪. উপনিবেশে (অর্থাৎ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে) উপনিবেশিক শক্তির (অর্থাৎ ভারতীয়) পণ্যের বাজারজাতকরণ: ৫. উপবিবেশে সৃষ্ট রাজস্বের সিংহভাগ গল্ধকরণ: ৬. গণতান্ত্রিক অধিকার যেমন মতামত প্রকাশ, বাক স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী হিসেবে টিকে থাকা হতে বঞ্চিতকরণ এবং শাসনতান্ত্রিক নীতিমালা বাস্তবায়নে অনীহা এবং বিদেশী অভিবাসন (অর্থাৎ অউপজাতি ভারতীয়দের আগমন) প্রতিহতকরণে উদাসীন্য প্রদর্শন: এবং ৭. রাজনৈতিক কূটকৌশলের সাহায্যে বশ্যতা প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক অধিকারহরণ এবং সেনাবাহিনী দ্বারা অবদমনমূলক সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা।)

---

[৯] Amaya Kumar Das: Assam's Agony: Guwahati: 1980: PP.221-22.

বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত উত্তর-পূর্ব ভারতরে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের বাস্তব অবস্থার অতি সামান্য চিত্রই এখানে তুলে ধরলাম। শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা না পেয়েও কি পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতীয়দের তুলনায় ভাল অবস্থায় নেই? তারা কি বাস্তবে আরো বেশী মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন না? তারা কি চায় বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে শাসনতান্ত্রিক কাগুজে মর্যাদা দিক, আর বাস্তবে তাদের সাথে প্রভুসুলভ আচরণ করুক? এমন বর্ণচোরা নীতিতে বাংলাদেশীরা এবং বাংলাদেশ সরকার বিশ্বাস করেনা। কারণ আমরা পার্বত্য অঞ্চলে দখলদার কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দখলদার শক্তি নই যে, যেকোন কূটকৌশলে, যেকোন উপায়ে পার্বত্য অঞ্চলে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের মতো পার্বত্য জেলাসমূহকে তথাকথিত 'এক্সক্লুডেড এরিয়া' হিসেবে ঘোষণা করার জন্য জনসংহতি সমিতি যে দাবী উপস্থাপন করছে, তার মূল লক্ষ্য হলো পার্বত্য অঞ্চলে বাঙ্গালীদের জায়গা-জমি ক্রয়, বসতি স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ ও অধিকার নস্যাৎ করা এবং ইতোমধ্যে যেসব বাঙ্গালী সেখানে বসতি স্থাপন করে দীর্ঘকাল যাবত বসবাস করছে তাদেরকে বহিস্কার করা। কিন্তু ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ক্ষুদ্র বাংলাদেশের এক দশমাংশ এলাকা মাত্র .৪৫ শতাংশ অধিবাসীর কাছে ইজারা দেয়া যায় না। বরং এতে ৯৯.৫৫% জনগণের জন্মগত ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার নস্যাৎ করা হয়, যা কোনভাবেই গণতান্ত্রিক বা মানবিক নয়।

উত্তর-পূর্ব ভারতে অউপজাতীয় ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ ও বসতি স্থাপন আইনগতভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু সেখানকার অনেক রাজ্যে অউপজাতীয় ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ এমন ব্যাপকভাবে ঘটেছে যে Excluded এলাকা ঘোষণা এবং অউপজাতীয় ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত বিধি নির্মম উপহাসে পরিণত হয়েছে। অনেক রাজ্যের অর্থনীতি, সরকারী-বেসরকারী চাকরি, এমনকি রাজনৈতিক ক্ষমতা অউপজাতীয়দের হাতে চলে গেছে। আমীয় কুমার দাস জানাচ্ছেন আসাম সরকারের মোট কর্মচারীর ৬০% বহিরাগত। আসাম রেলওয়ের মাত্র ১৪%, ডাক ও তার বিভাগের ১০%, প্রাইভেট শিল্পের ১৫% কর্মচারী অহমিয়া--বাকীরা বহিরাগত। নিখিল আসাম ছাত্র ইউনিয়ন (আশু) প্রদত্ত (১৯৯২ সনের জুলাই মাসে) তথ্যানুযায়ী আসামে অহমিয়া জনগোষ্ঠি মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩১.৭%। সুতরাং বহিরাগতদের অবস্থান ও প্রভাব কত ব্যাপক তা সহজেই অনুমেয়।

এবার দেখা যাক, মনিপুরের অবস্থা কেমন? নিখিল মনিপুর ছাত্র সমন্বয় পরিষদের সাবেক সভাপতি সি.ডব্লিউ. সিং ১৯৮০ সনে বলেছিলেন ঃ

"We want to remove foreigners to save our indentity and culture, otherwise our situation will be the same as that of Cacharis in Cachar, Tripuris in the State of Tripura, and Sikkimese in Sikkim"[৯২]

(ভাবানুবাদ ঃ আমাদের পরিচিতি ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য আমরা বিদেশী (অর্থাৎ অউপজাতীয় ভারতীয়)দের বিতাড়িত করতে চাই। অন্যথায় আমাদের অবস্থা কাছাড়ের কাছাড়ীদের মতো, ত্রিপুরা রাজ্যের টিপরাদের মতো এবং সিকিম রাজ্যের সিকিমীদের মতো হবে।)

'এক্সক্লুডেড এ্যারিয়ার' মর্যাদাপ্রাপ্ত মিজোরামের করুণ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে প্রয়াত লালডেঙ্গার সহযোগী মালসামার প্রতিক্রিয়া ঃ

"If India wanted Mizoram to a part of it, it would have looked after Mizoram as its part. --- There's not even a technical school, not to speak of a College. They refer us backward class or an excluded area."[৯৩]

(ভাবানুবাদ ঃ ভারত যদি মিজোরামকে তার অংশ হিসেবে দেখত, তবে মিজোরামকে ভারতের এলাকা হিসাবেই দেখত। .... কলেজ কথা তো দূরের কথা, এখানে একটি কারিগরি বিদ্যালয় পর্যন্ত নেই। তারা আমাদের পশ্চাদপদ শ্রেণী কিংবা বিচ্ছিন্ন এলাকা বলে মনে করে।)

১৯৪৮ সনে জওহর লাল নেহেরু মেঘালয়কে কাশ্মীরের মতো শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা দেবেন, এমন প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভারতভুক্ত করেছিলেন। বর্তমান মেঘালয়ের অবস্থা অত্যন্ত করুণ।

মেঘালয়ের শহরাঞ্চলের সব চাকরি ঃ ডাক ও তার বিভাগ, এজি অফিস, রেলওয়ে, ব্যাংক প্রভৃতি বহিরাগতদের দখলে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কড়া নির্দেশ রয়েছে যে, মেঘালয়স্থ কেন্দ্রীয় সরকারের ৪৫% চাকরি মেঘালয়ীদের দিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এ চাকরির দশ শতাংশও মেঘালয়ীরা পায়না।

ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তিবাহিনীর প্রধান ঘাঁটি। সেখানকার অবস্থা কেমন? ১৯৪৭ সনে ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯৩ জন ছিল উপজাতীয়

---

[৯২] Neerja Chowdhury : The North In Turmoil : Special Suppliment of Himmat : Bombay : 1980 : P.21.

[৯৩] Neerija Chowdhury : Ibid. P.31.

জনগোষ্ঠী। ১৯৮০ সনে উপজাতীয়দের আনুপাতিক হার ২৮.৫ শতাংশে নেমে আসে। রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় ঐ বছর ১,১০,০০০ অধিবাসীদের মধ্যে মাত্র ৪,৮৮৫ জন ছিল উপজাতি।[*] গত ১৭ বছরে আরো অনুপ্রবেশ ঘটায় বর্তমানে সারা রাজ্যে উপজাতীয়দের শতকরা হার ২০ এর নীচে নেমে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সুতরাং ভারতীয় উপজাতিদের শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি কিংবা মর্যাদা বাস্তবক্ষেত্রে তাদের জন্য কোন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারেনি। শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ কিংবা 'এক্সক্লুডেড এ্যারিয়ার' কথা কেবল শাসনতন্ত্রের কাগজের কারাগারে বন্দীই রয়েছে বাস্তব প্রয়োগ নেই। জনসংহতি সমিতি ও তার সহযোগী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ভারতীয় উপজাতিদের প্রদত্ত কাগুজে স্বীকৃতি, বিশেষ মর্যাদা এবং এক্সক্লুডেড এ্যারিয়া'র কথা বলে তা পাবার জন্য বাংলাদেশী উপজাতিদের ক্ষেপিয়ে তুলছে, কিন্তু ভারতীয় উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের সমস্যা, তাদের করুণ অবস্থা, শাসনতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হবার কাহিনী কিছুই বলছে না। যদি পার্বত্য অঞ্চলের সাধারণ উপজাতীয়রা উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতীয়দের দুর্দশার খুঁটিনাটি জানতে সক্ষম হন, তাহলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিশেষ এলাকার দাবী একেবারে ভেস্তে যাবে। তাই এসব বিষয়ে কখনোই তারা মুখ খোলেনা, বরং এ মিথ্যেকেই সত্যি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট যে এক্সক্লুডেড এলাকার মর্যাদা এবং শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি না পেয়ে পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়গুলো অসুবিধায় আছে।

এ প্রসঙ্গে আরো স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, ভারত উপজাতিদের স্বীকৃতি দিচ্ছে উপজাতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য নয়, তাদেরকে বিচ্ছিন্ন-বিভক্ত করে তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে দুর্বল করে ভারতের পুনঃ বিভক্তি রোধ করার জন্য। আসাম রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত করে নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, অরুনাচল প্রদেশ প্রভৃতি সৃষ্টি করার মূল লক্ষ্যই ছিল "বিভক্ত কর এবং শাসন কর" নীতির বাস্তবায়ন। উপজাতীয়দের জন্য নতুন নতুন রাজ্য, আবার রাজ্যের ভেতর স্বশাসিত আঞ্চলিক কিংবা জেলা পরিষদ গঠন করেই ভারত ক্ষ্যান্ত হয়নি, একই রাজ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব-সংঘাত জিইয়ে রাখার নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে যাতে তারা ভারতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে না পারে। ভারতের উপজাতীয় অঞ্চলে নতুন নতুন রাজ্য সৃষ্টির দাবী জনগণকে করতে হয়না, ভারতীয় নীতিনির্ধারক এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোই তাদের চরদের মাধ্যমে এই দাবী উপস্থাপন করায়। আসামের অহমিয়া-বদো, মিজোরামের মিজো-চাকমা, অরুনাচল প্রদেশে অরুনাচলী-চাকমা,

---

[*] VIK SARIN : India's North East In Flames : New Delhi : 1980 : P.177.

মেঘালয়ে খাসিয়া-গারো, নাগাল্যান্ডে নাগা-কুকি, মনিপুরে মনিপুরী-নাগা প্রভৃতি উপজাতিদের দ্বন্দ্ব ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ পরিকল্পিত উপায়ে লাগিয়ে রেখেছে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ কিভাবে বিভিন্ন রাজ্যের উপজাতিদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নস্যাৎ করার কাজে ব্যবহার করছে, তার সঠিক ও বাস্তব তথ্য প্রদান করছেন ভারতেরই প্রখ্যাত সাপ্তাহিকী 'The illustrated weekly of India' (১৪ অক্টোবরঃ ১৯৯০ ইং দ্রঃ)। পত্রিকাটির ঐ সংখ্যায় বলা হয়েছে ঃ

"ত্রিপুরা জাতীয় স্বেচ্ছাসেবীরা 'র' পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে 'র' আশীর্বাদপুষ্ট অন্য সংগঠন হলো মনিপুর গণমিলিশিয়া। নিখিল আসাম ছাত্র ইউনিয়ন (আশু)-এ ভাঙ্গন ধরানোর জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা পৃথক বদো ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে। এর তাৎক্ষনিক লক্ষ্য ছিল আশু'র ভারত বিরোধী আন্দোলন দুর্বল করে ছাত্রদের বিভক্ত করা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পৃথক বদোল্যান্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবীতে জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলা যাতে আসামে উলফাসহ অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনসমূহের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রাম সফল না হয়। বদো ছাত্ররা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সাথে সাক্ষাত কিংবা আলাপ করার জন্য দিল্লীতে আসলে 'র' এবং আই বি'র অথিতিশালায় ওঠে।"

এতক্ষণে আশা করি বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্র এবং তাদের শুভানুধ্যায়ীদের বোধোদয় হয়ে থাকবে কেন ভারতীয় উপজাতীয়দের জন্য এতগুলি রাজ্য, স্বায়ত্বশাসিত আঞ্চলিক বা জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে এবং সে প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। তারা কি বুঝাতে পারছেন না যে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তথা সরকার মিজোরামের খোদ চাকমাদের নিয়ে কেমন নির্মম খেলায় লিপ্ত রয়েছে। ১৯৭১ সনে মিজোরামী চাকমাদের স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত পৃথক স্বশাসিত জেলা পরিষদ চাকমাদের জানমালের নিরাপত্তা এবং কল্যাণ যে নিশ্চিত করতে পারেনি তা আমি অন্যত্র উল্লেখ করেছি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্ত্রাসীচক্রের বোধোদয়ের স্বার্থে এবং তারা তাদের অপপ্রচারের মাধ্যমে যাতে সাধারণ উপজাতীয়দের বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করতে না পারে সেজন্যই আমি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়সমূহের প্রকৃত অবস্থার উপর কিঞ্চিত আলোকপাত করলাম, যেহেতু তারা বার -বার ভারতীয় সংবিধানে উপজাতিদের প্রদত্ত বিশেষ মর্যদা ও স্বীকৃতির প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে থাকে। ■

৫-দফা কেন গ্রহণযোগ্য নয়

জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার বর্তমান কাঠামো অটুট রেখে তিনটি জেলার সমন্বয়ে এক ইউনিট গঠন করে একটি স্বায়ত্বশাসিত আঞ্চলিক পরিষদের হাতে কথিত ইউনিটের কর্তৃত্ব হস্তান্তর করার দাবী-সম্বলিত ৫-দফা দাবীর অধীনে মোট ৪৭টি দাবী উত্থাপন করেছে, যেগুলো সরাসরি বিচ্ছিন্নতাবাদপ্রসূত। এই ৫টি বা ৪৭টি দাবী-উপদাবী উত্থাপন না করে সরাসরি স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করলে অন্তত জনসংহতি ঃ সমিতির অকপটতা, নৈতিক স্বচ্ছতা ও সততার প্রমাণ পাওয়া যেত।

১৯৮৭ সনের ১৭ ডিসেম্বর জনসংহতি সমিতি আনুষ্ঠানিক ভাবে ৫-দফা দাবী সরকারের নিকট উত্থাপন করে। পরে ১৯৯২ সনের ২৬ ডিসেম্বর সামান্য সংশোধিত আকারে একই ধরণের দাবী পেশ করা হয়। পূর্বেকার দাবী হতে 'প্রাদেশিক' শব্দটির পরিবর্তে 'আঞ্চলিক' শব্দটি এসেছে, এবং তিনটি পার্বত্য জেলার অস্তিত্ব মেনে নিয়ে অন্যসব কিছু মূলতঃ বহাল রাখা হয়েছে। অর্থাৎ দাবীগুলোর বিচ্ছিন্নতাবাদী বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি অক্ষুণ্ন রয়েছে।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম কোনভাবেই বঞ্চিত বা শোষিত নয় এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন তো দূরের কথা, এ ধরণের দাবী উত্থাপনের এবং সেগুলো আদায়ের জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করার নৈতিক কারণ কিংবা যুক্তি পর্যন্ত নেই। এ ধরণের অবাস্তব ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দাবী কোন বিবেকবান মানুষের সহানুভূতি পাবেনা বলেই জনসংহতি সমিতি সরাসরি সশস্ত্রযুদ্ধে নেমেছে এবং এসব দাবী উত্থাপনের কমপক্ষে ১৪ বছর আগ হতে শান্তিবাহিনী (১৯৭৩) গঠন করে, বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা শুরু করে। পরবর্তীকালে বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্রান্তকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য ৫-দফা দাবী উত্থাপিত হয়। দাবীগুলোর প্রতি নজর দিলেই এর বিচ্ছিন্নতাবাদী কুৎসিত দিকগুলো ভেসে ওঠে। প্রথমেই দাবীগুলো দেখুন ঃ

প্রথম দফা দাবী ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করিয়া ঃ

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করা। (খ) আঞ্চলিক পরিষদ (Regional Council) সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা। (গ) এই আঞ্চলিক পরিষদ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইবে এবং ইহার একটি কার্যনির্বাহী

কাউন্সিল থাকিবে। (ঘ) আঞ্চলিক পরিষদে অর্পিত বিষয়াদির উপর এই পরিষদ সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে বিধি, প্রবিধান, উপবিধি, উপআইন, আদেশ, নোটিশ প্রণয়ন, জারী ও কার্যকর করিবার ক্ষমতার অধিকারী হইবে। (ঙ) পরিষদের তহবিল ও সম্ভাব্য আয়ের সাথে সংগতি রাখিয়া স্বাধীনভাবে বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবার ক্ষমতা এই পরিষদের হাতে থাকিবে। (চ) আঞ্চলিক পরিষদ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হইবে ঃ

(১) পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন ও আইন শৃংখলা। (২) জেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় প্রশাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ। (৩) পুলিশ। (৪) ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। (৫) কৃষি ও কৃষি উদ্যান উন্নয়ন। (৬) কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা। (৭) বন, বন সম্পদ সংরক্ষন ও উন্নয়ন। (৮) গণস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা। (৯) আইন ও বিচার। (১০) পশুপালন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ। (১১) ভূমি ক্রয়, বিক্রয় ও বন্দোবস্ত। (১২) ব্যবসা-বাণিজ্য। (১৩) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। (১৪) রাস্তা-ঘাট ও যাতায়াত ব্যবস্থা। (১৫) পর্যটন। (১৬) মৎস্য, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ। (১৭) যোগাযোগ ও পরিবহণ। (১৮) ভূমি রাজস্ব, আবগারী শুল্ক ও অন্যান্য কর ধার্যকরণ। (১৯) পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ। (২০) হাটবাজার ও মেলা। (২১) সমবায়। (২২) সমাজ কল্যাণ। (২৩) অর্থ। (২৪) সংস্কৃতি, তথ্য ও পরিসংখ্যান। (২৫) যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া (২৬) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা। (২৭) মহাজনী কারবার ও ব্যবসা। (২৮) সরাইখানা, ডাকবাংলা, বিশ্রামাগার, খেলার মাঠ ইত্যাদি। (২৯) মদ চোলাই, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও সরবরাহ। (৩০) গোরস্থান ও শশ্মান। (৩১) দাতব্য প্রতিষ্ঠান, আশ্রম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনাগার। (৩২) জলসম্পদ ও সেচব্যবস্থা। (৩৩) জুম চাষ ও জুম চাষীদের (জুমিয়া) পুনর্বাসন। (৩৪) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। (৩৫) কারাগার। (৩৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২। (ক) চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরুং, বোম, লুসাই, পাংখো, খুমি, খিয়াং ও চাক এই ভিন্ন ভাষাভাষী দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির সংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

(খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ শাসন বিধি অনুযায়ী শাসিত হইবে। সংবিধানে এই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

(গ) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে আসিয়া যেন কেহ বসতি স্থাপন, জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত করিতে না পারে সংবিধানে সেই রকম সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

(ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এই রকম কোন ব্যক্তি পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে যাহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করিতে না পারে সেই রকম আইন বিধি (Inner Line Regulation) প্রণয়ন করা। তবে শর্ত থাকে যে কর্তব্যরত সরকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে না।

(ঙ) (১) গণভোটের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাই ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন (Amendment) যেন না করা হয় সংবিধানে সেই রকম সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

(২) আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া যাহাতে কোন আইন অথবা বিধি প্রণীত না হয় সংবিধানের সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

(চ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের লইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করা। তদুদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন করা।

(ছ) যুদ্ধ বা বহিঃআক্রমণ ব্যতীত আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বা উহার যেকোন অংশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন হইলেও আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা না হয় সংবিধানের সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি প্রণয়ন করা।

(জ) পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তিকে যেন নিয়োগ করা না হয় সেই রকম আইন বিধি প্রণয়ন করা। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে উক্ত পদে নিয়োগ করা।

দ্বিতীয় দফা দাবী

২। ১) ক) রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিনটি জেলা বলবৎ রাখিয়া একত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিটে পরিণত করা।

(খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'জুম্মল্যান্ড' (Jummaland) নামে পরিচিত করা।

২) পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় স্থাপন করা।

৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের জন্য একটি বিশেষ বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৪) পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আসনসমূহ জুম্ম জনগণের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার বিধান করা।

৫) ক) কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা (Power Project Centre Area), বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্পকারখানা এলাকা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণীর জমি পাহাড় ও কাপ্তাই হ্রদ এলাকা এবং সংরক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চলসহ অন্যান্য সকল বনাঞ্চল পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।

খ) কাপ্তাই জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা (Power Project Centre Area) বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্পকারখানা এলাকা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমির সীমানা সুনির্দিষ্ট করা।

গ) পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি ও পাহাড় পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর না করিবার প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন ব্যক্তির দ্বারা বেদখলকৃত ও অন্য কোন উপায়ে বন্দোবস্তকৃত বা ক্রীত বা হস্তান্তরকৃত সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ত্ব বাতিল করা এবং এ সমস্ত জমি ও পাহাড় প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা।

(৬) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তির নিকট বা কোন সংস্থাকে যে সমস্ত জমি বা পাহাড় রাবার চাষ, বনায়ন অথবা অন্য

কোন উদ্দেশ্যে 'লীজ' (Lease) বা বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে সেই সমস্ত জমির লীজ ও বন্দোবস্ত বাতিল করা এবং ঐ সমস্ত জমি ও পাহাড় পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।

(চ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত সকল এলাকা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।

তৃতীয় দফা দাবী ঃ

৩। ১) ১৭ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল হইতে যাহারা বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া পাহাড় কিংবা ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত ও বেদখল করিয়া অথবা কোন প্রকারের জমি বা পাহাড় ক্রয় বন্দোবস্ত ও বেদখল ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছগ্রামে বসবাস করিতেছে সেই সকল বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া।

২) ১৯৬০ সালের পর হইতে যে সকল জুম্ম নর-নারী ভারতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের সকলের সম্মানজনক প্রত্যাবর্তন ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩) কাপ্তাই বাঁধের সর্ব্বোচ্চ জলসীমা নির্ধারণ করা এবং কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৪। (ক) সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বি ডি আর) ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনানিবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া।

(খ) বহিঃশত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধ বা জরুরী অবস্থা ঘোষণা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন সেনাবাহিনীর সমাবেশ না করা ও সেনানিবাস স্থাপন না করা।

চতুর্থ দফা দাবী ঃ

৪। (১) (ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

(খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কোন সদস্যদের বিরুদ্ধে যদি কোন প্রকারের মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট, হুলিয়া থাকে অথবা কাহারও অনুপস্থিতিতে যদি কোন বিচার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে বিনাশর্তে সেই

সব মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া প্রত্যাহার ও উক্ত বিচারের রায় বাতিল করা এবং কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপে জড়িত করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে যদি কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকারের মামলা অভিযোগ ও ওয়ারেন্ট থাকে অথবা কাহারও অনুপস্থিতিতে কোন প্রকার বিচার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে বিনা শর্তে সেই সব মামলা, অভিযোগ ও ওয়ারেন্ট প্রত্যাহার ও বিচারের রায় বাতিল করা এবং কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকারের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

(২) (ক) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে জুম্ম জনগণের জন্য নির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষণ করা।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ক্যাডেট কলেজ, কারিগরি ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা।

(গ) সরকারী চাকুরীতে জুম্ম জনগণের জন্য বয়ঃসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা।

(৩) (ক) সরকারী অনুদানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

(খ) ভূমিহীন ও জুম চাষীদের (জুমিয়া) পূনর্বাসনসহ কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি খাতে বিশেষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও তজ্জন্য সরকার কর্তৃক্ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি পূর্ণাংগ বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা।

(৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বহাল রাখা এবং উহা পরিষদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা।

পঞ্চম দফা দাবী ঃ

৫। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তোলা একান্ত অপরিহার্য। তৎপরিপ্রেক্ষিতে ঃ

(১) সাজাপ্রাপ্ত না বিচারধীন বা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর হেফাজতে আটককৃত সকল জুম্ম নর-নারীকে বিনা শর্তে অনতিবিলম্বে মুক্তি প্রদান করা।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনকে অনতিবিলম্বে বেসামরিকীকরণ করা।

(৩) জুম্ম জনগণকে গুচ্ছগ্রাম, বড়গ্রাম, শান্তিগ্রাম, আদর্শ গ্রামের নামে গ্রুপিং করিবার কার্যক্রম বন্ধ করা এবং এই গ্রামসমূহ অনতিবিলম্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া।

(৪) বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল হইতে আসিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ, বসতি স্থাপন, পাহাড় ও ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত, হস্তান্তর ও বেদখল বন্ধ করা।

(৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছগ্রামে বসবাসরত বহিরাগতদেরকে পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অনতিবিলম্বে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া।

(৬) সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিডিআর) ক্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনীর সেনানিবাস ও ক্যাম্পসমূহ পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া।

কতিপয় মারাত্মক ক্ষতিকারক দিক ঃ

জনসংহতি সমিতির প্রতিটি দাবী এবং উপদাবী এক কথায় দেশবিরোধী বলে অগ্রহণযোগ্য। এসব দাবীর অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। এসব দাবী মেনে নিয়ে সরাসরি পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিলেও এর মারাত্মক কুফল থেকে বাংলাদেশের বাকী অংশ রেহাই পাবে না। এসব দাবীর সাথে এমন কতিপয় বিষয় জড়িত যা মেনে নিলে সারা দেশের বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে তো বটেই, বরং জনগণ ও সরকারের সাথে তীব্র দ্বন্ধ ও গৃহযুদ্ধের সূচনা করতে পারে। প্রতিটি দাবীই আক্রমণাত্মক এবং বিশেষ চক্রান্ত প্রসূত, যা বাংলাদেশের সুদূরপ্রসারী স্বার্থ ও অস্তিত্ববিরোধী।

এসব দাবীর কয়েকটি ক্ষতিকারক ও অগ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকানো যাক ঃ

আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন ঃ

বাংলাদেশ সাংবিধানিকভাবে এককেন্দ্রীক রাষ্ট্র। এখানে পৃথক প্রদেশ, রাজ্য, স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল নেই। প্রজাতন্ত্রের সম্পূর্ণ ভূ-খন্ডই একই সরকার, শাসনব্যবস্থা, আইন, বিচার পদ্ধতির আওতাভুক্ত। বাংলাদেশের মতো একটি ক্ষুদ্র

ও দরিদ্র দেশে এর বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কথা মনে রেখে সংবিধানের রচয়িতারা প্রজাতন্ত্রের আঞ্চলিক অখন্ডতা তথা অস্তিত্বকে বিচ্ছিন্নতার হাত হতে চিরন্তনভাবে বিপদমুক্ত রাখার জন্য একে স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল বা রাজ্যবিহীন এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র রূপে ঘোষণা দিয়েছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্বশাসন দিতে হলে প্রথমে শাসনতন্ত্র সংশোধন করতে হবে। শাসনতন্ত্র অবশ্যই সংশোধনযোগ্য। কিন্তু শাসনতন্ত্র সংশোধন করার আগে ভেবে দেখতে হবে ঐ সংশোধনী দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখন্ডতা ও অস্তিত্বের ওপর কোন প্রতিকূল প্রভাব ফেলে কিনা। আমাদের সংবিধানে এমন শর্ত রয়েছে যে, দেশের স্বার্থ ও অস্তিত্ব বিরোধী কোন আইন বা সংশোধনীই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবেনা।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের মর্যাদা দেয়া হলে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হতেও একই ধরণের দাবী উত্থাপিত হবে এবং সে দাবী অগ্রাহ্য করার মতো সঙ্গত ও নৈতিক যুক্তি সরকারের থাকবে না। বৃহত্তর বরিশাল জেলাকে বিভাগে উন্নীত করার সাথে সাথে সিলেট বিভাগ প্রতিষ্ঠার দাবী জোরদার হয় এবং সরকার সিলেটকে বিভাগে পরিণত করতে বাধ্য হন। এর পরেই কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, ফরিদপুর, রংপুর, বগুড়া প্রভৃতি সাবেক বৃহত্তর জেলাসমূহ হতেও বিভাগ প্রতিষ্ঠার দাবী উঠতে থাকে।

সুতরাং যে মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জিলার সমন্বয়ে একটি ইউনিট গঠন করে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা হবে, সাথে সাথে অন্য ১৮টি সাবেক জেলা হতেও একই ধরণের দাবী উঠবেই। ফলে বাংলাদেশ ১৯টি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং জনসংহতি সমিতির দাবীকৃত ৫-দফা অনুযায়ী ক্ষমতা প্রদান করা হলে বাংলাদেশ বলতে আর কোন কিছুর অস্তিত্বই থাকবে না।

ধরে নিলাম যে ঐ ১৯টি স্বায়ত্বশাসিত ইউনিট বা অঞ্চলই তথাকথিত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আন্তরিকভাবে অনুগত থাকবে। কিন্তু তারপরেও দরিদ্র বাংলাদেশের পক্ষে তারেদরকে ধরে রাখা সম্ভব হবেনা। কারন কোন আঞ্চলই একাকী স্বয়ং সম্পূর্ণ হবেনা। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সবাইকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হাত পাততে হবে। কিন্তু যেসব ক্ষমতার নিরিখে স্বায়ত্বশাসন চাওয়া হচ্ছে, তাতে কেন্দ্র দেউলিয়া হয়ে যাবে এবং তার অস্তিত্বের জন্য আঞ্চলিক সরকার বা পরিষদের ওপর নির্ভর করতে হবে। জনসংহিত সমিতি আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের রূপরেখায় বলেছে যে তার কল্পিত পরিষদে ৪৮ জন সদস্য, একটি কার্যনির্বাহী কাউন্সিল (যার সদস্য সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ১২), ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন করে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ থাকবে। এদের সবার এবং পরিষদের প্রশাসনিক ও অন্যান্য

কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন, ভাতা, বোনাস, পেনশন, বাসস্থান, গাড়ীসহ বিভিন্ন ধরণের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্যও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হবে। সারা বাংলাদেশে যদি কেবলমাত্র গোটা ছয়েক এ ধরণের পরিষদের নেতৃত্বে স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল সৃষ্টি করা হয়, তবে দেশের অন্যান্য সব কাজ বাদ দিয়ে এসব পরিষদ ও অঞ্চলের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে পোষণ করতে সমুদয় অর্থ ব্যয় করতে হবে। এ ধরণের অনুৎপাদক খাতে অর্থব্যয়ের সুযোগ বাংলাদেশের নেই।

সেনাবাহিনী/সেনানিবাস প্রত্যাহার ঃ

বিডিআর ব্যতীত সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য, শিবির, সেনানিবাস পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে তুলে নেবার দাবী অযৌক্তিক। এ ধরণের দাবী প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌম ক্ষমতার পরিপন্থী। প্রজাতন্ত্র দেশের যেকোন অঞ্চলে যেকোন সময় সামরিক বাহিনী নিয়োগ এবং সামরিক ছাউনি, শিবির নির্মাণসহ যেকোন ধরণের স্থায়ী-অস্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করতে পারে। বাংলাদেশের যেসব অঞ্চল সম্পূর্ণ শান্ত সেসব স্থানে থেকে সেনানিবাস, সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনী প্রত্যাহারের দাবী উঠছেনা। অথচ দাবী উঠছে বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধ-কবলিত অঞ্চল হতে। সুতরাং এ দাবী সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও চক্রান্তপ্রসূত। সেনাবাহিনী শান্তিপ্রিয় জনগণের জন্য হুমকি নয়, বরং বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীদেরই পরম শত্রু। দেশের অখন্ডতার প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী যেকোন চক্রান্ত নির্মূল করা সেনাবাহিনীর পবিত্র দায়িত্ব। বিচ্ছিন্নতাবাদ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত সেনাবাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকতেই হবে। এমনকি শান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর সরব উপস্থিতি অপরিহার্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী নিয়োগ করার পরিবেশ শান্তিবাহিনীই সৃষ্টি করেছে। সুতরাং সেনাবাহিনীর উপস্থিতিকে নুন্যতম পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হলে শান্তিবাহিনীকেই অগ্রণী হতে হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র তৎপরতা অব্যাহত রেখে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবী অবান্তর। কোন দেশপ্রেমিক ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতাবাদী দেশদ্রোহীদের এ ধরণের অন্যায় দাবী মেনে নিতে পারে না। আমাদের জাতীয় সেনাবাহিনী কোথায় থাকবে, কিভাবে থাকবে সেটা নির্ধারিত হবে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার আলোকে।

তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সৈন্য প্রত্যাহার করা হলে অন্যান্য স্থান হতেও সৈন্য ও সেনানিবাস প্রত্যাহারের দাবী উঠতে পারে। সেনাবাহিনী আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক, পতাকা রক্ষাকারী। তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা মানে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক

অখন্ডতাকে অস্বীকার করা। শান্তিবাহিনী যেহেতু দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতায় বিশ্বাস করেনা, তাই তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার চায়। শান্তিবাহিনী যদি সশস্ত্র সন্ত্রাস বন্ধ করে, তবে সেনাবাহিনী কারোরই মাথাব্যথার কারণ হতে পারেনা। তাছাড়া জনসংহতি ও শান্তিবাহিনী যদি সশস্ত্র সন্ত্রাস ছেড়ে সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে, তথাপি কেহ এ গ্যারান্টি দিতে পারবেনা যে, নতুন সন্ত্রাসী গ্রুপ বা দল সেখানে সৃষ্টি হবেনা। যেকোন সময়, যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর সরব উপস্থিতি অপরিহার্য।

বাঙ্গালী বসতি উচ্ছেদ ঃ

১৯৪৭ সনের ১৪ আগষ্ট কিংবা ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বরের পর হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিস্থাপনকারী বাঙ্গালীদের উচ্ছেদের দাবী কেবল সংবিধান বিরোধীই নয়, বাংলাদেশী যে কোন নাগরিকের জন্মগত ও নাগরিক অধিকারের পরিপন্থী। বিশ্বের কোন দেশই তার নাগরিকের ইচ্ছাধীন শহরে, গ্রামে, বা জেলায় জমি কেনার, বংশানুক্রমে ভোগ করার, ঘর-বাড়ী দোকান-পাট নির্মাণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেনা। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই বাংলাদেশের এক জেলা বা অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, পেশাগত সুবিধা-অসুবিধার প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও অন্যান্য জেলা বা অঞ্চলে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করছে কিংবা চাকরি করছে। নোয়াখালী জেলার বহু লোক যশোর, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, রংপুর কিংবা সিলেটে বসবাস করছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতি জেলা হতে লোকজন এসে ঢাকায়, চট্টগ্রামে, খুলনায় জড়ো হয়েছে।

সংবিধানের ৩৬নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধে চলাফেরা, ইহার যেকোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন ... করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।"

সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালীদের সম্পত্তি ক্রয় ও বসবাস সম্পূর্ণরূপে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। এ অধিকার হতে তাদের বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই।

জনসংহতি সমিতির দাবী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বাঙ্গালীদের বহিস্কার করা হলে অন্যান্য জেলায় নব্য বসতি স্থাপনকারীদের বিতাড়িত করার জন্য পুরানো বাসিন্দারাও দাবী তুলতে পারে। ফলে সারা দেশে এমন অরাজক ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, যা দেশের অস্তিত্বকেই অসম্ভব করে তুলবে।

সর্বোপরি, দেশের এক-দশমাংশ ভূমি মাত্র .৪৫% উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত রাখা বাংলাদেশের মতো জনাকীর্ণ দরিদ্র দেশের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা যদি দেশের সমতলে গিয়ে চাকরি-বাকরি, অধ্যয়ন কিংবা বসবাস করতে পারে এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সম্পদের অংশীদার হতে পারে, তবে সমতলে বাঙ্গালীরা কেন পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়ে একই ধরণের অধিকার ও সুযোগ ভোগ করতে পারবে না।

গুটিকয়েক বিদেশী চরের দাবী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বাঙ্গালীদের উচ্ছেদ করার আত্মঘাতী পদক্ষেপ নেয়া হলে ১২ কোটি বাঙ্গালী এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখাবে যা খোদ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের জন্য সুদূর প্রসারী ক্ষতির কারণ হতে পারে। উপজাতীয়দের কেউই বাংলাদেশের ভূমিজ সন্তান নয়, বরং বহিরাগত। বিশ্বে এমন বহুদেশ আছে যেখান থেকে কয়েক শতাব্দী যাবত বসবাসকারী বহিরাগতদের বহিস্কার করা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা হতে ভারতীয় এবং উগান্ডা হতে এশীয়দের বিতাড়িত হবার ঘটনা সবারই জানা থাকার কথা। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এসব ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের সাথে মিলেমিশে মানিয়ে চলাই হবে চাকমাসহ অন্য সব উপজাতীয়দের জন্য দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কাজ।

এখানে আরো মনে রাখতে হবে জনসংহতি সমিতি কিংবা শান্তিবাহিনীর অবৈধ দাবীর প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমুদয় উপজাতীয় জনগণের সমর্থন নেই। বাস্তব অর্থে চাকমা সম্প্রদায়ের অতি সামান্য অংশই তাদের সমর্থক। এ অবস্থায় যদি শান্তিবাহিনীর অত্যাচার প্রতিহত করণার্থে সারা দেশের নয়, কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙ্গালীরাও যদি শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তবে কোন প্রভুই সন্ত্রাসীদের রক্ষা করতে পারবে না। এ ধরণের প্রতিরোধ শান্তিবাহিনী এবং তাদের সমর্থকদের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে।

ভূমির অধিকার ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের "কোন প্রকারের জমি ও পাহাড় পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর না করার প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা" গ্রহণের দাবী পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌম কর্তৃত্বকে সরাসরি অস্বীকার করার শামিল। এ দাবীর মাধ্যমে ভূমির ওপর বাংলাদেশ সরকারের পরিবর্তে তথাকথিত আঞ্চলিক সরকারের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ভূমির ওপর পূর্ণাঙ্গ কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়নি। ভূমির ওপর বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃত্ব

রহিত হলে অঞ্চলটির কোন ব্যাপারেই কথা বলার বা পদক্ষেপ গ্রহণের নৈতিক অধিকার বাংলাদেশ সরকারের থাকবে না।

জুম্মল্যান্ড নামকরণ ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করে 'জুম্মল্যান্ড' নামকরণের দাবী বাংলাদেশের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ও অচ্ছেদ্যতা নস্যাৎ করার চক্রান্ত বিশেষ। ১৮৬০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম চট্টগ্রামের অংশ ছিল। এবং চট্টগ্রাম অতি প্রাচীন কাল হতে 'হরিকেল' জনপদ নামে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সুতরাং জুম্মল্যান্ড নামকরণ করা হলে ঐ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ছেদ টেনে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালীদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে একে কেবল উপজাতীয় তথা চাকমাদের আবাসভূমিতে পরিণত করা হবে। এখানে আরো বলতে হচ্ছে যে, জুম্মল্যান্ড নামকরণের মাধ্যমে চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে একান্তভাবেই তাদের (চাকমাদের) প্রভাবিত স্থান হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করার কূটকৌশল অবলম্বন করেছে। "জুম্ম" শব্দটি চাকমা উপজাতি সত্ত্বার পরিভাষা। 'জুম্ম' বলতে যে চাকমাদেরকেই বুঝানো হয় তার প্রতি ইঙ্গিত করে বিরাজ মোহন দেওয়ান জানানঃ "চট্টগ্রামের লোকেরা চাকমাদের জুমিয়া বা জুম্মুয়া বলে ডাকিয়া থাকেন। জুমিয়া অর্থ যাহারা জুম চাষ করে। মগ ত্রিপুরারাও জুম চাষ করে। কাজেই ইহার ব্যাপক অর্থের পরিবর্তে কেবল চাকমাকেই অর্থ করা হইয়াছে।"[৯৫] সুতরাং 'জুম্মল্যান্ড' নামকরণের দাবী কেবল বাঙ্গালী ও বাংলাদেশ বিরোধীই নয়, বরং চাকমা ছাড়া অন্যান্য ১২টি উপজাতির অস্তিত্ব এবং স্বার্থের পরিপন্থী।

ভারতীয় চাকমাদের ফেরত আনা ঃ

১৯৬০ সনের পর হতে যেসব উপজাতীয় নর-নারী ভারতে চলে গেছে তাদের ফেরত আনার দাবী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ষাটের দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাইয়ে পানিবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে উঠলে ৪০ হাজার উপজাতীয় ভারতে চলে যায়[৯৬]। অন্য ২০ হাজার চলে যায় মায়ানমারে। উভয়দলই যথাক্রমে ভারত ও মায়ানমারে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে।

কিন্তু জনসংহতি সমিতি এখন ভারতে গমনকারী উপজাতীয়দের "সম্মানজনক প্রত্যাবর্তন ও সুষ্ঠ পুনর্বাসন" দাবী করছে। অথচ মায়ানমারে

---

[৯৫] বিরাজ মোহন দেওয়ান ঃ পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ৩৮.

[৯৬] দেবযানী দত্ত বসুরায়, চৌধুরী ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম-সীমান্তের রাজনীতি ও সংগ্রামঃ ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপঃ সাউথ এশিয়া ফোরাম কর হিউম্যান রাইট কলিকাতাঃ ১৯৯৬ পৃঃ ১৭.

গমনকারীদের ব্যাপারে কোন বক্তব্য নেই। ভারতে গমনকারী উপজাতীয়রা প্রধানতঃ চাকমা উপজাতিভুক্ত। জনসংহতি সমিতি মনে করে তাদের ফিরিয়ে আনতে পারলে চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগুরু উপজাতিতে পরিণত হবে। বর্তমানে তাদের সংখ্যা (৪৮%) অন্য ১২টি উপজাতির সম্মিলিত সংখ্যার (৫২%) চেয়ে কম। কিন্তু ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ পর্যন্ত যে সব নর-নারী সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান (আজকের বাংলাদেশ) হতে ভারতে প্রবেশ করেছে তারা ভারতীয় নাগরিক। ভারত সরাসরি এ চুক্তি ভঙ্গ করে ঐসব উপজাতীয়দের বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে পারে না। ভারতও চায় ঐ সব চাকমারা ফেরত আসুক। কেননা তাদের বহিস্কারের জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের পক্ষ হতে দাবী উঠিয়েছে। তাই তাদের ফিরিয়ে আনার দাবী তোলার জন্য ভারত সরকারের পক্ষ হতেও জনসংহতি সমিতি অঘোষিত চাপ পেয়ে এ ধরণের দাবী উত্থাপন করেছে। এসব চাকমাদের ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ সম্মত হলে যেসব হিন্দু ভারতে স্থায়ী নাগরিকত্ব পেয়েছে, তাদেরকে ফেরত পাঠাবার একটা স্বীকৃত সুযোগ ভারত পেয়ে যাবে। সুতরাং চাকমাদেরকে ফেরত আনার দাবী কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আসন সংরক্ষণ ঃ

"পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আসনসমূহ জুম্ম জনগণের জন্য সংরক্ষিত রাখার দাবী গণতন্ত্রের মূল চেতনা ও সেখানে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী। এর উদ্দেশ্য হলো বাঙ্গালীদের চিরন্তনভাবে অধিকারহীন ও পঙ্গু করে দেয়া। জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের মাধ্যমে ইতোমধ্যে বাঙ্গালীদের স্থানীয়ভাবে অধিকারহীন করা হয়েছে। আর এ দাবী তোলা হচ্ছে তাদেরকে জাতীয় পর্যায়ে অধিকারহীন করার জন্য।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, অধিক সংখ্যক বাঙ্গালী থাকা সত্বেও বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সব কটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উপজাতীয়রাই নির্বাচিত হয়েছে। বাঙ্গালী প্রার্থী থাকা সত্বেও বাঙ্গালীরা উপজাতীয়দের ভোট দিয়েছে যোগ্যতার ভিত্তিতে। যোগ্যতার বিপরীতে যদি সম্প্রদায়গত বিবেচনা প্রাধান্য পেত, তা হলে তিনটি আসনেই বাঙ্গালী প্রার্থী নির্বাচিত হতেন। বাঙ্গালীদের পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে না দেখে তাদেরকেও উপজাতীয়দের সুখ-দুঃখের অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করলে উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলোই সর্বাধিক উপকৃত হবে। এ ধরণের দাবী সম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-প্রসূত। এ দাবী প্রত্যাহৃত না হলে শেষ পরিণতিতে উপজাতীয়রাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কারণ অবস্থা বেগতিক দেখে বাঙ্গালীরাও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতাকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য হবে।

বাঙ্গালী বর্জিত প্রশাসন ঃ

"পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী (অর্থাৎ উপজাতীয়) নন, এমন কোন ব্যক্তিকে যেন নিয়োগ করা না হয় সে রকম আইন" প্রণয়ন করার দাবী সম্পূর্ণরূপে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের মূল চেতনার পরিপন্থী। যদি উপজাতীয়রা সমতল বাংলাদেশের অন্যত্র চাকরি করার সুযোগ ভোগ করতে পারে, বাঙ্গালীদেরও পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকরি করার অধিকার রয়েছে। এ অধিকার সাংবিধানিকভাবে তো বটেই, মানবিক ভাবেও স্বীকৃত। সংবিধানের ২নং অনুচ্ছেদের ২-উপধারায় বলা হয়েছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবে না, কিংবা সেইক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হইবে না।" এ দাবীরও অন্যতম লক্ষ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের সার্বভৌম কর্তৃত্বকে দুর্বল করা।

বস্তুতঃ প্রতিটি দাবীই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতার পরিপন্থী। এ ধরণের অবাস্তব দাবী উত্থাপনের মূল লক্ষ্যই হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত জিইয়ে রাখা। কারণ জনসংহতি সমিতি জানে এ ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবী মেনে নেয়া কোন সরকারের পক্ষেই নয়। তারা মনে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান অশান্ত পরিবেশই তাদের স্বার্থরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব এবং দায়িত্বহীন বিলাসী জীবনযাপন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই অসম্ভব দাবীর আবরণে সংকট জিইয়ে রাখাই তাদের জন্য কল্যাণবহ। আর যদি **কোনদিন কোন সরকার এসব দাবীর যেকোন একটিও মেনে নেয়, তবে ধরে নিতে হবে, ঐ সরকার চাকমাদের বিচ্ছিন্ন হবার পথ সুগম করে দিয়েছেন।** ■

কল্পিত জুম্মল্যান্ড

- জুম্মল্যান্ড আন্দোলনের দুর্বল দিক
- ভারত জুম্মল্যান্ডের অস্তিত্ব মেনে নেবে কি ?
- জুম্মল্যান্ড কেমন হবে ?
- জুম্মল্যান্ড আন্দোলন স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার

জুম্মল্যান্ড আন্দোলনের দুর্বল দিক

জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীরা গত ২৪ বছর যাবত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে আসছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন স্থানকেই তারা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি, এমনকি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পর্যন্ত আদায় করতে পারেনি। একেবারে অতি উদারভাবে মেনে নিলেও একথা বলা যাবে না যে, তারা তাদের সর্বাধিক সু-সময়েও ৫ হাজার সশস্ত্র ক্যাডার সংগ্রহ করতে পেরেছে। মূলতঃ বিশ্বের অন্য কোন সশস্ত্র আন্দোলন এমন জনসমর্থনহীনতা, দুর্বলতা ও বন্ধ্যাত্বে ভোগেনি। স্বদেশ-বিদেশের দুয়ারে দুয়ারে ধর্না দিয়ে হাজারো প্ররোচণা চালিয়েও সন্ত্রাসীরা ভারত ছাড়া অন্য কোথাও গ্রহণযোগ্যতা ও পাত্তা পাচ্ছেনা। ফলে **বাংলাদেশ সরকার আগ বাড়িয়ে তাদের কোন ছাড় না দিলে তাদের সাফল্যের কোন সম্ভবনাই নেই**। তাদের আন্দোলনের সার্বজনীন সমর্থনহীনতা, অগ্রহণযোগ্যতা, বাস্তব অর্থে ব্যর্থতার পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সফর করে উপজাতীয় জনগণ এবং উপজাতীয় ও অউপজাতীয় বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক কর্মী, সমাজসেবী এবং বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়কালে এ সন্ত্রাসী আন্দোলন কেন সাফল্য লাভ করবেনা তার অনুকূলে তারা অনেকগুলো বাস্তব পরিস্থিতি ও যুক্তি তুলে ধরেছেন ঃ

১. **ঐতিহাসিক ও ভৌগলিকভাবে অযৌক্তিক ঃ** ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অংশ। ইহা কখনোই বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন উপজাতীয় রাষ্ট্র ছিল না। বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রামে উপনিবেশিক কিংবা সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসী দখলদার শক্তি নয়। বাংলাদেশ তার অবিচ্ছেদ্য ভূ-খন্ড যেকোন মূল্যে এবং পন্থায় ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষার অধিকার রাখে --এ বাস্তবতা সবাইকে মানতে হচ্ছে। তাই বিশ্বের কোন দেশই বাংলাদেশকে যৌক্তিক অর্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সরে আসতে বলতে পারছে না।

২. **অযৌক্তিক আন্দোলন ঃ** একটি বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলন শুরু করার পেছনে যে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ও পটভূমি থাকে চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসের পেছনে তেমনটি নেই। যথোপযুক্ত যৌক্তিক ও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ন্যায্য দাবী বারবার ব্যর্থ হবার পর কোন অধিকৃত অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হবার জন্য সশস্ত্র পন্থা অবলম্বন করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চল নয়, ইহা বঞ্চিত কিংবা শোষিতও নয়, বরং বহুক্ষেত্রে সুবিধাভোগী ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়াই

দেশ স্বাধীন হবার দু'মাসের মাথায় (১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২) দেশদ্রোহী মানবেন্দু লারমা'র অনুসারী ভারতীয় চররা পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্বশাসন প্রদানের দাবী উত্থাপন করে। যদিও ব্রিটিশ কিংবা পাকিস্তান আমলে কখনোই এ ধরণের দাবী ওঠেনি। তাছাড়া একটি জেলাকে অকারণে রাতারাতি পৃথক প্রদেশ বানিয়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে এমন দাবী কারো কাছে যুক্তিসংগত মনে হতে পারেনা। বাংলাদেশ প্রদেশবিহীন এক কেন্দ্রীক রাষ্ট্র হওয়ায় এবং অন্য কোন অঞ্চলে এ ধরণের মর্যাদা ও সুবিধা না থাকায়, সর্বোপরি কোনভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে শোষণ কিংবা বঞ্চনার শিকারে পরিণত না করায় স্বায়ত্বশাসন -সম্বলিত পৃথক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার দাবী অযৌক্তিক বলেই বিবেচিত হয়। বিশেষতঃ এ অবান্তর দাবী উত্থাপনের অল্প ক'দিন পরে সশস্ত্র লড়াই শুরু করে এ সত্যিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এসব তৎপরতা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও চক্রান্তমূলক, যার মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে খন্ডিত করা।

৩. **বিদেশী চরদের কারসাজি ঃ** দেশ-বিদেশের সব মহল অনুধাবন করতে সক্ষম যে মানবেন্দু লারমাসহ বিচ্ছিন্নতাবাদীচক্র ভারতের লেলিয়ে দেয়া চর। ভারতীয় সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা অকপটে স্বীকার করেছেন যে ভারতীয় গোয়েন্দা চক্র 'র' জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর চরদের মাঠে নামিয়েছে বাংলাদেশকে বিব্রত করার জন্য। তাদের আশ্রয়, অর্থ, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সব কিছু ভারতই প্রদান করে। জনসংহতি সমিতি এবং অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ ভারতেই অবস্থান করছে এং তাদের সমুদয় কার্যক্রম ভারত হতেই পরিচালিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের কোথাও শান্তি বাহিনীর কোন ঘাঁটি কিংবা প্রশিক্ষণ শিবির নেই। ওরা সীমান্তের ওপাড় থেকে আসে, আবার ফিরে যায়। অর্থাৎ তারা বিদেশী চর, বিদেশেই তাদের অবস্থান। বিদেশী শক্তি তার স্বার্থে এদের ব্যবহার করছে। জনসংহতি সমিতি কিংবা শান্তি বাহিনীর এ অবস্থান ও পরিচিতিই তাদের কাল।

৪. **জনসমর্থনহীনতা ঃ** জনসংহতি সমিতির এ আন্দোলন কোনভাবে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত মতামতের প্রতিফলন নয়। ন্যায্য গণদাবী বার বার ব্যর্থ হবার মুখে জনগণের ইচ্ছায় তাদেরকে সাথে নিয়ে এ আন্দোলনের সূচনা করা হয়নি। গত ২৪ বছরেও এ আন্দোলন সত্যিকার অর্থে গণ স্বীকৃতি পায়নি। ১৯৭১ সনে যথোপযুক্ত ন্যায়সঙ্গত কারণে যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টি হওয়াতেই এদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ যেমন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, অবান্তর ও অবৈধ যুক্তি ও দাবীর কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে কখনোই সে অবস্থা সৃষ্টি হবে না। শান্তিবাহিনীকে জোর করে অর্থ

আদায় করতে ও আশ্রয় পেতে হয়। স্বেচ্ছায় কেউই শান্তিবাহিনীতে যায়না। শান্তিবাহিনী জোর করে উপজাতীয়দের সন্ত্রাসী হতে বাধ্য করে। শান্তিবাহিনী অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে এমন নীতি চালু করেছে যে, প্রত্যেক পরিবারের কমপক্ষে একজনকে আবশ্যিকভাবে শান্তিবাহিনীতে যেতে হবে। এর মানে এ-ই হলো যে শান্তিবাহিনীতে যোগদান স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, বরং জোরজবরদস্তিমূলক। এ ধরণের অনিচ্ছাকৃত ক্যাডাররা কখনোই তাদের লক্ষ্যার্জনে আন্তরিক হয় না এবং সুযোগ পেলেই দলত্যাগ করে। এই কারণেই শান্তিবাহিনীর দলত্যাগীদের সংখ্যা বিশ্বের অন্য যেকোন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। দলত্যাগীদের হত্যা করার যে নির্মম ও অমানবিক নীতি শান্তিবাহিনীর মূল নেতৃত্ব অনুসরণ করছে, তা না থাকলে এবং বাংলাদেশের সরকার দলত্যাগীদের নিরাপত্তা বিধানে এবং পুনর্বাসনে আন্তরিকভাবে দায়িত্ব নিলে শান্তিবাহিনী বহু আগেই শূন্য গোয়ালে পরিণত হত।

৫. **জাতিগত অনৈক্য** ঃ জাতি ও গোষ্ঠীগত অনৈক্যও আন্দোলনের অন্যতম দুর্বল দিক। উপজাতিসমূহের মধ্যে এমন একক নেতৃত্ব বা সংগঠন গড়ে ওঠেনি যা ১৩টি উপজাতিকেই ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। জনসংহতি সমিতি এবং শান্তিবাহিনীসহ অন্যান্য সহযোগী সংগঠনসমূহ যে একান্তভাবে চাকমা প্রভাবিত এবং এ আন্দোলন যে একান্তভাবেই চাকমা স্বার্থ ও প্রভাব রক্ষা এবং প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত, এ সত্যিটি অন্য ১২টি উপজাতি অনুধাবন করতে পেরেছে। এ কারণে অস্ত্রের ভয় দেখিয়েও আজকাল অন্যান্য উপজাতীয়দের জনসংহতি সমিতির পতাকা তলে আনা যাচ্ছে না। ইতোমধ্যেই মুরং উপজাতি শান্তিবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য সশস্ত্র মুরং বাহিনী গড়ে তুলেছে। ত্রিপুরা এবং মারমাদের মধ্যেও জনসংহতি সমিতি তথা চাকমা প্রভাব প্রতিহত করার প্রবণতা বেড়ে চলেছে। প্যাংখো, লুসাই, তংচঙ্গা, বোম প্রভৃতি ক্ষুদ্র উপজাতিগুলো শান্তিবাহিনীর হাতে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে বিধায় তারাও বিরোধী শিবিরে চলে গেছে। সুতরাং চলমান সন্ত্রাসী কার্যক্রম অনৈক্য ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের শিকার এবং আগামী দিনগুলোতে এ প্রবণতা আরো তীব্র ও প্রখর হতে পারে। এ কারণে এ চক্রান্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৬. **ভৌগোলিক সম্পৃক্ততাগত বাধা** ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করার পথে সবচেয়ে অলঙ্ঘনীয় বাধা হচ্ছে বাংলাদেশের সাথে এর ভূখন্ডগত অচ্ছেদ্যতা ও সম্পৃক্ততা। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্বদাই আমাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম প্রেরণের জন্য আমাদেরকে অন্যের ভূ-খন্ড ব্যবহার করতে হবে না। ভৌগোলিকভাবে সন্নিহিত কোন

অবিচ্ছেদ্য অঞ্চল অবৈধ যুদ্ধের মাধ্যমে কোন দেশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ঘটনা সারা বিশ্বে নেই বললেই চলে। বিচ্ছিন্ন হবার অনুকূলে যথার্থ কারণ ও অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের সাথে ভূ-খন্ডগতভাবে অভিন্ন ও সম্পৃক্ত থাকলে ১৯৭১ সনে ৯ মাসের যুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জন করা হয়তো বাংলাদেশের পক্ষ্যে আরো কঠিন হতো। ভূ-খন্ডভাবে অভিন্ন হবার কারণেই ভারতের কাশ্মীরী, অহমিয়া, নাগা, মিজো, মনিপুরী, শিখরা তাদের ভূ-খন্ডকে ভারত হতে বিচ্ছিন্ন করতে পারছে না। শ্রীলংকার তামিল, ফিলিপাইনের মরো, স্পেনের বাস্ক, ব্রিটেনের আই আর এ, ইরান-ইরাক-তুরস্কের কুর্দি বিদ্রোহীরা দীর্ঘ দিন যুদ্ধ করেও স্বাধীনতার মুখ দেখছেনা ভূ-খন্ডগত অভিন্নতার কারণে। সুতরাং শান্তিবাহিনীর স্বপ্ন একই কারণে স্বপ্নই থেকে যাবে, বাস্তবতার মুখ দেখবে না।

৭. <u>জনসংখ্যার স্বল্পতা</u> ঃ উপজাতীয়রা সংখ্যায় এতো কম যে, তাদের পক্ষে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যাপকহারে জনশক্তি ব্যবহার করার সুযোগ নেই। চলমান সন্ত্রাসী কার্যক্রমের প্রতি যদি ১৩টি উপজাতির সবাই স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনও প্রদান করে, তথাপি সমুদয় উপজাতীয় জনসংখ্যা হলো বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র .৪৫%। সুতরাং ৯৯.৫৫% জনগণের বিরুদ্ধে মাত্র .৪৫% এক কালের বহিরাগত জনগণের অবৈধ লড়াই যতোই সর্বাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত হোক না কেন, তা কোনভাবেই বাংলাদেশের ওপর কার্যকর চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না। এদের সবাই (৫,১৩,৬১২) যদি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়, তথাপি তারা কখনোই বাংলাদেশের ওপর সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব চাপিয়ে দিতে পারবেনা। কাশ্মীরের ৪০ লাখ মুসলমানের শতকরা ৯৫ জন ভারতের অবৈধ দখলের বিরোধী। কিন্তু তারা ভারতীয় বাহিনীকে হটাতে পারছে না। জনসংখ্যার স্বপ্লতা, জাতিগত অনৈক্য, আন্দোলনের অযৌক্তিকতাপ্রসূত জনসমর্থনহীনতার কারনে শান্তিবাহিনী কখনোই জনবলে একটি কার্যকর শক্তিতে পরিণত হবে না, যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করতে পারে।

৮. <u>নমনীয় সামিরক শক্তি প্রয়োগ</u> ঃ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমন করতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা এজেন্সীগুলো একেবারে সীমিত ও রক্ষাত্মক ভূমিকা পালন করছে বিধায় পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশ্বের অন্য যেকোন বিচ্ছিন্নপ্রবণ অঞ্চলের চেয়ে তুলনামূলকভাবে হাজার গুণ উন্নত। এখানে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। ফলে তারা কোন রূপ বাড়াবাড়ি বা মানবাধিকার লঙ্গিত হবার মতো

কার্যক্রমে লিপ্ত হয় না। অথচ মানবাধিকার ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হলে জনসংহতি সমিতি বিশ্বজনমতকে কার্যকরভাবে তার অনুকূলে আনত পারত। অন্যদিকে সাধারণ উপজাতীয়রাও মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে সোচ্চার হতো। কিন্তু সে পরিস্থিতি বিরাজ না করায় শান্তিবাহিনীর স্বদেশ-বিদেশ হতে সহানুভূতি পাচ্ছে না।

৯. ব্যাপক সংখ্যক বাঙ্গালীর উপস্থিতি ঃ ১৯৯১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে ৩,১১,২৬৭ জন বাঙ্গালী বসবাস করছে। এ সংখ্যার সাথে সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, নিরাপত্তা এজেন্সীসমূহ এবং এনজিওসমূহে কর্মরত যেসব বাঙ্গালী পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় অস্থায়ীভাবে অবস্থান করছে তাদেরকে যুক্ত করা হয়নি।

শান্তিবাহিনী, পাহাড়ী ছাত্রপরিষদের সন্ত্রাসীদের হাতে প্রায়ই বাঙ্গালীরা নিগৃহীত, অপহৃত এবং আহত বা নিহত হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গালীরা পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্যাগে মোটেই আগ্রহী নয়। বরং তারা শান্তিবাহিনীর প্রতিরোধ, হত্যা, নির্যাতনকে উপেক্ষা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনজীবনের সাথে মিশে যাচ্ছে, নিজেরা বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হচ্ছে, যা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্নকরণের পথে কার্যকর বাধা বিশেষ।

১০. বিচ্ছিন্নতাবাদ বিরোধী উপজাতি ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩টি উপজাতির কোনটিই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শান্তিবাহিনীর প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি জনপদে ব্যাপক সংখ্যক উপজাতি বিচ্ছিন্নতাবাদ বিরোধী শক্তি হিসেবে ইতোমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে। মুরং বাহিনী ছাড়াও বিভিন্ন উপজাতিভূক্ত যুবকরা গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও আনসার বাহিনীতে যোগদান করে শান্তিবাহিনীকে প্রতিহত করার দায়িত্ব পালনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য, সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ এবং জাতীয় রাজনৈতিক দলসমূহের উপজাতীয় নেতা-কর্মীরা মূলতঃ শান্তিবাহিনীর বিপক্ষীয় শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের এসব ক'টি দুর্বলতা সম্পর্কে কম-বেশী সবাই ওয়াকিবহাল। ফলে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন তেমন আমল পাচ্ছেনা। ■

ভারত জুম্মল্যান্ডের অস্তিত্ব মেনে নেবে কি?

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি রাজ্যই মূলতঃ উপজাতি অধ্যুষিত। এই সাতটি রাজ্যে ২১৭টি উপজাতি রয়েছে। ৭টি রাজ্যই ভারত ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের কাছ হতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। ৭টি রাজ্যেই দিল্লীর শাসন-শোষণ হতে মুক্ত হবার লক্ষ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসী সৃষ্টির মূল লক্ষ্য হল উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভারতের সন্ত্রাসীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যবহারের সুযোগ হতে বঞ্চিত করা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের প্রভাবমুক্ত একটি উপজাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্র যদি প্রতিষ্ঠিত হয়েই যায়, তবে ভবিষ্যতে ভারতের ৭টি রাজ্যের চলমান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন অভাবনীয়ভাবে তীব্রতর হবে। কেননা এতে ভারতীয় উপজাতীয়রা উৎসাহিত হয়ে তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরো বেগবান করবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে পৃথক রাষ্ট্র স্থাপন করা আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি রাজ্যের স্বাধীনতা দিয়ে দেবার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবেনা। পার্বত্য চট্টগ্রামে সব সময় যে ভারতপন্থী লোক ক্ষমতায় থাকবে তেমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না।

এ অবস্থায় ভারত তার ঘরের দরজা তথা বিচ্ছিন্ন-প্রবণ অঞ্চলের কাছে একটি উপজাতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কিছুতেই মেনে নেবেনা। এ ধরণের রাষ্ট্র ভারতের আঞ্চলিক অখন্ডতার জন্য আরো মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। ভারত তার ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত স্বার্থে চাকমাদেরকে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন হতে সার্বিকভাবে সাহায্য করলেও তাদেরকে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের মালিক হতে দেবেনা। ১৯৭১ সনে পাকিস্তান হতে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন হবার চূড়ান্ত পরিণতি যে সার্বিক অর্থেই কল্যাণবহ হবে না, ভারত ইতোমধ্যে তা অনুধাবন করতে শুরু করেছে। তাই ভারত স্বাধীন জুম্মল্যান্ডের অস্তিত্ব মেনে নেবে না।

চাকমারা অচিরেই এই বাস্তব সত্যিটি উপলব্ধি করতে পারবে যে, তারা কেবল ভারতের স্বার্থের গুটি হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। ভারতীয় নীতি নির্ধারকরা মনে করেন যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি রাজ্যের আন্দোলনকে দমন করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের সরব উপস্থিতি থাকতে হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যই ভূমিবেষ্টিত বলে তাদের নিকটবর্তী সমুদ্রে পৌছার জন্য সর্বাধিক সহজতম সড়ক হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশ। উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতীয়দের

ন্যায়-সঙ্গত শতবর্ষব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামকে নির্মমভাবে দমনকারী ভারত বাংলাদেশী উপজাতীয়দের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে কার স্বার্থে ?

চাকমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতীয়দের অনুধাবন করতে হবে যে, ভারতের বন্ধুত্ব এবং প্রতিশ্রুতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং শর্তসাপেক্ষ। যে ভারত আজ চাকমাদেরকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশকে খন্ডিত করার জন্য, সে ভারতই ২৬ বছর আগে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশীদের ভারতের মাটিতে (চাকমাদের মতোই) আশ্রয় দিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়েছিল। ভারতের হিসেব মতে ১১ হাজার ভারতীয় সৈন্য ঐ যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। তৎকালীন ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রামের মতে ঐ নয় মাসে ভারতকে দৈনিক ১ কোটি রুপী খরচ করতে হয়েছে বাংলাদেশের জন্য।[৯৭] আজকে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক কেমন তিক্ত তা চাকমাসহ অন্যান্য উপজাতিদের অজানা নয়। গত ২৬ বছরে ভারত বাংলাদেশকে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। বাংলাদেশকে দুর্বলতর এবং গ্রাস করার জন্য এমন কোন হীন চক্রান্ত নেই, যা সে অবলম্বন করেনি। বাংলাদেশকে তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই ১৯৭১ সনে ভারত আমাদেরকে সমর্থন ও সাহায্য দিয়েছিল। ভারতের আজকের আচরণ তা-ই প্রমাণ করে। স্বাধীনতার জন্য যে দেশ তার ৩০ লাখ সন্তানকে কোরবানী দিয়েছে, আজ সে দেশকে ভারতের কথায় উঠাবসা করতে হয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, শিল্পাঞ্চলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সরকারের ভেতরে-বইরে, অফিস-আদালতে অর্থাৎ জনজীবনের সর্বত্রই ভারতীয় চরের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বাংলাদেশকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়েছে। ঢাকা হতে প্রকাশিত একটি ইংরেজী দৈনিক একই প্রসংগে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন ঃ "Each and every governmental organisation. political party, University student's organisation, Labour Union, Newspapers Union, Printer's & Publisher's Union, Radio and Television Union, Singer's & Artist's Union, Social Club, Educational Institutions, Teacher's Union, Police & other Defence organisations, especially the foreign office/ministry. External Resources Division, Nationalised Banks, Bangladesh Bank, Private Banks and entire civil services have been effectively and Permanently infiltrated by Indian Agents who are well trained and well paid for".[৯৮]

---

[৯৭] The Assam Tribune : Guwahati : India : July 23, 1994.

[৯৮] The New Nation : September 12 : 1992.

(ভাবানুবাদ ঃ প্রতিটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে, আর্থিক সংস্থায়, রাজনৈতিক দলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংগঠনে, শ্রমিক ইউনিয়নে, সংবাদপত্র ইউনিয়নে, মুদ্রাকর ও প্রকাশকদের ইউনিয়নে, বেতার-টিভির গায়ক-গায়িকা শিল্পীদের ইউনিয়নে, সামাজিক সংগঠনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষকদের সংগঠনে, পুলিশ এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক সংস্থায়, বিশেষতঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, বর্হিসম্পদ বিভাগে, রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকে, বাংলাদেশ ব্যাংকে, বেসরকারী ব্যাংক এবং সমগ্র বেসামরিক প্রশাসনে ভারতীয় চররা কার্যকর এবং স্থায়ীভাবে অনুপ্রবেশ করেছে, যারা ভালভাবে প্রশিক্ষিত এবং উত্তম সম্মানী (মাসোহারা) প্রাপ্ত।)

দৈনিকটির মতে দিল্লীর যাদুকররা তাদের চরদের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোন দেশপ্রেমিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে যদি ঐ সরকার বাংলাদেশকে ভারতের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবার চক্রান্ত প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়।

বাংলাদেশকে বিব্রত-বিপর্যস্ত করতে ভারতীয় গোয়েন্দাচক্র প্রতিনিয়ত নানাবিধ চক্রান্তের জাল বিস্তার করে চলেছে। পুরানো সমস্যা জিইয়ে রেখে নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে। আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানি অবরোধ, তালপট্টী দখল, সীমান্ত হামলা, পুশইন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তথাকথিত জুম্মল্যান্ড, বঙ্গভূমি, হিন্দুল্যান্ড, আদিস্থান প্রভৃতি রাষ্ট্র প্রতিষ্টার প্রচেষ্টা চালিয়ে ১২ কোটি মানুষের দেশকে ধ্বংস করতে ভারত উদ্যত। মাত্র ৫ লাখ বহুধাবিভক্ত উপজাতীয়দের সমন্বয়ে গঠিত অতি ক্ষুদ্রভূমি সমুদ্রপথবিহীন পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের চক্রান্তের মুখে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকবে, বা টিকে থাকতে দেয়া হবে, এমন কল্পনা কেবল বোকাদের পক্ষ্যেই সম্ভব।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সচেতন উপজাতীয়দের অনুধাবন করতে হবে যে, ভারত প্রকৃত অর্থে স্বাধীন উপজাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনুকূলে কিনা। গত ২৬ বছরের ভারতীয় ভূমিকা এ সত্যিই প্রতিষ্ঠিত করছে যে সে চাকমা কিংবা বাংলাদেশ কারোরই বন্ধু নয়। ভারত আন্তরিকভাবে চাকমাদের দাবীর সমর্থক হলে আরো বহু আগে তাদের কাঙ্খিত জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হত। যদি পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর মতো দুর্ধর্ষ শক্তির সাথে ভারত লড়াই করতে পারে, তবে কেন চাকমাদের অনুকূলে তেমন তৎপর হয়না। আসলে ভারত চাকমাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে ঃ (১) বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য এবং (২) একে দুর্বল করতঃ গ্রাস করার জন্য।

এ অবস্থায় কেবল বাংলাদেশ একাই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে না, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিঘ্নিত হচ্ছে। কোন কোন

উপজাতীয় পরিবার স্বজনকে হারিয়েছে, কিছু উপজাতীয়কে বিদেশে মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে। ভারতের চাপিয়ে দেয়া এ যুদ্ধে উপজাতীয়দের জীবন হতে সুখ ও সমৃদ্ধি দূরীভূত করেছে। অনিশ্চিত যুদ্ধ জড়িয়ে সরল-প্রাণ উপজাতীয়রা দেশের বাকী অংশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে দেশদ্রোহী-সন্ত্রাসী হিসেবে ধিকৃত হচ্ছে, যা কোন বিবেচনাতেই শুভ নয়। এই অনিশ্চিত যুদ্ধ বিপথগামী সন্ত্রাসী এবং তাদের পরিবার পরিজনদের ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাবে এবং সাধারণ নিরাপরাধ উপজাতীয়দের দুর্ভোগ বাড়াবে।

সর্বোপরি, চাকমাসহ অন্যসব উপজাতীয়দের অনুধাবন করতে হবে যে, যে ভারত তার আপন ভূ-খন্ডের উপজাতীয়দের মাতৃভূমিকে জোরপূর্বক দখলে রেখেছে এবং তাদের নির্মূল করার জন্য দীর্ঘ ৫০ বছর যাবত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, সে বাংলাদেশী উপজাতীয়দের অবৈধ স্বাধীনতার জন্য কিছুতেই আন্তরিক হবে না। এমন সম্প্রসারণবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তি কখনোই ক্ষুদ্রতর জাতিসত্ত্বার বন্ধু হতে পারে না। ■

জুম্মল্যান্ড কেমন হবে ?

পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করে জনসংহতি সমিতি, তার সামরিক শাখা শান্তিবাহিনী এবং তাদের সহযোগী অন্যান্য সংগঠনগুলো উপজাতীয় জনগণকে স্বাধীন স্বদেশ নামক যে কল্পিত ভূমির স্বপ্ন দেখাচ্ছে তার নাম 'জুম্মল্যান্ড'।

যেখানে ভারত বাংলাদেশের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারছে না বলে বাংলাদেশকে গ্রাস করার উদ্দেশ্য বিভিন্ন ধরণের গোপনীয় ও প্রকাশ্য ফ্রন্ট খুলেছে, সেই ভারত তার ঘরের দরজায়, বিশেষতঃ বিচ্ছিন্নপ্রবণ উপজাতীয় অঞ্চলের সন্নিকটে একটি স্বাধীন উপজাতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নেবে তেমন ভাবা নির্বুদ্ধিতারই কাজ হবে।

জুম্মল্যান্ড আন্দোলনের লক্ষ্য বাহ্যত যা-ই হোক, বাস্তবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের সাথে একীভূত করার সুদূর প্রসারী চক্রান্তকে সামনে রেখেই এ চক্রান্ত চালানো হচ্ছে। ভারতের স্ট্রাটেজী হলো চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলাদেশকে গ্রাস করতে হলে বিভিন্ন ফ্রন্টে বাংলাদেশকে দুর্বল ও অচল করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম তেমনি একটি ফ্রন্ট। জুম্মল্যান্ড চাকমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম নয়, বাংলাদেশকে অকেজো করে গ্রাস করার একটি প্রক্রিয়ার নাম।

তথাপি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কল্পিত জুম্মল্যান্ড নামক একটি স্বাধীন চাকমা রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হলে তার অবস্থা কেমন হতে পারে ? বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমি নিম্নোক্ত উপসংহারে পৌছতে পারি ঃ

১. ভিন্ন ভিন্ন কথ্য ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যের অধিকারী উপজাতিসমূহ নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ১৩টি উপজাতির প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে। কোন একটি উপজাতি অন্য উপজাতির কথা বুঝে না। অধিকাংশ উপজাতির স্বার্থগত, গোষ্ঠীগত ও মনস্তাত্তিক দ্বন্দ্ব চিরন্তন। ইতিহাসের কোন সময়েই এসব উপজাতির কেউই অন্যটির শাসক ছিল না। তাদের সবাই বাংলাদেশের ঐ অঞ্চলে বহিরাগত ও আশ্রিত বিধায় তারা বাংলাদেশের শাসনাধীন ছিল। তাই তারা কেউই প্রকৃত অর্থে অন্যের ওপর কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়নি। তাই তাদের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব ও বৈপরিত্য সব সময়ই সুপ্ত থেকেছে, প্রকট ও তীব্র হবার তেমন সুযোগ পায়নি।

জুম্মল্যান্ড নামক চাকমা কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যান্য উপজাতিসমূহের সাথে তাদের (চাকমাদের) সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্যগত ও মনস্তাত্তিক দ্বন্দ্ব প্রখর হবে। আদম শুমারী অনুয়ায়ী অন্য ১২টি উপজাতির সম্মিলিত সংখ্যা চাকমাদের তুলনায় বেশী। এদের মধ্যে তংচঙ্গা ও মুরংদের সাথে চাকমাদের দ্বন্দ্ব এখনই প্রকট। চাকমারা তাদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য তংচঙ্গাদের ভিন্ন উপজাতি হিসেবে স্বীকার করে না। আবার তংচঙ্গরা নিজেদেরকে চাকমা উপজাতির অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করে না, তারা তাদেরকে ভিন্ন উপজাতি হিসেবেই পরিচিত হতে গর্ববোধ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে চাকমা-তংচঙ্গা এবং চাকমা-মুরং তিক্ত সম্পর্ক রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে পরিণত হতে পারে।

মারমা ও ত্রিপুরা উপজাতি জনসংখ্যানুযায়ী যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এরা প্রায়ই চাকমাদের পাশাপাশি। চাকমাদের সাথে তাদের মনস্তাত্তিক ও স্বার্থগত দ্বন্দ্ব রয়েছে। ত্রিপুরা ও মারমা তথা অন্যান্য উপজাতি যতো বেশী শিক্ষিত ও আধুনিক হবে চাকমাদের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব তত প্রখর ও তিক্ত হবে। জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদকে জনসংহতি সমিতি যেসব কারণে মেনে নিচ্ছে না, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো এ ব্যবস্থায় অন্যান্য উপজাতির জনসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ রয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য উপজাতি লেখা-পড়া, চাকরিসহ সব ধরণের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে শক্তিশালী হোক চাকমারা তা চায়না। কারণ তারা মনে করে এতে চাকমা প্রভাবিত জুম্মল্যান্ডে চাকমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্থ হবে। বিশেষজ্ঞমহল মনে করেন জুম্মল্যান্ড নামক কল্পিত রাষ্ট্রে উপজাতীয় গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব ও দাঙ্গা এমন তীব্র হতে পারে যা বর্তমান বুরুন্ডির তুপসি-হুতো কিংবা আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধ হতেও ভয়াবহ হবে।

বাংলাদেশ সরকার চাকমাসহ অন্যান্য উপজাতিদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে হারে সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে, কল্পিত জুম্মল্যান্ডে চাকমা শাসকরা তা কিছুতে করতে পারবে না। ফলে বঞ্চিত উপজাতিরা স্বাভাবিকভাবেই বিদ্রোহী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

২. জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হলে চাকমাসহ অন্যান্য উপজাতিসমূহের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা তীব্রভাবে সংকুচিত হবে। চাকমাসহ অন্যান্য উপজাতিরা এখন ৫৫ হাজার বর্গমাইলব্যাপী বাংলাদেশের সর্বত্রই চাকরি-বাকরি, লেখা-পড়া এবং বসবাস করার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হলে তাদেরকে ৫০৯৩ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে সীমিত থাকতে হবে।

এই অঞ্চলে আধুনিক জীবনধারার সূচনা হয়েছে মাত্র ২৫ বছর আগে অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে। ভৌগলিক কারণেই এখানে আধুনিক জীবন ধারার অবকাঠামো, চাকরির সংস্থান, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এবং কর্মসংস্থানের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক কলকারখানা গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

বর্তমানে শিক্ষা ও চাকরি উপলক্ষে সমতলে এসে আধুনিক ও উন্নত জীবনের যে সুযোগ উপজাতীয়দের অনেকেই পাচ্ছে পরিকল্পিত জুম্মল্যান্ডে তাও থাকবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পদে যতোই সমৃদ্ধ হোক না কেন, আধুনিক জীবন ধারার উপযোগী পৃথক রাষ্ট্র হবার যোগ্যতা অর্জন করতে যথেষ্ট সময় লাগবে। এই দীর্ঘ সময় টিকে থাকার মতো অর্থনৈতিক অবকাঠামো ও সমৃদ্ধি পার্বত্য চট্টগ্রামে নেই। এখানে আরো স্মরণ রাখতে হবে যে, ৫০ বছর আগের জীবনযাত্রা পদ্ধতি এবং আজকের উপজাতীয় জীবনমানের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। বহুসংখ্যক উপজাতীয় বিশেষতঃ শিক্ষিত, এমনকি সাধারণ উপজাতীয়দের মধ্যে যারা উন্নততর আধুনিক জীবনের স্বাদ পেয়েছে, তারা আর কখনো জুম-চাষ নির্ভর পাহাড়-জঙ্গলের যাযাবর জীবনে ফিরে যাবে না।

বর্তমানে পাহাড়ের ঢালে, গহীন অরন্যে বসবাসকারী উপজাতীয়রা যে শিক্ষা, যোগযোগ ও স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে, তা তীব্রভাবে সংকুচিত হয়ে যাবে। এসব পাহাড়ী জনগণের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার আলো পৌছার গতি পুনরায় স্তিমিত হয়ে পড়বে।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবেষ্টিত হওয়ায় এবং এর প্রতিবেশী ভারত ও মায়নমার পর্বত-সংকুল হওয়ায় বহির্বিশ্বের সাথে সব ধরণের যোগাযোগ বাংলাদেশের মাধ্যমেই করতে হবে। অর্থাৎ কল্পিত জুম্মল্যান্ডকে সর্বদাই বাংলাদেশের ওপর নির্ভর করতে হবে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহ শিলিগুড়ি করিডোর দ্বারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত হলেও ভারত তার আর্থ-সামাজিক ও সামরিক কৌশলগত কারণে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারকে অপরিহার্য মনে করছে। ভারতকে ট্রানজিটের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহারের সুযোগদানের বিরুদ্ধে দেশে তীব্র জনমত রয়েছে। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ও অযৌক্তিক কারণে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া জুম্মল্যান্ডকে বহির্বিশ্বের সাথে যোগযোগ রাখতে বাংলাদেশ তার ভূ-খন্ড ব্যবহারের সুযোগ দেবে এমন প্রত্যাশা একেবারে নিরর্থক। এ পরিস্থিতিতে ভূমিবেষ্টিত স্বাধীন জুম্মল্যান্ড কতখানি কার্যকর ও স্থায়ী হবে, তা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।

৪. শান্তি বাহিনীর সন্ত্রাসীদের চাপে বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরে আসবে, এমন দুরাশা কারোরই থাকা উচিত নয়। যদি কখনো সরে আসতেই হয়, তবে বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রামে ইতোমধ্যে গড়ে ওঠা অবকাঠামো অক্ষত রেখে সরে আসবে তেমনটি আশা করা যায় না। এ অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেলে তা পুনঃনির্মাণ করতে বহু বছর লাগবে এবং যা করার আর্থিক সঙ্গতি জুম্মল্যান্ড কর্তৃপক্ষের থাকবে না।

সব মিলিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জুম্মল্যান্ড নামক কোন পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র কোনভাবেই টিকে থাকবে না, বড়জোর ইহা বাংলাদেশ হতে পৃথক হয়ে ভারতের সাথে মিশে যেতে পারে। যদি ভারতের সাথেই মিশে যেতে হয়, তবে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপজাতীয়রা কতখানি লাভবান হবে ? ■

জুম্মল্যান্ড আন্দোলন ঃ স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার

পার্বত্য চট্টগ্রামে তথাকথিত জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠার নামে প্রধানতঃ চাকমা সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী এবং অন্যান্য উপজাতীয় সম্প্রদায়ের দু'চারজন অদূরদর্শী বিপথগামী জনসংহতি সমিতির ব্যানারে শান্তিবাহিনী এবং অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের সহায়তায় চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে আসলে নিজেদের ভাগ্য গড়ছে এবং ভোগ বিলাসিতায় জীবন যাপন করছে।

জনসংহতি সমিতি তথাকথিত চাঁদা এবং অপহরণের পণ আদায় বাবদ গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৩০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে থাকে বলে বিভিন্ন তথ্যাভিজ্ঞ সূত্র হতে জানা গেছে।

দৈনিক ইনকিলাব জানিয়েছেন কেবল বাঁশ ও বেত কাটা অব্যাহত থাকলে জনসংহতি সমিতি বার্ষিক ৪ থেকে ৫ কোটি টাকা চাঁদা হিসেবে সংগ্রহ করে। বিভিন্ন বস্তু হতে শান্তিবাহিনী কি হারে চাঁদা আদায় করে তা দেখুন[১১] ঃ

দ্রব্যাদির নাম	টাকা	দ্রব্যাদির নাম	টাকা
জাতি গাছ প্রতিফুট	১৫.০০	বিল্ডিং-শতকরা	৫.০০
জাতি গাছ রদ্দা প্রতিফুট	১২.০০	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ	৫.০০
জাতি গাছ গোল প্রতিফুট	১০.০০	শতকরা	১০.০০
জ্বালানী কাঠ শুকনা প্রতিফুট	১.৫০	যৌথ খামার শতকরা	১০.০০
জ্বালানী কাঠ তাজা প্রতিফুট	১.০০	রাবার বাগান শতকরা	২.০০
তক্তা প্রতিফুট	২০.০০	চাকরীজীবী আয়কর শতকরা	১০.০০
ইট প্রতিটি	০.১০	কয়লা প্রতিমণ	১০.০০
মুলি বাঁশ প্রতি হাজারে	১৫০.০০	গাঁজা প্রতিমণ	১০০০.০০
জাং বাঁশ প্রতি হাজারে	১০০০.০০	গরু গাড়ি বাৎসরিক	৩০০০.০০
রাস্তা কাটা শতকরা	১০.০০	ট্রাক বাৎসরিক	১০.০০
ব্রীজ নির্মাণ শতকরা	১০.০০	প্রতি গরু বাৎসরিক	২০.০০
		প্রতি মহিষ বাৎসরিক	

সুতরাং সে হারে অর্থাগম ঘটলে বার্ষিক ৩০ কোটি[১১১] কিংবা তারও চেয়ে বেশী টাকা সংগ্রহ অবাস্তব কিছু নয়।

---

[১১] প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ এখনো ষড়যন্ত্র ঃ পৃঃ ৫৩।

[১১১] সাপ্তাহিক চট্টলা ঃ চট্টগ্রাম ঃ ২৭ অক্টোবর ঃ ১৯৯১.

এছাড়া ত্রিপুরা শরণার্থী ক্যাম্পের জন্য প্রদত্ত রিলিফের অংশ বিশেষ, এনজিও এবং অন্যান্য সংস্থা ও ব্যক্তি হতে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত বিভাগ ও দফতরে কার্যরত উপজাতীয়, এমন কি বাঙ্গালী কর্মচারীদের দেয় মাসিক চাঁদা প্রভৃতি মিলিয়ে জনসংহতি সমিতি বছরে ৫০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। প্রতিটি উপজাতীয় পরিবারকে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট অংকের চাঁদা প্রদান করতে হয়।

আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সাবেক সদস্যদের প্রদত্ত তথ্য উদ্বৃত করে দৈনিক ইনকিলাব (০৮ ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৯১) তার সম্প্রাদকীয়তে মন্তব্য করেছেন যে, আদায়কৃত অর্থ, রিলিফের একাংশ এবং অন্যান্য সূত্র হতে সংগৃহীত অর্থা আত্মসাৎ, ত্রিপুরা ও ঢাকায় ঘুরাঘুরি, অস্ত্র বিক্রয়ের দালালী ইত্যাদিকে এখন শান্তিবাহিনীর কিছু নেতা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের মতে, শান্তি বাহিনীর মধ্যে সুবিধাবাদী টাউট চরিত্রই এখন ব্যাপক।

চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত অন্য একটি দৈনিক আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্য নিরুপম চাকমার সাক্ষাতকার উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন ঃ "শান্তিবাহিনীর নেতারা জনগণের মুক্তির কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। ------ শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ সাধারণ পাহাড়ী জনগনকে শোষণ করে ভারতে বড় বড় বিল্ডিং এর মালিক হচ্ছে। জনগণের নিকট হতে জোরপূর্বক চাঁদা নিয়ে নিজ নিজ স্ত্রীদের শরীর স্বর্ণালঙ্কারে ভরিয়ে দিচ্ছে"। জনসংহতি সমিতি এবং শান্তিবাহিনীসহ অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। ইতোমধ্যেই নেতাদের অনেকেই ভারতে ঘরবাড়ী করে ফেলেছে।

চাঁদা হিসেবে এবং অন্যান্য সূত্র হতে প্রাপ্ত কোটি কোটি টাকা যে কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তিবর্গের ভোগ-বিলাসিতায় ব্যয়িত হচ্ছে তার বাস্তব তথ্য প্রদান করেছেন বাংলাদেশ সরকারের কাছে (২২ মে, ১৯৯৫) আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর জন্য চাঁদা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত কথিত সার্জেন্ট মেস্তরাম ত্রিপুরা। তার মতে, "শান্তিবাহিনীর চাকমা নেতারা (চাকমা নেতাদের কথা বলা হয়েছে কারণ তারাই বিচ্ছিন্নতার পথে অন্যান্যদের প্ররোচিত করে এবং তারাই দলীয় নেতৃত্বে রয়েছে) দামী প্যান্ট, শার্ট, জুতা, আসবাব পত্র

দৈনিক পূর্বকোণ ঃ ৫মেঃ ১৯৯১ইং
দৈনিক মিল্লাত ঃ ১৪ ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৯১ইং

কেনা, রাজসিক আহার-বিহার, বাড়ি বানানো, ব্যাংকে অর্থ জমানো ছাড়াও নানা বিলাসিতায় সেই টাকা খরচ করছে।"[১০৩]

ঢাকার অন্য একটি দৈনিকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ঃ "সংগঠনের নেতা-কর্মীরা পার্টির তহবিল ভেঙ্গে রাজধানীতে বিলাসবহুল জীবন যাপন করছেন। পার্টির স্বার্থ ছাড়াই বিদেশ ভ্রমনে যাচ্ছেন। ক্যাডার শ্রেণীর পক্ষ থেকে উত্থিত এমন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে যে, নেতা-নেত্রীরা কেউ কেউ ঢাকার অভিজাত এলাকায় বাড়ী গড়েছেন। এমনকি শেয়ার মার্কেটে পুঁজি খাটাচ্ছেন। আরো জানা গেছে যে, শান্তিবাহিনী ও সমমনা তিনটি সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা-নেত্রীরা নিজেদের আখের গোছানোর জন্য ঢাকায় বিশেষ বিশেষ মহলের সাথে সখ্যতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নামীদামী হোটেলে ককটেল পার্টির নামে পশ্চিমা ধাঁচে আসর জমিয়ে থাকেন। কর্মী-সমর্থকরা, ট্যাক্স কালেক্টর অথবা পাহাড়ী ৩টি প্রকাশ্য সংগঠনের নেতা-কর্মী হয়েই ঢাকা ও চট্টগ্রামে বসবাসে অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠেন"।[১০৪]

ত্রিপুরাস্থ শরণার্থী শিবিরগুলো সরজমিনে পরিদর্শকারী জনৈক সাংবাদিকের বরাত দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক জানিয়েছেন, "শরণার্থীদের জিম্মি করিয়া স্বার্থান্বেষী চাকমা নেতারা নানাভাবে ফায়দা লুটিতেছে, এমনকি তাহারা ত্রিপুরায় ব্যবসা বাণিজ্য ও বসতি গড়িয়া তুলিয়াছে। পরিবহণ ব্যবসা করিতেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে চাঁদা তুলিয়া আনিয়া ব্যবসায় খাটাইতেছে।"[১০৫] অন্য একটি দৈনিক তার প্রতিবেদনে জানিয়েছেন যে, উপেন্দ্রলাল চাকমা'র মতো শরণার্থী কল্যাণ সমিতির পয়লা সারির নেতারা ভারতের ধন-দৌলত গড়েছেন।[১০৬] ■

---

[১০৩] দৈনিক সংগ্রাম ঃ ১ জুন ঃ ১৯৯৫ইং

[১০৪] দৈনিক সংগ্রাম ঃ ৮ নভেম্বর ঃ ১৯৯৬ইং

শাহজাহান সরদার ঃ দৈনিক ইত্তেফাক ঃ ২ নভেম্বর ঃ ১৯৯৬ইং

দৈনিক সংগ্রাম ঃ ১২ নভেম্বর ঃ ১৯৯৬ইং

বাঙ্গালী ঃ স্বদেশেই পরবাসী

- ❑ বসতি স্থাপন
- ❑ গুচ্ছগ্রামের করুণদশা
- ❑ বৈষম্যের শিকার
- ❑ উচ্ছেদ করার চক্রান্ত

বসতি স্থাপন

চাকমাসহ সবক'টি উপজাতিই যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত আশ্রিত এ কথা এখন প্রতিষ্ঠিত। এবং চাকমাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হয় বাঙ্গালীরাই ঐ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। তবে প্রাচীনকালে বাংলাদেশে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য এবং জনসংখ্যার স্বল্পতার কারেণ এবং ঐ অঞ্চল বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকায় সেখানে ব্যাপক সংখ্যায় বাঙ্গালী বসতি গড়ে ওঠেনি। এখনো সুন্দরবনের মতো বিরাট বনভূমিতে বাঙ্গালী তথা বাংলাদেশীদের কোন বসতি গড়ে ওঠেনি। এমন জনমানবহীন পতিত ভূমি বিশ্বের সবদেশেই রয়েছে। তাই বলে ঐ জনমানবহীন পতিত বা অব্যবহার্য ভূমি সংশ্লিষ্ট দেশের সার্বভৌমত্বের বাইরে নয়। সেখানে কোন বহিরাগত এসে আশ্রয় নিলে তার অর্থ এ নয় যে, ঐ অঞ্চলটি বহিরাগতদেরই হয়ে যাবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের সর্বত্রই জনস্থানান্তর হয়েছে এবং সবদেশেই সব যুগে এ ধরণের স্থানান্তর হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামেও এর ঢেউ লাগে। বিশেষতঃ কর্ণফুলী কাগজ কল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিলসহ বিভিন্ন কলকারখানায় এবং সরকারী কার্যোপলক্ষে ব্যাপক সংখ্যক বাঙ্গালীর কাছে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিচিত হয়ে ওঠে এবং সেখানে বাঙ্গালীরা জায়গা-জমি কিনে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে। এ ধরণের বসতি নির্মাণ ছিল একেবারে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। পরবর্তীকালে শান্তিবাহিনীর বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যক্রম অসহনীয় মাত্রায় উঠলে সরকারী উদ্যোগে কিছু সংখ্যক বাঙ্গালীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

১৯৭৯ সনে প্রথম পর্যায়ে ২৮,৫১৮টি পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে। এদের মধ্যে ২,৯৫৩টি পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্যাগ করে আবার সমতলে ফিরে আসে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৬,৭০৯টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করার পর ৪,৭৬৯টি পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে চলে যায়।[illegible] পরবর্তীকালে সরকারী উদ্যোগে আর কোন বাঙ্গালী পরিবারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করার তথ্য পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির দাবী অনুযায়ী ১৯৫০ সন হতে ১৯৮৮ হতে পর্যন্ত ৫.০১ লাখ বাঙ্গালীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে পাকিস্তান আমলে ৬০ হাজার, ৭১ সনের পর আওয়ামী লীগ আমলে ৫০ হাজার, বিএনপি'র আমলে ১ লাখ ৫০ হাজার এবং এরশাদের সময়ে ২ লাখ ৪১

[illegible] Friday (Weekly) : Dhaka : June 3 : 1988.

হাজার বাঙ্গালী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে।[১৬৮] কোন সূত্র হতে জনসংহতি সমিতি এ তথ্য পেয়েছে তা উল্লেখ করেনি এবং জনসংহতি সমিতি এ তথ্যও দেয়নি যে, কত বাঙ্গালী পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পালিয়ে এসেছে।[১৬৯]

এখানে জনসংহতি সমিতি, তার বিদেশী প্রভু এবং স্বদেশী দালালরা পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালীদের বসতি স্থাপনকে এক ধরণের অপকর্ম এবং উপজাতীয় জনগণের সংস্কৃতি তথা অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সরকারী চক্রান্ত বলে অভিহিত করছেন। তারা দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যার স্বল্পতা, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের যেকোন অঞ্চলে যেকোন নাগরিকের বসতি স্থাপন ও জায়গা-জমি ক্রয়ের জন্মগত ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে পতিত ও অব্যবহৃত ভূমিকে অর্থকরী ভূমিতে পরিণত করার জন্য জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি দিক মোটেই বিবেচনায় আনেন নি।

এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যে একেবারেই ছিলনা, তা আমি কিছুতেই অস্বীকার করছি না। পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী উদ্যোগে ব্যাপকহারে বাঙ্গালী বসতি স্থাপনের পরিবেশ বাংলাদেশ সরকার নয়, বরং শান্তিবাহিনীই সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ সরকার জনসংহতি সমিতিকে বার বার শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানানো সত্ত্বেও সন্ত্রাসীপথ ত্যাগ না করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। তৎকালীন সরকার যথার্থ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বাঙ্গালীদের বসতি নির্মাণে উৎসাহ দান করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে যতগুলো পদক্ষেপ নিয়েছিল, সেখানে বাঙ্গালীদের বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা ও তার (আংশিক হলেও) বাস্তবায়ন ছিল সবচেয়ে সাহসী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সিদ্ধান্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামে বারবার ভ্রমণ করে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, দেশের এসব হতভাগ্য বাঙ্গালীরাই এখন পার্বত্য চট্টগ্রাম রক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। আমার বলতে দ্বিধা নেই, এখন পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম যে দু'টো শক্তির অপরিমেয় ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের সাথে সংযুক্ত রয়েছে, তার একটি হলো এসব অবহেলিত ও বঞ্চিত বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারীগণ; আর অন্যটি হলো আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী।

---

[১৬৮] Ibid.

[১৬৯] সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ঃ ঢাকা ঃ ৪র্থ বর্ষ ঃ ২৭ সংখ্যা ঃ ১২-১৮ অক্টোবর ঃ ১৯৯৪।

সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারী এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রত্যাহার করার জন্য যারা দাবী জানাচ্ছে, তারা দেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা তথা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের চরম শত্রু।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের মোট আয়তনের এক দশমাংশ। ১৩টি উপজাতিভুক্ত উপজাতীয় জনগণ হলেন দেশের সমুদয় জনসংখ্যার মাত্র .৪৫%। সুতরাং আয়তনের দৃষ্টিকোণ হতে বিবেচনা করলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-দশমাংশের অর্থাৎ ১ কোটি ২০ লাখ নাগরিকের বসতি থাকা উচিত। দেশের এক-দশমাংশ ভূমি মাত্র .৪৫% বহিরাগত উপজাতিদের ছেড়ে দেয়া এবং সেখানে বাঙ্গালীদের উচ্ছেদ করার দাবী সংবিধান ও স্বাধীনতা বিরোধী।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কারো অজানা নয়। অধিক জনসংখ্যা কবলিত বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমির যথোপযুক্ত ব্যবহার একান্তভাবেই অপরিহার্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালী বসতি নির্মাণের কারণ ব্যাখ্যা করে ১৯৮৩ সনে অনুষ্ঠিত 'জাতিসংঘে আদিবাসী কর্মশিবির' এ জেনেভাস্থ বাংলাদেশ মিশনের জনৈক প্রতিনিধি বলেন ঃ "The People of Bangladesh have to share the available resources in an equitable manner within the severe economic constraints well known to the International Community."।[১১৩] (ভাবানুবাদ ঃ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ভালভাবে অবগত আছেন যে, চরম আর্থিক দুর্দশা-কবলিত বাংলাদেশের জনগণকে প্রাপ্ত সম্পদ সুষমরূপে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হয়।)

বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদের যথাক্রমে ৩৬ ও ৪২ নং ধারায় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দেশের যেকোন অঞ্চলে জনগণকে অবাধে যাতায়াত, বসতি স্থাপন, জমি ক্রয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়ে তোলার মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে। সংবিধানের ঐ ধারা দেখুন ঃ "Every Citizen shall have the right to move freely, to reside and settle in any place therein and to reenter Bangladesh." (ভাবানুবাদ ঃ প্রত্যেক নাগরিকের সমগ্র বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার, বসবাস করার ও বসতি স্থাপন করার, বাংলাদেশ ত্যাগ করার এবং পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশের অধিকার রয়েছে।)

কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীরা এসব শুনতে চায়না। তারা একদিকে বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার মানে না, দেশ ও সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও কাঠামো বদলে দিতে চায়, অন্যদিকে তাদের

---

[১১৩] Quoted by Amnesty International Amnesty International Publication : Eastern Street : London WCIX : DD : United Kingdom : 1986 : 1.7.

দাবীসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও গ্যারান্টি চায়। স্বার্থবাদী স্ববিরোধীতা কাকে বলে? তারা ব্রিটিশ প্রবর্তিত ১৯০০ সানের বিধি পুনর্জ্জীবনের দাবী জানায়, যা বাংলাদেশের স্বার্থ ও সংবিধানের পরিপন্থী।

ব্রিটিশদের প্রবর্তিত অধিকাংশ আইন-বিধি, স্বাধীন সার্বভৌম দেশের স্বার্থের পরিপন্থী বলে সেগুলো বাতিল করে যুগোপযোগী নতুন বিধি প্রবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশের সার্বভৌম অঞ্চলের যেকোন এলাকার ওপর বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনই প্রযোজ্য, অন্য কোন উপনিবেশিক শক্তির ফেলে যাওয়া বিধি অব্যাহত রাখার যৌক্তিকতা নেই। তাছাড়া যে বিধি অর্ধশতাব্দী আগে পাকিস্তান আমলেই বাতিল হয়ে গেছে এবং যা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য পাকিস্তান আমলেই কোন দাবী বা আন্দোলন ছিল না, তা পুনর্জ্জীবিত করতে বাংলাদেশ কোনভাবেই বাধ্য নয়। সর্বোপরি, ঐ বিধির অধিকাংশ শর্ত এখন আর খোদ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগণের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ এই বিধিতে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ও লুসাই পাহাড় (মিজোরাম) ও মায়ানমারের আরাকান পাহাড়ে বসবাসকারী উপজাতিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করার ও বসবাস করার অবাধ সুযোগ দেয়া হয়েছিল। নিঃসন্দেহে কেউই এ শর্ত মেনে নেবেনা। ব্রিটিশরা তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থে যে প্রেক্ষাপটে ম্যানুয়াল চালু করেছিল প্রায় একশ বছর পর সে প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আমরা বাংলাদেশকে টেনে একশ বছর পেছনের দিকে নিয়ে যেতে পারি না। জনসংহতি সমিতি এবং তাদের অনুসারী ও প্রভুদের এ বাস্তবতা মেনে নিতে হবে।

বস্তুতঃ বিশ্বের কোন স্বাধীন দেশই পরাধীনতার যুগে রচিত, প্রবর্তিত, এমনকি সর্বজন স্বীকৃত আইন, আর বিধি, চুক্তি, প্রতিশ্রুতি অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষা করেনা স্বীয় স্বার্থে। এক্ষেত্রে আমরা জনসংহতি সমিতির সহায়ক শক্তি ভারতের দিকে তাকাতে পারি। ভারত কিভাবে ব্রিটিশদের, এমনকি নিজের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, লিখিত চুক্তি প্রভৃতি লঙ্ঘন করছে কিংবা করেছে। এমন কি ভারত কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের শাসনতন্ত্র নিজেই বাস্তবে অস্বীকার করে বহিরাগতদের জন্য নিষিদ্ধ রাজ্যসমূহ বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছেন।

আমি এখানে ভারতের এমন কিছু উপজাতি অধ্যুষিত অঙ্গরাজ্যের অতীত ও বর্তমান অবস্থা তুলে ধরতে চাই, যাতে চাকমা উপজাতির শান্তিকামী অংশ, অন্য ১২টি উপজাতিভুক্ত জনগোষ্ঠী এবং জনসংহতি সমিতির বিপথগামী সন্ত্রাসী ও তাদের শুভ্যানুধ্যায়ীরা পার্বত্য অঞ্চলে বাঙ্গালী বসতি স্থাপন কতখানি স্বাভাবিক ও মানবাধিকার-সংশ্লিষ্ট তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে সবাইকে স্মরণ রাখতে হবে যে, ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম নামক অন্যের ভূ-খন্ডটি দখল করে '৪৭ সনে পাকিস্তানের হাতে তুলে

দেয়নি, যা ১৯৭১ সনে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা লাভ করেছি। আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মনিপুর (ব্রিটিশ শ্যাসিত রাজ্য) প্রভৃতি পররাজ্য ব্রিটিশরা দখল করে যেভাবে ভারতের হাতে তুলে দিয়ে যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম সে ধরণের অঞ্চল নয়। ইহা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে বাংলাদেশের অংশ ছিল। ১৭৫৭ সনে পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজদৌল্লার পরাজয়ের পর মীর জাফর বাংলার নবাব হন। মীর কাশেম আলী খাঁ ইংরেজদের সহযোগিতায় তারই শ্বশুর মীরজাফর আলী খাঁকে অপসারিত করে বাংলার নবাবী লাভের বিনিময়ে বর্ধমান, মেদেনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা এবং নগদ ২ লাখ (তৎকালীন) টাকা ১৭৬০ সনে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করেন। এ ঘটনার ১০০ বছর পর ১৮৬০ সনে ব্রিটিশ শাসকরা চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলকে চট্টগ্রাম হতে বিচ্ছিন্ন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামক নতুন জেলা গঠন করে।

এখানে উপমহাদেশের অন্য দু'টি অঞ্চলের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে চাই, যাতে চাকমাদের শান্তিকামী অংশটি তথাকথিত ম্যানুয়ালের অসারতা অনুধাবন করতে পারেন।

ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং কাশ্মীরের মহারাজা ১৮০০ সালে পাঞ্জাবের অমৃতসারে এক চুক্তিতে সই করেন। ঐ চুক্তিতে 'কাশ্মীর কাশ্মীরীদের' বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়। অর্থাৎ কাশ্মীরে কোন অকাশ্মীরী প্রবেশ করতে পারবে না। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অব্যবহিত পরে ভারত সরকার চক্রান্তমূলকভাবে কাশ্মীরের দুই তৃতীয়াংশ এলাকা দখল করে নেয়। কাশ্মীরীরা এই দখলাদারিত্বকে কখনো মেনে নেয়নি। জাতিসংঘ কাশ্মীরকে বিতর্কিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে সেখানে গণভোট অনুষ্ঠানের রায় দিয়েছে এবং ভারত সে রায় মেনে নিয়েছে। কিন্তু ভারত কশ্মীরে তার প্রতিশ্রুত গণভোটের ব্যবস্থা না করে অস্ত্রের সাহায্যে অবৈধ দখল অব্যাহত রেখেছে। তা সত্ত্বেও ভারত তার সংবিধানের ৩৭০ ধারায় কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে কাশ্মীরে অকাশ্মীরীদের প্রবেশ, বসতি স্থাপন, জমি বা অন্য কোন ধরণের সম্পত্তি ক্রয় নিষিদ্ধ করেছে। তা সত্ত্বেও কাশ্মীরে বিপুল সংখ্যক অকাশ্মীরী বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটেছ। ১৯৪৭ সালে কাশ্মীরে ৯৭% অধিবাসীই ছিল মুসলমান। এখন কাশ্মীরে মাত্র ৫৬% অধিবাসী মুসলমান। অবৈধ দখল হওয়া সত্ত্বেও এবং শাসনতান্ত্রিক নিষেধাজ্ঞা থাকার পরেও ভারত সরকার তার নাগরিকদের কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে পারেনি কিংবা বন্ধ করতে সচেষ্ট হয়নি।

বাংলাদেশতো পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধ দখলদারী শক্তি নয়। আমাদের সংবিধান পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশীদের প্রবেশ, বসতি স্থাপন, জমি কিংবা সম্পত্তি ক্রয় নিষিদ্ধ করেনি। বিশ্বের কোন দেশই তার সার্বভৌম ভূ-খন্ডের কোন

অঞ্চলে তার নাগরিকদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার কিংবা বসতি স্থাপনের মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত করতে পারেনা।

সান্টু লারমা তথা চাকমা সন্ত্রাসীরা ভারতের যে রাজ্যে বসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন, সে ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে তাকানো যাক। ত্রিপুরার আদি অধিবাসী হলো উপজাতি সম্প্রদায়। সেখানে মোট ১৯টি উপজাতি বাস করে। ১৯৪৭ সনে ত্রিপুরার মোট অধিবাসীদের শতকরা ৯৩ জন ছিল উপজাতি। ১৯৮০ সালে এদের শতকরা হার ২৮.৫ এ নেমে আসে। ১৯৫১ সনের আদম শুমারী অনুযায়ী ত্রিপুরার জনসংখ্যা ছিল ৬ লাখ ৪৬ হাজার। ব্যাপক হারে অউপজাতি ভারতীয়দের ত্রিপুরা রাজ্যে বসতি স্থাপনের ফলে জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২০,৪৭,৩৫১ জনে। ১৯৮০ সনে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় মোট ১ লাখ ১০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে উপজাতিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪,৮৮৫ জন।[১১১] ঐ সময়ে ত্রিপুরা বিধান সভার মোট ৬০ জন সদস্যদের মধ্যে উপজাতি সম্প্রদায়ভূক্ত সদস্য ছিলেন মাত্র ৬ জন।

উপরোক্ত তথ্যের আলোকে শান্তিবাহিনী, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা কাশ্মীর ও ত্রিপুরা রাজ্যের ৫০ বছর আগেকার এবং বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে যে ব্যাপক তারতম্য সৃষ্টি হয়েছে আশা করি তার বাস্তবতা অনুধাবন করতে পেরেছেন। আমি যে পরিসংখ্যান উপরে দেখিয়েছি সেগুলো কমপক্ষে ১৭ বছরের পুরানো। সুতরাং বিগত ১৭ বছরে কাশ্মীর ত্রিপুরায় যে আরো বহু সংখ্যক অউপজাতীয় প্রবেশ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু ত্রিপুরায় নয়, আসাম, মেঘালয়, মনিপুর ইত্যাদি রাজ্যে ভারতের অন্যান্য রাজ্য হতে বহিরাগতরা এসে বসতি স্থাপন করেছে। একটি স্বাধীন দেশের ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কারণে মানুষ স্থানান্তরিত হয়। এই স্থানান্তর প্রক্রিয়া এমন আইন করে বন্ধ করা যায় না যা নাগরিকের মানবিক অধিকারকে ক্ষুন্ন করে। আর বন্ধ করা যায় না, বলেই চাকমাসহ অন্যান্য উপজাতিরা অজানা স্থান হতে বিতাড়িত হয়ে বা স্বেচ্ছায় আমাদের জনপদে আশ্রয় নিয়েছিল।

এখন হয়তো এক দেশের নাগরিক অন্য দেশে গিয়ে আগের মতো অবাধে বসতি স্থাপন করতে পারে না। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে জনগণের স্বেচ্ছায় স্থানান্তর অতি স্বাভাবিক এবং আইনসিদ্ধ ব্যাপার। জনসংখ্যার চাপে, জীবিকার অন্বেষণে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করবে - ইহাই স্বাভাবিক। ■

---

[১১১] India Today : New Delhi : February 16-29 : 1980 P.41.

গুচ্ছগ্রামের করুণদশা

শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী-খুনীদের উপর্যুপরি হামলা হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারীদের নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ৯৭টি গুচ্ছগ্রামে অস্থায়ীভাবে সরিয়ে আনা হয়। ১৯৮৮ সন হতে গুচ্ছগ্রামবাসীরা বাস্তব অর্থে স্বদেশেই বন্দী জীবন যাপন করছেন। তাদের দুর্বিসহ জীবন, অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ও সীমাহীন দুর্ভোগ গুচ্ছগ্রামকে বন্দীশালায় পরিণত করেছে।

সব গুচ্ছগ্রাম ঢাকার বস্তিএলাকা থেকেও নিকৃষ্টতম। ক্ষুদ্র পরিসরের ছনের ঝুপড়িতে ৬/৭ জন সদস্যবিশিষ্ট এক একটি পরিবারকে ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয়।

গুচ্ছগ্রামের অধিবাসীরা তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা ক্ষুদ্র চৌহদ্দীর বাইরে যেতে পারেনা। বিশেষ লিখিত অনুমতি নিয়ে কেউ চৌহদ্দীর বাইরে গেলেও তাদেরকে বিকেল ৫টার মধ্যে অবশ্যই চৌহদ্দী এলাকায় ফিরে আসতে হবে। এই নিয়ম ভঙ্গ করলে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। সপ্তাহে ২/১ দিন নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ ব্যবস্থপনায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদেরকে নিকটস্থ হাট বাজারে যেতে দেয়া হয়। তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা, চাষাবাদ কিংবা অর্থ উপার্জনশীল কোন কাজই করতে পারে না।

নিজেদের জন্য বরাদ্দকৃত ভূমি হতে উচ্ছেদ করায় খাগড়াছড়ি জেলার ৭২ টি গুচ্ছগ্রামের প্রায় তিন লাখ বাঙালী এখন একেবারে বেকার ও অলস জীবন যাপন করছেন। প্রতিমাসে সরকার গুচ্ছগ্রামসমূহে পরিবার পিছু ৭৮ কেজি গম রেশন হিসেবে দিয়ে থাকেন।

পরিবারের সদস্য সংখ্যা যা-ই হোক না কেন এই ৭৮ কেজি গমই তাদের একমাত্র সম্বল। এই গম দিয়ে তাদেরকে একমাসের খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়। তেল, নুন, তরকারী, মাছ-গোশত, কাপড়-চোপড়, ঔষধ-পত্র প্রভৃতি ক্রয়ের একমাত্র উপায় হলো এই গম। সুতরাং সহজেই অনুমেয় ৬/৭ জন কিংবা তারও বেশী সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের একটি মাস চালানোর জন্য এই গম কত অকিঞ্চিতকর। ছেলে-মেয়েদের পরনে কাপড় নেই, বয়স্কদের কাপড় ছিঁড়ে গেছে। মহিলারা ঝুপড়ির বাইরে যেতে পারেন না কাপড়ের অভাবে। অনাহারে অর্ধাহারে গুচ্ছগ্রামবাসীদের জীবনীশক্তি দিন দিন লোপ পাচ্ছে। অনাহারে ও অপুষ্টির কারণে তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগের সম্মুখীন রেশন কার্ডবিহীন নতুন পরিবার, যারা যৌথ

পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একক পরিবার গঠন করেছে। এ ধরণের সাড়ে বার হাজার পরিবারের সদস্যরা কোন রেশন বা অন্যকোন সাহায্য সরকারের কাছ থেকে পায়না। সরজমিন তদন্তে দেখা গেছে রেশন কার্ডধারী ২৬ হাজার পরিবার তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ৮৪ কেজি গম না নিয়ে ৭৮ কেজি নেয়। বাকী ছয় কেজি তারা সাড়ে বার হাজার কার্ডবিহীন পরিবারের জন্য দান করে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিয়ে এবং নতুন সন্তান জন্ম হবার কারণে পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেড়ে গেলেও রেশনের পরিমাণ বাড়ানো হয় না। ফলে কার্ডবিহীন সাড়ে বার হাজার পরিবারের সদস্যদের তো বটেই কার্ডধারী ২৬ হাজার পরিবারকেও অনেক সময় না খেয়ে থাকতে হয়। অনেক সময় এরা পাহাড়ী আলু, বাঁশের কোর, বনজ ফল খেয়ে জীবন ধারণ করে। ফলে অপুষ্টিজনিত কারণে তারা নানা দুরারোগ্যে ভোগে।

গুচ্ছগ্রামের বন্দীজীবন পদ্ধতি সরকারের জন্য চিরন্তন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারীভাবে প্রাপ্ত তথ্য মতে গুচ্ছগ্রামে রেশনিং এর জন্য প্রতিমাসে প্রায় ১ হাজার ৮ শত টন খাবার সরবরাহ করতে হয়। পুরানো হিসেব মতে ১৯৮৮ সাল হতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তিন বছরের কম সময়ে গুচ্ছগ্রামে খাবার সরবরাহ করতে ২ শত কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হবার (মার্চ ১৯৯৭ইং) সময় পর্যন্ত খরচের পরিমাণ ৫ শত কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায় বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিপুল অর্থ ব্যয় করে বাঙ্গালীদের অকর্মণ্য-অলসই রাখা হলো, তাদেরকে অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করা যায়নি।

গুচ্ছগ্রামের গৃহগুলো অপরিচ্ছন্ন। একটি কুঁড়ে ঘরের সাথেই আর একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। আলো-বাতাস প্রবেশের কোন সুযোগ নেই। কোন স্বাস্থ্য-সুবিধা বা চিকিৎসা কেন্দ্রও এসব গুচ্ছগ্রামে নেই। কোন নলকূপ না থাকায় গুচ্ছগ্রামবাসীরা পাহাড়ী ঝরণা, কিংবা নালার পানির ওপর নির্ভরশীল। দূষিত পানি পান করে তারা নানা ধরণের পেটের অসুখ, খোঁস-পাঁচড়ায় ভোগে। মশার কামড় কিংবা অজ্ঞাত কারণে অধিকাংশ গুচ্ছগ্রাম ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। ম্যালেরিয়া নিবারণ কিংবা চিকিৎসার জন্য সরকারের কোন উদ্যোগ নেই।

পাকা পায়খানা কিংবা নির্দিষ্ট পায়খানার ব্যবস্থা না থাকায় গুচ্ছগ্রামবাসীদের যত্রতত্র মল-মূত্র পরিত্যাগ করতে হয়। এতে পরিবেশ কিভাবে দূষিত হচ্ছে, তা সহজে অনুমান করা যায়।

গুচ্ছগ্রামে স্কুলগামী বয়সের ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়ার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে এখানকার শিশুরা অশিক্ষিত থেকে যাচ্ছে । তারা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে কোন কোন গুচ্ছগ্রামে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। কোন কোন

গুচ্ছগ্রামে স্ব-উদ্যোগে মসজিদ-মাদ্রাসা গড়ে ওঠেছে। এসব ক্ষেত্রে সরকারের কোন উদ্যোগ নেই।

গুচ্ছগ্রামবাসীরা একেবারে বেকার জীবন যাপন করছেন। তারা তাদের বরাদ্দকৃত জমিতে যে বাগান গড়ে তুলেছিল তাদেরকে সরকার সেখানে যেতে দিচ্ছেনা। ফলে সে বাগান আগাছায় ভরে যাচ্ছে, কিংবা জুমচাষের জন্য জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে অথবা উপজাতীয়রা দখল করে নিচ্ছে।

গুচ্ছ গ্রামবাসীরা গুচ্ছগ্রামে থাকতে মোটেই ইচ্ছুক নয়। তারা এই বন্দী ও অনিশ্চিত জীবনের অবসান চায়। তাদের দাবী, তাদেরকে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত বাড়ী ও জমিতে যেতে দেয়া হোক। তারা সরকারী খয়রাতি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বনির্ভর হতে চায়। তারা মনে করে তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ীতে যেতে দেয়া হলে প্রায় ২ লাখ লোক পুনরায় কর্মমুখর হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে। ঐ অঞ্চলে সন্ত্রাসী কার্যক্রম হ্রাসে বাঙ্গালীরা বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তবে সরকারী কর্মকর্তারা নিরাপত্তার কারণে বাঙ্গালীদের গুচ্ছগ্রামে রাখার পক্ষপাতি। কিন্তু গুচ্ছগ্রামবাসীদের যুক্তি হলো ঃ গুচ্ছ গ্রামেও তারা নিরাপদ নয়। কারণ শান্তিবাহিনী বেশ কয়েকবার গুচ্ছগ্রামে হামলা চালিয়ে বাঙ্গালীদের হত্যা করেছিল। তাদের মতে সরকারী নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি আত্মনিরাপত্তার ব্যবস্থা গড়ে তুললেই তারা তাদের ঘর-বাড়ীতে ফিরে যেতে পারেন। তাদের মতে যুদ্ধের ময়দানে পালিয়ে জীবন বাঁচানো কাপুরুষের লক্ষণ। যথোপযুক্ত সুযোগ পেলে কেবল বেসামরিক বাঙ্গালী ও উপজাতীয়রাই শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করতে সক্ষম। তারা মনে করেন এই উদ্দেশ্যে ভিলেজ ডিফেন্স পুলিশ (ভিডিপি)-কে শক্তিশালী করা হলে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হতে পারে। তারা হিসেব কষে দেখিয়েছেন যে, যদি মাত্র ৩৫ হাজার ভিডিপি সদস্য-সম্বলিত বাহিনী গড়ে তোলা যায়, তবে ৩৮ হাজার পরিবারকে রেশন হিসেবে প্রদত্ত গমের দামের চেয়ে কয়েক গুণ কম ব্যয় হবে। এর ফলে প্রতিটি বাঙালী পরিবার স্বনির্ভর হয়ে উঠবে এবং পতিত পাহাড়ী জমি উৎপাদনশীল ভূমিতে পরিণত হবে। ■

বৈষম্যের শিকার

সারা বিশ্বে সম্ভবতঃ বাংলাদেশই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে উপজাতীয় জনগোষ্ঠী দেশের মূল অধিবাসীদের অনেকখানি পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তুলনামূলকভাবে অধিক অর্থ ব্যয় ছাড়াও উপজাতীয়দের বৈষম্যমূলক ছাড় দেওয়া হয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো পার্বত্য উপজাতীয়রা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে পার্বত্যবাসী বাঙ্গালীরা সেসবের কিছুই পায়না, যদিও বাঙ্গালীরা পার্বত্য অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এবং আর্থ-সামাজিক-শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা উপজাতীয়দের তুলনায় অকেনখানি পিছিয়ে। উপজাতীয়দের যেসব ছাড় দেয়া হচ্ছে তাদের দিকে তাকানো যাক।

উপজাতি সম্প্রদায়সমূহের যেকোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশের যেকোন স্থানে বিনা বাধায় ভূমি ক্রয়, বাড়ী-ঘর নির্মাণসহ স্থায়ীভাবে বসবাস করার নাগরিক অধিকার ভোগ করে। কিন্তু কোন বাঙ্গালী পার্বত্য চট্টগ্রামে তার নাগরিক বা শাসনতান্ত্রিক অধিকার অনুযায়ী অবাধে এবং সহজে জায়গা-জমি ক্রয় করতে পারে না। এমনকি পার্বত্যবাসী বাঙ্গালীরাও এ বৈষম্যের শিকার। কোন বাঙ্গালীকে জমি ক্রয় করতে হলে সম্ভাব্য উপজাতীয় বিক্রেতার হেডম্যান, স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান এবং বিক্রেতা যে সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত সে সার্কেলের রাজার অনুমোদন থাকতে হবে, যা পাওয়া মোটেই সহজ নয়। এ ধরণের শর্তারোপ বাঙ্গালীদের জন্য পার্বত্যঞ্চলে জমি ক্রয়কে মূলতঃ নিষিদ্ধই করেছে। এ ধরণের ব্যবস্থা কেবল বৈষম্য দোষেই দুষ্ট নয়, বরং স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে যেকোন নাগরিকের যেকোন স্থানে বসবাস করার শ্বাশত নাগরিক ও জন্মগত অধিকারের পরিপন্থী। এই বৈষম্যমূলক নিষেধাজ্ঞার ফলে বাঙ্গালীরা পার্বত্য অঞ্চলে জমি ক্রয়, তথা বসবাস করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙ্গালী ব্যবসায়ী, কৃষক, বা চাকরীজীবীদের আয়কর প্রদান করতে হয়। কিন্তু এসব পেশায় নিয়োজিত উপজাতীয়দের কোন আয়কর প্রদান করতে হয় না।

উপজাতীয় শিক্ষার্থীরা সরকারী বৃত্তি ছাড়াও সামান্যতম কৃতিত্বের কারণে অথবা দারিদ্রের অজুহাতে, এমনকি, কোন সঙ্গত কারণ ছাড়াই কেবল উপজাতীয় হবার সুবাধে স্থানীয় সরকার পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রভৃতি সূত্র হতে বৃত্তি নামক মোটা অংকের অর্থ পেয়ে থাকে। এছাড়া জেলা ও

থানা প্রশাসন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কাছ থেকেও অর্থ পেয়ে থাকে। অথচ বাঙ্গালী শিক্ষার্থীরা এ ধরনের সুবিধা হতে বলতে গেলে বঞ্চিত।

উপজাতীয় শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা এতো আকর্ষণীয় যে, তা যেকোন ব্যক্তির দৃষ্টিতে পড়ার কথা। চিটাগাং হিল ট্রাক্টস কমিশনের কাছে এ প্রসঙ্গে নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে জনৈক সেনা কর্মকর্তা বলেছেন ঃ

"Sometimes I myself would like to be a tribal. All expenses are paid by the Government. Food. cloths. pens. books. medicine, everything. They get it all through the schools".[১১২]

(ভাবানুবাদ ঃ কখনো কখনো আমারই উপজাতীয় হতে ইচ্ছে করে। (তাদের) সব খরচই সরকার বহন করে। খাবার, পোশাক, কলম, বই-পত্র, ঔষধ প্রভৃতি তারা বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই পেয়ে থাকে।)

উপজাতীয়রা যেন-তেন প্রকারের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী স্বায়ত্বশাসিত দফতরে চাকরি পায়। অথচ বাঙ্গালীরা উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নিয়েও চাকরি পায় না। চাকরির ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের জন্য শিক্ষগত যোগ্যতা শিথিল করা হয়েছে। যে চাকরির জন্য বাঙ্গালীদেরকে কমপক্ষে ডিগ্রী পাস হতে হয়, সে ক্ষেত্রে উপজাতীয়রা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস হলেই চলে। উপজাতীয়রা মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে যে চাকরি পায়, তা পেতে বাঙ্গালীদের উচ্চ মাধ্যমিক পাস করতে হয়। জাতীয় চাকরির ৫% উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত। কোন কোন চাকরির ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের বয়স সীমা ৫ থেকে ১০ বছর বাড়ানো হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের ছাড় এবং সুযোগ ব্যবহার করে ১৯৮৪ থেকে ১৯৯০ সন পর্যন্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ২,৩৪৩ জন উপজাতীয় চাকরি পেয়েছে, সে হারে পার্বত্যবাসী বাঙ্গালীরা কোন চাকরিই পায়নি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারেও উপজাতীদের অবাঞ্চিত ছাড় দেওয়া হয়েছে। উপজাতীয় শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মার্কস নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সুযোগ পাচ্ছে, অথচ বাঙ্গালী শিক্ষার্থীরা ষ্টার মার্কস পেয়েও ভর্তি হতে পারে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দেশের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ও সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য বেশ কিছু আসন সংরক্ষিত আছে । অথচ সেখানে বসবাসকারী বাঙালী শিক্ষার্থী এ ধরণের সুবিধা হতে বঞ্চিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২টি, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ১২টি, ডেন্টাল

---

[১১২] Life is not ours. P.104.

কলেজে ১টি, প্রকৌশল কলেজে ৪টি, প্রকৌশলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি, বিআইটি (চট্টগ্রাম) ২টি, বিআইটি (রাজশাহী) ২টি, কারিগরি বিদ্যালয় (রাঙ্গামাটি) ১০টি, কারিগরি বিদ্যালয়ে ৩০টি (চট্টগ্রামে ৫, রাঙ্গামাটি ১০, ফেনী ৫, কুমিল্লা ৫ ও সিলেট ৫), কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৩টি, কৃষি কলেজে (ঢাকা) ৩টি, প্যারা মেডিকেল কলেজে (রাঙ্গামাটি) প্রতি বছরের শূন্য আসনের ২০%, ফৌজদার হাট ক্যাডেট কলেজে ১টি, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজে ১টি, সিলেট ক্যাডেট কলেজে ১টি, মহিলা ক্যাডেট কলেজে ৩টি আসন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত। এ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার জন্য বাঙ্গালী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। প্রতি বছর উচ্চতর মেধাসম্পন্ন বহু বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রী এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার সুযোগ পায়না। অথচ তাদের তুলনায় অনেক কম মেধাসম্পন্ন উপজাতীয় শিক্ষার্থী সহজেই এ সব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার সুযোগ পাচ্ছে।

১৯৮৪-৮৫ শিক্ষা বর্ষ হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য দেশের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও বেশ কয়েক বছর ওখানে বসবাসকারী বাঙ্গালীরা ঐ সুযোগ পায়নি, যদিও বাঙ্গালীরা সম্প্রদায় হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু। অনেক আবেদন-নিবেদনের পর ১৯৯২-৯৩ শিক্ষা বর্ষ হতে বাঙ্গালীদেরকে জনসংখ্যানুপাতে সংরক্ষিত আসনে ভর্তির সুযোগ দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে বাঙ্গালীরা সে সুযোগ পাচ্ছে না। ১৯৯১-৯২ হতে ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত সর্বমোট ১২৭জন পার্বত্যবাসী শিক্ষার্থী ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার সুযোগ পায়। এদের মধ্যে মাত্র ১১ জন শিক্ষার্থী ছিল বাঙ্গালী। অথচ বাঙ্গালীরা যদি মোট জনসখ্যার ৪৮ শতাংশেও হয়ে থাকে (আসলে ৪৮.৫৭%),[১১৩] তবে প্রায় ৬১ জন বাঙ্গালী শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবার কথা। অর্থাৎ ৫০ জন বাঙ্গালী শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করে তাদের স্থানে উপজাতীয়দের ভর্তি হবার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনা প্রবাহের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখেন এমন একজন পর্যবেক্ষক-বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগত আলাপ-চারিতায় অধ্যয়নরত উপজাতীয় শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তার মতে এদের প্রায় সবাই সরকারের বিভিন্ন সূত্র হতে বৃত্তিসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও এদের কার্যক্রম বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। তিনি বলেন যে, ঢাকায় এরা পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের লড়াকু কর্মী, পার্বত্য চট্টগ্রামের শহরাঞ্চলে

---

[১১৩] দৈনিক সংগ্রাম ঃ জানুয়ারী, ১৯৯৭।

চাঁদা সংগ্রহকারী, থানা পর্যায়ে এ্যারিয়া কমন্ডার বা বড় বাবু, জঙ্গলে গেলে শান্তিবাহিনী। সরকারী সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় এদের অনেকেই আত্মসমর্পণ করে। ক'দিন পর আবার শান্তিবাহিনীতে চলে যায়। ভিন্ন নামে, ভিন্ন পরিচয়ে হয়তো আবার আত্মসমর্পণের নামে সরকারী অর্থ ও সুযোগ-সুবিধা হাতড়িয়ে নেয়। তিনি শিক্ষাঙ্গনে উপজাতীয়দের প্রদত্ত সব ধরণের বৃত্তি ও সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করার পক্ষপাতী।

সারা বাংলাদেশে ব্যাংক ঋণের বার্ষিক সুদ শতকরা ১৬ টাকা। অথচ পার্বত্য উপজাতীয় জনগণের জন্য সুদের হার মাত্র ৫%। পার্বত্যবাসী বাঙ্গালীদের ক্ষেত্রেও সুদের হার ১৬%। পার্বত্যবাসী বাঙ্গালীদের আয়কর দিতে হয়, উপজাতীয়দের দিতে হয়না।

ঠিকাদারী, কাঠের পারমিটসহ সব ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্যের সিংহভাগ উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দ দু'লাখ টাকার মধ্যে, সেগুলোর ঠিকাদারী সম্পূর্ণরূপে উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত। দু'লাখ টাকার উর্ধে বরাদ্দকৃত প্রকল্পসমূহের ১০% উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত। বাকী ৯০% ঠিকাদারীর সিংহ ভাগ তারা উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দখল করে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ওপর নানা ধরণের চাপ প্রয়োগ করে ভয়-ভীতি দেখিয়ে কোন কোন উপজাতীয় ঠিকাদার বলতে গেলে ঠিকাদারী ছিনিয়ে নেয়। এধরণের অপকর্মে তারা পাহাড়ী ছাত্র-পরিষদের জঙ্গী কর্মী, এমনকি শান্তিবাহিনীকে ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে।

জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানের পদটি উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত হওয়ায় এবং ৩০ জন সদস্যের মধ্যে বাঙ্গালীদের প্রতিনিধিত্ব এক তৃতীয়াংশ (১০ জন) করায় বাঙ্গালীরা যে সর্ব বিষয়ে উপজাতীয়দের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে, তা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

এ ভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগে বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে সারাদেশের বাঙ্গালীদের বিশেষতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙ্গালীদেরকে উপজাতীয়দের পেছনে ফেলে দেয়ার ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা মনে করেন এই ধরণের তোয়াজ করে উপজাতীয়দের সুবিধাভোগী ও শক্তিশালী শ্রেণীতে পরিণত করলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এমনিতেই থেমে যাবে । কিন্তু ইহা সত্যি নয়। বিচ্ছিন্ন-প্রবণ এলাকার অধিবাসীদে [illegible] ক-রাজনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হলে জনগণের একটি অং [illegible] পারে যে, বিচ্ছিন্ন হলে তাদের অবস্থা আরো সমৃদ্ধতর হবে। [illegible] রণের পরিস্থিতিতে বিদ্রোহীরা জনগণের কাছ হতে আর্থিক

সহযোগিতা পেয়ে থাকে। জনগণের মধ্যে হতে বিদ্রোহীদের আশ্রয়, খাদ্য, অর্থ এবং অন্যান্য ধরণের সমর্থন প্রদান তখনই সম্ভব হয় যখন জনগণের আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়াদি সচ্ছল থাকে। বাংলাদেশ সরকার দেশের ৯৫.৫৫% জনগণকে বঞ্চিত রেখে মাত্র .৪৫ উপজাতিকে সচ্ছল করে দেশকে মূলতঃ বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের প্রদত্ত অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রতি ইঙ্গিত-সম্বলিত জনৈক সেনা অফিসারের মন্তব্য উদ্ধৃত করে চিটাগাং হিল ট্রাক্টস কমিশন জানিয়েছেন ঃ

"Poor little Bangladesh ... In many ways the tribals here in the CHT are much better off them the people int he plains ... There are many more roads here than in the plains. Here ... there is electricity in all places. This is not the case in 60 per cent of Bangladesh. ... Those students who have spoken to you, all are speaking against us. but 50 per cent of them take scholarship from us."[১১১]

(ভাবানুবাদ ঃ ক্ষুদ্র ও দরিদ্র বাংলাদেশ। ... পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা সমতলবাসীদের চেয়ে অনেকক্ষেত্রে উন্নততর অবস্থায় রয়েছে। এখানে প্রায় সবস্থানেই বিদ্যুতের ব্যবস্থা রয়েছে। অথচ বাংলাদেশের অন্যত্র ৬০% অঞ্চলেই এ সুবিধা নেই। ... যেসব ছাত্র আপনাদের সাথে কথা বলেছে, তাদের সবাই আমাদের বিরুদ্ধে বলেছে অথচ তাদের ৫০% আমাদের কাছ হতে বৃত্তি পেয়ে থাকে।)

গত ২৫ বছরে পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপক অর্থ ব্যয় করে উপজাতীয়দের বিভিন্নভাবে ছাড় দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন স্তিমিত করতে সরকার ব্যর্থই হয়েছেন। ছাড় দিয়ে, বিশেষতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙ্গালীদের দুর্বল অবস্থানে রেখে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমন করা যাবেনা। এজন্য প্রয়োজন বাঙ্গালীদের সর্বক্ষেত্রে শক্তিশালী অবস্থানে রাখা। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে দুর্বল করতে হলে বাঙ্গালীদের অবস্থার পরিবর্তন ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। বর্তমানে বাঙ্গালীদেরকে হত-দরিদ্র এবং বিদ্রোহীদের বলির পাটা হিসেবে গুচ্ছগ্রামে মূলতঃ বন্দী রাখা হয়েছে, যাতে মাঝে মাঝে শান্তিবাহিনীর উদ্দেশ্যে তাদেরকে উৎসর্গ করা যায়। বাঙ্গালীদের গুচ্ছগ্রামে বন্দী রাখলে চলবে না, তাদেরকে সম-অধিকার ও সুযোগ দিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে পার্বত্য অঞ্চলের সর্বত্র, তবেই বিচ্ছিন্নতাবাদ স্তিমিত হবে। ■

---

[১১১] Life is not ours : P.104.

উচ্ছেদ করার চক্রান্ত

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখন্ডতা সংরক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পদক্ষেপ হিসেবে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালীদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। ১৯৭১ সনে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালীদের বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করা হলেও প্রকাশ্যে সরকারী উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে বিএনপি আমলে সরকারী উদ্যোগে বাঙ্গালীদের পার্বত্য অঞ্চলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

পার্বত্য অঞ্চলে বাঙ্গালীদের পুনর্বাসনের অন্যতম লক্ষ্য হলো সেখানকার বিপুল পতিত জমিকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগানো। পার্বত্যবাসীরা জুম্মচাষের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের বিপুল পতিত ভূমি এবং বন-জঙ্গলকে অর্থবহ কাজে লাগাতে পারেনি। অথচ সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মঠ জনশক্তি নিয়োগ করলে পার্বত্য অঞ্চল দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এই লক্ষ্যার্জনের উদ্দেশ্য সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রধানতঃ কৃষিজীবী পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

সরকার প্রতিটি পুনর্বাসিত পরিবারকে মোট ৫ একর বন-জঙ্গল-সম্বলিত পাহাড়ী খাস জমি প্রদান করে। এর মধ্যে বাসগৃহ নির্মাণের জন্য .২৫ শতাংশ জমি একস্থানে এবং বাকী ৪.৭৫ একর জমি বাসগৃহ থেকে ৩ মাইল দূরে দেয়া হয়।

পুনর্বাসিত বাঙালীরা জানিয়েছে সরকারী কর্মকর্তারা জমি বুঝিয়ে দখলীস্বত্ব দিয়ে এসেছিলেন। কিছু কিছু পরিবার তাদের নামে বরাদ্দকৃত ভূমি বন্দোবস্তের দলিল-পত্র পেয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ পরিবারকে দলিল-পত্র প্রদান প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকাকালীন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আগুন লাগার অজুহাতে সব নথিপত্র পুড়ে গেছে বলে দাবী করা হয়। বাঙ্গালীদের অভিযোগ চক্রান্তমূলকভাবেই মহল বিশেষের চক্রান্তে ঐ কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ ঘটানো হয় মূলতঃ বাঙ্গালীদের জমি বন্দো[illegible] সংক্রান্ত নথিপত্র ধ্বংস করার জন্য।

বরাদ্দক[illegible] [illegible]ন-জঙ্গল কেটে বাঙ্গালীরা সেখানে ফলমূল ও মূল্যবান কা[illegible] [illegible]রী করেন। অনেকেই ব্যাংক ঋণ নেয় বাগান সাজানোর জন[illegible] [illegible]শায় বুক বেঁধে সব প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে নিঝুম বনভূমিতে [illegible]না করেন। কিন্তু বাঙ্গালীদের লাগানো ফল গাছে ফল ধরতে শুরু [illegible] বসতি স্থাপনকারীদের নামে বরাদ্দকৃত বসতবাড়ী এবং বাগান হতে

তাদেরকে গুচ্ছগ্রামে এনে মূলতঃ বন্দী করে রাখে। বাঙ্গালীদের নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে তাদেরকে তাদের বসতবাড়ী কিংবা বাগানে যেতে দেয়া হয়না। ফলে পরিচর্যার অভাবে তাদের বাগান হয়তো পুনরায় ঝোপ-জঙ্গলে ভরে গেছে, অথবা উপজাতীয়রা সেগুলো কেটে নিয়ে গেছে কিংবা বাগান দখল করে নিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার বসতিকারীদেরকে দিয়ে তাদের তৈরী বাগান ধ্বংস করিয়েছেন। শালবন গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দা সোবহান মিয়া জানিয়েছেন যে, তাকে দেয়া জমিতে তিনি ১০ হাজার আনারস গাছ এবং ১১ হাজার কলাগাছ লাগিয়েছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাচ্ছন্দ্যময় নতুন জীবনের। কিন্তু গুচ্ছগ্রামে এসে সবকিছু হারালেন।[১১৫]

সোবহান মিয়ার মতো অনেকের স্বপ্নই ধূলিস্মাৎ হয়ে যায় গুচ্ছগ্রামে এসে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ও দুঃখের ব্যাপার হলো, যেসব বাঙ্গালীকে বসতবাড়ী এবং বাগান হতে উচ্ছেদ হবার পরেও তাদেরকে ঋণ পরিশোধের জন্য সার্টিফিকেট মামলা, ক্রোক, গ্রেফতার, জেল-জরিমানার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বসতিকারীদের অভিযোগ সরকার বাঙ্গালীদের উচ্ছেদ করে কোন ক্ষতিপূরণ দেয়নি, তাদের বাগান রক্ষা করেনি। কিংবা কবে নাগাদ তাদেরকে নিজস্ব বাড়ী-ঘর-বাগানে ফেরত যেতে দেয়া হবে সে সংক্রান্ত ব্যবস্থা না করে তাদেরকে স্বদেশেই উদ্বাস্তুতে পরিণত করেছেন। তাদের দাবী তাদেরকে অবিলম্বে তাদের ঘর-বাড়ীতে ফিরে যেতে দেয়া হোক। তারা খয়রাতি সাহায্যে বাঁচতে চায় না। বরং পরিশ্রম করে তারাই সরকারী কোষাগারে অর্থ যোগান দিতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

সরকারের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও দৃঢ় নীতির অভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি ব্যবস্থা দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে বাঙালীদের নামে বন্দোবস্তকৃত কিছু জমি একশ্রেণীর অসাধু কর্মচারীর যোগ সাজশে উপজাতীয়দের নামে পুনরায় বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। ফলে উপজাতীয় ও অউপজাতীয়দের মধ্যে ভূমি-বিরোধ চরম এবং চিরন্তন রূপ নিতে পারে বলে বাঙ্গালী-পাহাড়ী উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা জানিয়েছে।

বাঙ্গালীদের নামে বন্দোবস্তকৃত এব[illegible]কৃ জমিতে বন বিভাগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে উপজা[illegible]নের লক্ষ্যে রাবার বাগান করা হয়েছে। কিন্তু বাঙ্গালীদের ফলের কিংবা [illegible]ধ্বংস করার

১১৫ দৈনিক পূর্বকোণ ঃ চট্টগ্রাম ঃ ৮ মার্চ, ১৯৯১।

জন্য তাদেরকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দেয়া হচ্ছে না কিংবা তাদের জমির পরিবর্তে নতুন জমিও দেয়া হচ্ছে না। ফলে হাজার হাজার পরিবার ইতোমধ্যেই ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে।

হেডম্যান কারবারীর সুপারিশ অথবা তাদের উপস্থিতিতে পাহাড়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কোন কোন বাঙ্গালী উপজাতীয়দের নিকট হতে জমি কিনেছিল। দীর্ঘ দিন যাবত ভোগ দখল করার পর ভারত হতে আগত উপজাতীয়রা তাদের বিক্রীত জমি তাদের বলেই দাবী করছে।

এমন অভিযোগও রয়েছে যে, স্থানীয় প্রশাসন কাগজপত্র না দেখে ভারত-প্রত্যাগত উপজাতীয়দের কথাকে বিশ্বাস করে বাঙ্গালীদেরকে ঘর-বাড়ী থেকে হটিয়ে উপজাতীয়দের বসিয়ে দিচ্ছে । উপজাতীয়দের যুক্তি "এই স্থান এক সময় তাদেরই ছিল" কিংবা "এই স্থানে সে কয়েক বছর পর পর জুম চাষ করত"। এ ধরণের বেআইনী পদক্ষেপে বাঙ্গালীরা একেবারে পথে বসতে শুরু করেছে।

বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালীরা জানিয়েছেন, উপজাতীয়রা সরকারের দুর্বল নীতির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বিতাড়নের চেষ্টা করছে। বসতিকারীরা আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, ভূমি-প্রশাসনের দায়িত্ব পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের হাতে অর্পণ করা হলে উপজাতীয় নেতৃত্বাধীন এই পরিষদ উপজাতীয়দের প্রতি আনুকুল্য প্রদর্শন করে আইনগতভাবে বসতি স্থাপনকারীদের ভূমিস্বত্ব হতে চিরতরে বঞ্চিত করবে।

এ সব আশংকা-অনিশ্চয়তা অবিলম্বে দূর করার জন্য বসতি স্থাপনকারী জনগণ দাবী জানিয়েছেন। আমি অনূন্য ১৮টি গুচ্ছগ্রামের বিভিন্ন বয়সের শতাধিক নারী-পুরুষের সাথে আলাপকালে সবাই তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ভূমিতে ফিরে যাবার অধিকার দাবী করেছেন। গুচ্ছগ্রামের জনগণ তাদের ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা, অনিশ্চয়তা ও গুচ্ছগ্রামের বন্দী জীবনের দুর্বিসহ অবস্থার অবসান দাবী করেন। তারা পার্বত্য অঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণ অনিশ্চিত জীবন ত্যাগ করে সমতলে যেতে রাজী আছেন কিনা এমন প্রশ্ন করায় বিভিন্ন গুচ্ছগ্রামের অধিবাসীরা দৃঢ়ভাবে না বোধক উত্তর দেন। তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অংশ। সুতরাং এখানে থাকার অধিকার তাদের রয়েছে। তারা বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন বাঙ্গালীদের সম্পদ দিয়েই করা হয়েছে। সুতরাং বাঙ্গালীরা এখানে থাকতে পারবেনা [illegible] যুক্তিতে? তারা আরো বলেন যে, তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দ[illegible] [illegible]ঙ্গল কেটে সেখানে সোনা ফলানোর প্রক্রিয়া শেখানোর পরই উপজাতিরা তাদের উপর শুরু অত্যাচার করে। তারা বলেন যে, শান্তি

বাহিনী ২৫ হাজার বসতিস্থাপনকারী বাঙ্গালীকে হত্যা করেছে। আরো ২৫ হাজার বাঙালীদের জীবন দিতে হলেও তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্যাগ করবেন না। তারা দাবী করেন, বসতি স্থাপনকারীদের নামে বন্দোবস্তকৃত ভূমিতে তাদের পুনর্বাসন এবং ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত দলিল-পত্র আইনগতভাবে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি প্রশাসনের দায়িত্ব পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। বাঙ্গালীদের নামে বরাদ্দকৃত ভূমিতে তাদেরকে পুনর্বাসিত না করে উপজাতীয়দের একচেটিয়া সুবিধা প্রদান করা হলে পার্বত্য অঞ্চলে টেকসই শান্তি আসবে না বলে তারা জানিয়েছেন।

বাঙ্গালীরা উপজাতীয়দের বাস্তুভিটা বা জমি প্রতারণামূলকভাবে কিংবা জোরপূর্বক দখল করেছে কিনা জানতে চাইলে উপজাতি-অউপজাতি নির্বিশেষে সবাই না সূচক জবাব দেন। বাঙ্গালীরা বলেন যে, উপজাতিদের জমির ওপর তাদের কোন লোভ নেই। তবে আইনসম্মতভাবে কারবারী-হেডম্যানদের সুপারিশে কিংবা তাদের উপস্থিতিতে যেসব ভূমি উপজাতীয়রা বাঙ্গালীদের নিকট বিক্রি করেছে তার ওপর তাদের দাবী রয়েছে।

একই সমস্যার প্রতি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্য মিঃ মিলন কান্তি ত্রিপুরা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি অকপটে বলেন যে, কোন পাহাড়ীর জমি বাঙ্গালীরা জোর করে দখল করেনি। বাঙ্গালীদের নামে বরাদ্দকৃত জমি ফেরত দেয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। দিঘীনালা থানার বেতছড়ি এলাকার কারবারী ভারত-প্রত্যাগত বিভূতি রঞ্জন চাকমা একই ধরণের মন্তব্য করেছেন। শান্তিবাহিনী বিভূতি ভূষণ কারবারীকে ১৯৯৬ সনে হত্যা করেছে। ১৯৯৩ সনে তার সাথে সাক্ষাত করতে গেলে তিনি আমাকে তার শরীরে শান্তিবাহিনীর নির্যাতনের চিহ্ন দেখালেন । তিনি এমন জঘন্যভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন যে দীর্ঘদিন পরেও সে দাগ তার শরীর থেকে যায়নি।

স্থানীয় সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী, চাকরীজীবীদের মতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি মালিকানা নির্ধারণই হলো জটিল সমস্যা। কারণ অধিকাংশ উপজাতি জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে থাকে। তাদের নামে নির্দিষ্ট ভূমির পরিমাণ কম। সমগ্র পাহাড়ী অঞ্চলকেই তারা তাদের জমি বলে মনে করে। যখন যেখানে ইচ্ছে জুম পদ্ধতির চাষের মাধ্যমে আপন দখলী স্বত্ব কায়েম করতে চায়। এ ধরণের ভূমি মালিকানা কোনভাবেই আইনসম্মত নয় এবং এতে ভূমির প্রকৃত উন্নয়ন ও ব্যবহার কিছুই হয়না।

সুতরাং সরকারের উচিত, পার্বত্য অঞ্চলের সব অধি ভূমি মালিকানা নির্ধারণে বলিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ পদক্ষেপ নেয়া। ভূমি মালিকা

করে এর দায়িত্ব স্থানীয় সরকার পরিষদের হাতে হস্তান্তর করলে পার্বত্য অঞ্চলে চরম রক্তারক্তি হবার সম্ভাবনা থেকে যাবে। যদিও সরকার পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি জরিপ শুরু করেছিলেন, কিন্তু শান্তিবাহিনীর সাথে আলোচনার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা মনে করেন, আলোচনার সাথে ভূমি জরিপ কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত নয়। এর মূল লক্ষ্য হলো, পাবর্ত্যবাসী বাঙালীদের ভূমিহীন উদ্বাস্তুতে পরিণত করে পার্বত্য অঞ্চল হতে বহিস্কার করা। তারা সরকারের উর্ধতন পর্যায়ের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেন। স্থানীয় প্রশাসনের ওপর নানা কারণে তাদের অনাস্থা জন্মেছে। এ অবস্থায় জরিপ বন্ধ হওয়ার পেছনে আদৌ কোন যুক্তি আছে কিনা এবং পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের খয়রাতি-নির্ভর অলস করে গুচ্ছগ্রামে বন্দী না রেখে তাদের নামে বন্দোবস্তকৃত জমিতে ফেরত পাঠানো যায় কিনা তার সুষ্ঠু সমাধানে সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ জরুরী হয়ে পড়েছে। ■

বিবর্তনের পথে

- স্থানীয় সরকার পরিষদ
- অভূতপূর্ব উন্নয়ন

স্থানীয় সরকার পরিষদ

গত ২৫ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামে চোখে পড়ার মতো বহু পরিবর্তন এসেছে। এ সব পরিবর্তনের অন্যতম দিক হলো স্থানীয় সরকার পরিষদ।

বাংলাদেশের এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার নিরিখে এর কোন অংশকে তথাকথিত স্বায়ত্বশাসনের নামে পাল্টা একটা শাসকশ্রেনী বা শাসন পদ্ধতি গড়ে তোলার ব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিকভাবেই ছিল না। তথাপি পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন ও স্বশাসিত করার লক্ষ্যে সরকার তিনটি পার্বত্য জেলাতে জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ্ গঠন করেন, যার গঠন পদ্ধতি ও ক্ষমতা উপমহাদেশের নিরিখে অভূতপূর্ব।

প্রথমতঃ এই পরিষদ সম্পূর্ণরূপে উপজাতীয় প্রভাবিত। এর চেয়ারম্যান এবং ৩০ জন সদস্যের মধ্যে ২০ জনই হবেন উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। এ ধরণের শর্তাধীন ও চাপিয়ে দেয়া ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে মানবতা ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী। এর ফলে পার্বত্য জেলাসমূহে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান পদসহ ২০ জন সদস্য উপজাতিদের মধ্য হতে নির্বাচিত হবার শর্ত বাঙ্গালীদের যেমন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এবং অধিকার ও ক্ষমতাহীন করেছে, তেমনি যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনের সুযোগও সংকুচিত হয়েছে। বাঙ্গালীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। এ অবস্থায় ৩০-সদস্য বিশিষ্ট পরিষদের সদস্য নির্বাচন হয়তো গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে, নতুবা অন্ততঃ জনসংখ্যানুপাতে হওয়া উচিত। বাঙ্গালীদের জন্য পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ আসন সীমিতকরণ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

দ্বিতীয়তঃ চেয়ারম্যানের পদটি চিরকাল উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত রাখা কোনভাবেই সমুচীন হয়নি। এই ক্ষেত্রে কিছু বিকল্প প্রস্তাব বিবেচনার দাবী রাখে ঃ

১. চেয়ারম্যানের পাশাপাশি ভাইস-চেয়ারম্যানের একটি পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে এবং পালাক্রমে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান একবার উপজাতীয় এবং পরবর্তীবার বাঙ্গালীদের জন্য নির্ধারিত হওয়া উচিত।

২. ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা না হলে প্রতি ৫ বছর পর পর চেয়ারম্যান একবার বাঙ্গালী, অন্য বার উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া উচিত।

৩. এসব পদ কারো জন্য সংরক্ষিত না রেখে গণসমর্থন ও যোগ্যতার ওপর চেড়ে দেয়া উচিত। এর ফলে অধিকতর যোগ্য, দক্ষ ও জনপ্রিয় ব্যক্তি জনগণের সেবা করার সুযোগ পাবেন।

৪. সর্বোপরি, ৩০ জন সদস্যই সরাসরি ভোটের মাধ্যমে সম্প্রদায় নির্বিশেষে নির্বাচিত হওয়া উচিত। উপজাতি ও বাঙ্গালীদের জন্য নির্ধারিত কোটা ব্যবস্থা গণতন্ত্র ও যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনের পরিপন্থী।

এখানে আরো একটি সত্য স্বীকার করতে হবে যে, পাবর্ত্য অঞ্চলে বাঙ্গালীরাই সবচেয়ে পশ্চাদপদ, অবহেলিত, অশিক্ষিত ও দরিদ্র সম্প্রদায়। বর্তমান জেলা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তাদেরকে আরো অসহায় ও কোনঠাসা করবে। সুতরাং এর একটি বাস্তবসম্মত বিহিত হওয়া একান্ত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থানীয় সরকার পরিষদের কাছে ২২টি বিষয় হস্তান্তর করার কথা। এই বিষয়গুলো হলো ঃ ১। আইন-শৃংখলা, ২। উন্নয়ন কার্যক্রমে সমন্বয়, ৩। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, ৪। স্বাস্থ্য, ৫। কৃষিও বনায়ন, ৬। পশু পালন, ৭। সমবায়, ৮। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ৯। সমাজ কল্যাণ, ১০। শিল্প ও সংস্কৃতি, ১১। চিত্তবিনোদন, ক্রীড়া ও পার্ক, ১২। মৎস্য ১৩। অতিথিশালা, ১৪। ফেরী চলাচল, ১৫। সরকারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন, ১৬। যোগাযোগ ব্যবস্থা, ১৭। পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, ১৮। সড়ক ও সেতু, ১৯। স্থানীয় বহুমুখী উন্নয়ন, ২০। ভূমি বিক্রি বন্দোবস্ত ইজারা ইত্যাদির ওপর নিয়ন্ত্রণ: ২১। ধর্মীয় বিষয়াদি এবং ২২। জনস্বাস্থ্য ।

আলোচ্য ক্ষেত্রগুলোর কতিপয় প্রতিকূল বিষয়ের ব্যাপারে বিকল্প প্রস্তাবঃ

১. এ ২২টি বিষয়ের মধ্যে আইন-শৃংখলা এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মতো কয়েকটি স্পর্শকাতর ক্ষেত্র রয়েছে। আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য স্থানীয় সরকারের অধীনে পৃথক পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার কথা। কিন্তু এই বাহিনীর মূল কর্তত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা উচিত। এদের নির্বাচন, নিয়োগ ও চাকরিবিধি, সুযোগ-সুবিধা, দায়-দায়িত্ব প্রভৃতি বাংলাদেশ কর্ম কমিশন ও স্বরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা উচিত। তাদের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ কোড প্রযোজ্য হতে হবে। এরা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পার্বত্য অঞ্চলে নিয়োজিত থাকবে। তবে এই বাহিনীর সব সদস্যকে অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী হতে হবে এবং বাঙ্গালী ও উপজাতি সম্প্রদায়সমূহের প্রতিনিধিত্ব জনসংখ্যানুযায়ী হতে হবে।

২. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় সরকার পরিষদের হাতে থাকলেও শিক্ষক নিয়োগ এবং পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী অবশ্যই বাংলাদেশ সরকার নির্ধারণ করবেন. যাতে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পণয়নের দায়িত্ব অবশ্যই বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্বে থাকতে হবে, জাতীয় জীবনের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায়। স্থানীয় সরকার শুধু শিক্ষক ও প্রশাসনকে তত্ত্বধান করবে।

৩. ২২টি বিষয়ের প্রতিটিতেই প্রতিটি সম্প্রদায়ের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব যেন সুনিশ্চিত থাকে, তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। স্বশাসনের নামে যেন কোন বিশেষ সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ওপর অবৈধ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব করতে না পারে, তেমন গ্যারিন্টি থাকতে হবে।

৪. এই ২২টি বিষয় শর্ত-সাপেক্ষে হস্তান্তরিত হওয়া উচিত। দেশদ্রোহীতা ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে এ ধরণের ক্ষমতা হস্তান্তর হীতে বিপরীত হতে পারে। যেকোন কিছু হস্তান্তরের আগে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতা সুরক্ষিত রাখার মতো আইনগত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকতে হবে। যে কোন মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ২২টি ক্ষেত্রের সব ক'টি কিংবা অংশ বিশেষ স্থগিত, রহিত কিংবা বাতিল করার আইনগত ও সার্বভৌম অধিকার বাংলাদেশ সরকারের হতে সংরক্ষিত থাকতে হবে।

৫. কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী, দেশদ্রোহী, কিংবা সন্ত্রাসী যাতে স্থানীয় সরকার পরিষদে কিংবা প্রস্তাবিত ২২টি ক্ষেত্রের কোনটিতে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হতে না পারে, তা সুনিশ্চত করতে হবে।

৬. সর্বোপরি, স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, কিংবা এর কর্মচারীরা বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী কিংবা তাদের স্বদেশী-বিদেশী উৎসাহদাতাদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকলে তাদের জন্য চরম শাস্তিমূলক বিধি থাকতে হবে।

স্থানীয় সরকার পরিষদের ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া দরকার। দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ সাপেক্ষে এই সরকারের কাছে প্রতিশ্রুত ২২টি বিষয় হস্তান্তর করে পার্বত্য জনগণের কাছে বাংলাদেশ সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্থানীয় সরকার পরিষদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। সর্বোপরি, দায়িত্ব পালনে এই সরকারকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে হবে। কোন ধরণের ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠীগত ভাবাবেগ, কিংবা

স্বজনপ্রীতি, কিংবা কোন সম্প্রদায় বা ধর্ম বিশ্বাসীদের ঘৃণা বা হিংসা বা কোণঠাসা করার প্রবৃত্তি কঠোরভাবে দমনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন যথাসময়ে নিয়মিত হতে হবে। জনসংহতি সমিতির চাপের মুখে অথবা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির অজুহাতে এ পরিষদের নির্বাচন বিলম্বিত কিংবা স্থগিত করলে দেশদ্রোহী সন্ত্রাসীদের অবৈধ কার্যক্রম চালানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। পার্বত্য জনগণের আসল প্রতিনিধি কে, তা বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে সন্ত্রাসীরা আস্তে আস্তে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা কখনোই ভারতের পাঞ্জাব, কাশ্মীর কিংবা আসাম, নাগাল্যান্ড, মনিপুরের মতো নাজুক ও প্রকট নয়। বিশেষত কাশ্মীরে সমুদয় বাসিন্দা ভারতীয় শাসন অবসানের লক্ষে মারাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ভারত সেখানে নির্বাচন দিচ্ছে তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য। সে তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আমাদের অনুকূলে। জনসংহতি সমিতি কিংবা শান্তিবাহিনী কোনভাবেই পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করেনা এবং তারা কখনোই সেখানে তাদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য স্থাপন করতে পারেনি এবং পারবেও না। অথচ তাদের মতো কাগুজে বাঘের চাপে বাংলাদেশ সরকার সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠান বারবার পিছিয়ে দিয়ে শুধু স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থাকে দুর্বল, অকেজো এবং অকার্যকরই করছেন না, বরং এই মিথ্যেকেই সত্যি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ সরকার নয়, বরং জনসংহতি সমিতি এবং শান্তি বাহিনীই নিয়ন্ত্রণ করে।

সুতরাং অনতিবিলম্বে তিনটি পার্বত্য জেলাতেই স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। জনসংহতি সমিতিকে এই মর্মে আশ্বাস দেয়া যেতে পারে যে, তাদের সাথে চুক্তি সাপেক্ষে পুনঃ নির্বাচনের ব্যবস্থা হতে পারে। সংলাপে দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করে জনসংহতি সমিতি নির্বাচন ঠেকিয়ে রেখে আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জনপ্রতিধিত্বহীন রেখে নিজস্ব চক্রান্ত সিদ্ধি করতে চায়। কারণ তারা জানে যে, এ ধরণের ব্যবস্থায় তারা কোনভাবেই নির্বাচিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্তৃত্ব করতে পারবে না। ঠিক এই কারণেই তারা স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থার বিরোধিতা করে এবং এ ব্যবস্থার বিলুপ্তি চায়। কারণ এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে তথাকথিত স্বশাসনের দাবী আর কখনোই গ্রহণযোগ্যতা কিংবা জনসমর্থন পাবে না।

সুতরাং বাংলাদেশ সরকারের আশু দায়িত্ব হবে যেকোন মূল্যে পার্বত্য জেলাসমূহের স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করে এ সরকারের মনস্তাত্তিক শক্তি উজ্জীবিত করা। এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে সন্ত্রাসবাদ এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই নির্বাচনের ধারাবাহিকতা জনসংহতি সমিতির কাম্য নয়।

স্থানীয় সরকার পরিষদের কাছে যে ২২টি বিষয়ের ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা, সেগুলোর সংখ্যা কিংবা পরিধি আরো বৃদ্ধি করা কোনভাবে দেশের অখন্ডতা ও স্বাধীনতার জন্য মঙ্গলজনক হবে না। বর্তমানে যে অবস্থায় স্থানীয় সরকার পরিষদ রয়েছে সেখানে রেখেই একে কার্যকর এবং গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে।

স্থানীয় সরকার পরিষদের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কিছু অপ্রিয় কথা উঠেছে। পার্বত্যবাসী বাঙ্গালীদের মতে স্থানীয় সরকার পরিষদের অনেকেই গোপনে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে যোগাযোগ রাখে, তাদেরকে অর্থ এবং সরকারের গোপন তথ্য প্রদান করে, সর্বোপরি তাদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে। স্থানীয় সরকার পরিষদের কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে আলাপ করার পর জনৈক বিদগ্ধ সাংবাদিক মাসুদ মজুমদারের মনে হয়েছে ঃ "স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানরা শান্তিবাহিনীর আইনী মুখপাত্র। আইনের সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা শান্তিবাহিনীর উদ্দেশ্য সাধন করছে। বিদেশী দূতাবাস থেকে শুরু করে বিদেশ পর্যন্ত সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর কথাগুলো তাদের মতো করে পৌছে দেয়ার দূত হিসেবে কাজ করছে। এর কোন কাগুজে প্রমাণ দেয়া যাবে না। কিন্তু ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে এর বাস্তবতা অস্বীকার করা যাবেনা।"[১১২]

বিচ্ছিন্ন-প্রবণ অঞ্চলের স্থানীয় কর্মকর্তাদের অনেকেই মনে হয় বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গীদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলে। কাশ্মীরের জনৈক আত্মসমর্পণকৃত জঙ্গী কুকা প্যারী অভিযোগ করেছেন জাতীয় কনফারেন্স নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার জঙ্গী তৎপরতায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। তার মতে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলী মোহাম্মদ সাগারের সাথে জঙ্গীদের যোগাযোগ রয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, রাজ্য বিধান সভার কমপক্ষে ২জন সদস্যের সাথে গেরিলাদের সংযোগ থাকার বাস্তব প্রমাণ রয়েছে। এদের একজন জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট, অন্যজন আল জিহাদ'এর সাথে যুক্ত। তিনি ন্যাশনাল কনফারেন্স' এর কোন কোন মন্ত্রী এবং বিধান সভার সদস্যদের সাথে জঙ্গীদের যে সম্পর্ক রয়েছে, তা ফাঁস করে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন।[১১৩]

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের অধিকাংশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও এ ধরণের অভিযোগ রয়েছে। এ অভিযোগের যথাযথ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার। অভিযোগ সত্যি হলে বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে অভিযুক্তকে আদালতে সোপর্দ করা উচিত। এ ধরণের কার্যক্রম রোধে আইনী বিধান থাকা বাঞ্ছনীয়। ■

---

[১১৩] **সাপ্তাহিক বিক্রম ঃ ঢাকা ঃ ২৪ ডিসেম্বর ঃ ১৯৯৬।**
Sunday, January 12-18, 1997.

অভূতপূর্ব উন্নয়ন

জনসংহিত সমিতি এবং তার স্বদেশী-বিদেশী সহায়করা প্রায়ই অভিযোগ করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম যদি বঞ্চিত কিংবা অবহেলিত হয়েই থাকে, তবে তা হয়েছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে, বিশেষতঃ ব্রিটিশ শাসনামলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জনসংখ্যার স্বল্পতা এই অবহেলার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। বিশ্বের প্রায় সব ক'টি পার্বত্য অঞ্চলই সংশ্লিষ্ট দেশের সমতল ও নদী অববাহিকার তুলনায় অনুন্নত। পার্বত্য অঞ্চলে আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় সুযোগ-সুবধিাগত অবকাঠামো গড়ে তোলা অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী উত্তর-পূর্ব ভারত কিংবা মায়ানমারের পার্বত্য অঞ্চলের পশ্চাদপদ অবস্থার দিকে তাকালেই এ মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়

তথাপি ১৯৭১ সনে দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশ সরকার দেশের অন্যান্য অঞ্চলকে বঞ্চিত রেখে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পার্বত্য জেলাসমূহে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন, যা ব্রিটিশ শাসনের ১৯০ বছর কিংবা পাকিস্তানের ২৪ বছরের সমুদয় খরচের তুলনায় বহুশত গুণ বেশী।

গত ২৫ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে, তার কিঞ্চিত বিবরণ এখানে তুলে ধরতে চাই। এ বিবরণের স্বচ্ছতা, সত্যতা ও নিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্য হংকং থেকে প্রকাশিত 'ফার ইস্টার্ন ইকনোমিক রিভিউ' সাপ্তাহিকীর ২৩ মার্চ ১৯৮৯ সালের একটি রিপোর্টের অংশ বিশেষ প্রিয় পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। এ প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করলেই পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রমের কিছুটা হলেও বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। পত্রিকাটির এডিটর-ইন-চীফ Derek Daves তার সরজমিন প্রতিবেদনে বলেছেনঃ

"In addition to the national development plan, a special five years plan for the CHT is due to be completed next year. Under it, an extra taka 500 millions ($15.55 millions) is being allocated annully to 17 projects.

"The three main regions of CHT have been divided into 25 special administrative regions called upa-zilla (or Thana), grouping various minorities and agencies. These centres have almost completely been linked by metalled roads and supplied with electricity. They also have tele communication link. Of course the SB (Shanti Bahini) sneer

that these facilities aid the military. but they have undoubtedly also stimulated the development. created jobs and eased farmers' access to markets.

"Nine hospitals have been built 30.000 acres of land rehabilitated : 938 primary schools. 33 Junior High Schools. 62 Secondary School. eight colleges plus second technical college have been established over the past five years. Two residential schools for tribal students have also been opened".

(ভাবানুবাদ ঃ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নির্ধারিত বিশেষ পাঁচশালা পরিকল্পনা আগামী বছর শেষ হবার কথা। এর অধীনে ১৭টি প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ৫০০ মিলিনয় টাকা। (১৫.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বরাদ্দ করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি প্রধান অঞ্চলকে বিভিন্ন সংখ্যালঘুদের সমন্বয়ে উপজেলা (বর্তমানে থানা) নামে ২৫টি বিশেষ প্রশাসনিক এলাকায় বিভক্ত করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রের অধিকাংশই বিদ্যুৎ, পাকা সড়ক ও টেলি যোগাযোগ দ্বারা যুক্ত। অবশ্য শান্তিবাহিনী এ বলে বিদ্রুপ করে যে, এসব সুযোগ-সুবিধা সামরিক বাহিনীকেই সাহায্য করে। কিন্তু এসব ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করেছে, চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং কৃষকদের বাজারে প্রবেশাধিকার সুগম করেছে।

নয়টি হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। ৩০.০০০ একর ভূমি পুনর্বাসিত হয়েছে। ৯৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩৩টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৬২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৮টি মহাবিদ্যালয়সহ দ্বিতীয় কারিগরি বিদ্যালয় গত ৫ বছরে স্থাপন করা হয়েছে। উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য দুটো ছাত্রাবাসও নির্মাণ করা হয়েছে।)

এ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ৮ বছর আগে। এই সময়ের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো বহুবিধ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছ। ১৯৪৭ সালে যেখানে কোন কলেজ ছিল না, ১৯৯৩ সনের মধ্যে সেখানে কেবল ১১টি সরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর প্রতিটি উপজেলা/থানাতে একাধিক বেসরকারী কলেজ স্থাপিত হয়েছে। সরকারী ঘোষণা মোতাবেক প্রতিটি থানা সদরে একটি সরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী কলেজের সংখ্যাই হবে কমপক্ষে ২৫টি। এদের অনেকগুলোর কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে মাত্র একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল। ১৯৯৬ সনের মধ্যে তিনটি পার্বত্য জেলায় ১২৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

প্রতিটি থানা সদরে বালক-বালিকাদের জন্য ২টি করে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সরকার পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাই হবে ৫০টি। ২ হাজার সনের মধ্যে এ বিদ্যালয়গুলো স্থাপন সম্পন্ন হবার কথা। বেসরকারী তথা সরকারী অনুদান প্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরো বহু গুণ বেড়ে যাবে।

ব্রিটিশ আমলে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে মাত্র ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। অর্থাৎ তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি ২৫৪.৬৫ বর্গমাইল এলাকার জন্য মাত্র ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। ১৯৯৬ সনের শেষ পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১,২৫১টিতে। অর্থাৎ প্রতি ৪.০৭ বর্গমাইলে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি ৪.০৭ অর্থাৎ ৪ বর্গমাইলে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকাকে সমতলের তুলনায় কম মনে হতে পারে। কিন্তু বন ও পাহাড়ী ভূমিতে লোক বসতি হালকা বলে কেবল লোকালয়গুলোতে বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ঠ। উপমহাদেশের অন্য কোন দেশের পার্বত্য অঞ্চলে এতো বেশী স্কুল নেই। ২ হাজার সালের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি পার্বত্য জেলা দেশের সমতল ভূমির যেকোন জেলার চেয়ে অধিকতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকারী হবে। কেবলমাত্র উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য ৯টি পৃথক ছাত্রাবাস স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৭১ সনের আগে এ ধরণের কোন ছাত্রাবাস ছিল না।

উপজাতীয় জনগণের মধ্যে শিক্ষাকে আরো সহজ লভ্য করার জন্য বাংলাদেশ সরকার উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দেশের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে, কারিগরি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে, দন্তচিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে, পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে, প্যারামেডিকেল কলেজে, সংগীত মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে, ক্যাডেট কলেজে, বিআইটি-তে উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষিত রয়েছে। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতকরা ২০ ভাগ শূন্য আসন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকায় তাদের চেয়ে উন্নত মেধাসম্পন্ন বাঙ্গালী শিক্ষার্থীরা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর উপজাতীয় শিক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত খারাপ ফলাফল করেও কেবল কোটার সুযোগে উচ্চ শিক্ষার অবাধ সুযোগ পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে উপজাতীয় বিশেষতঃ চাকমাদের মধ্যে শিক্ষিতের হার দ্রুত বেড়ে চলেছে। যেখানে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষিতের হার মাত্র ২৪.২৮%, সেখানে পার্বত্য উপজাতীয়দের শতকরা ৫৭ জন শিক্ষিত। চাকমাদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৭৫

জন শিক্ষিত। ১৯৪৭ সালে এদের মধ্যে মাত্র শতকরা ২ জন শিক্ষিত ছিল। সভ্যতার আলোক থেকে বঞ্চিত-প্রায় প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, কৃষ্টি-কালচারের অনুসারী একটি পার্বত্য বুনো জাতি কত বেশী সুযোগ-সুবিধা পেলে জাতীয় স্বাক্ষরতার হারকে অনেকখানি পেছনে ফেলে শতকরা ৭৫ জনে পরিণত হতে পারে তা কল্পনা করতেও অবাক লাগে।

ব্রিটিশ আমলে সারা পার্বত্য অঞ্চলে কোন পাকা সড়ক ছিল না। পাকিস্তান আমলসহ ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকা সড়ক ছিল মাত্র ৭২ কিলোমিটার। ১৯৯৩ সালের শেষ পর্যায়ে ৭৫৩ কিলোমিটার সড়ক পথ তৈরী হয়। গত ৪ বছরে এর দীর্ঘতা আরো অনেক বেড়েছে। বিশেষতঃ টিলা-পাহাড়, নদী-ঝরণা-গর্ত ও বনভূমিতে সড়ক নির্মাণ নিঃসন্দেহে ব্যয়সাধ্য, অনেকক্ষেত্রে দুরূহ। পার্বত্য চট্টগ্রামে এতো দীর্ঘপথ নির্মাণ করতে যে অর্থব্যয় হয়েছে তা দিয়ে সমতলে আরো ১০ গুণ দীর্ঘতম সড়কপথ তৈরী করা যেত। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশের অন্য কোন জেলায় এত দীর্ঘতম সড়ক সুবিধা নেই বললেই চলে। নেত্রকোণা জেলায় ২২ লাখ লোক বাস করে। অথচ সেখানে ১০ মাইলও পাকা সড়ক নেই।[১১৭]

পাকিস্তান আমলে রাঙামাটিতে ৩১ শয্যাবিশিষ্ট মাত্র একটি হাসপাতাল ছিল। বর্তমানে রাঙামাটিতে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল রয়েছে। খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল রয়েছে। ইতোমধ্যে ২৫টি থানা সদরের অধিকাংশটিতেই ৩১ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল তৈরী হয়েছে। প্রতিটি থানা সদর, এমনকি কোন কোন ইউনিয়নেও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। বাংলাদেশের অন্য কোথাও এমন স্বাস্থ্য-সুবিধে নেই।

ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন কলেজ, হাসপাতাল, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, পাকা সড়ক, চিত্রবিনোদন কেন্দ্র, সিনেমা হল, শিল্পকলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, প্রেস ক্লাব, সংবাদপত্র, সার্কিট হাউজ, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমী, রাবার প্রসেসিং প্ল্যান্ট, সরকারী আবাসিক ভবন, শিল্প-কারখানা, পরিবার ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, শিশু সদন ইত্যাদি কিছুই ছিল না। আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে এসব কিছুসহ আরো বহুবিধ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ফলে পাহাড়ী বনভূমির প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা ও আধুনিক সভ্যতা এবং এতদসংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা পৌঁছেছে।

---

[১১৭] ২৯ জানুয়ারী, ১৯৯৭ সালে জাতীয় সংসদে নেত্রকোণা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব ফজলুর রহমান খানের বক্তব্য থেকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সনে এক অধ্যাদেশ বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা, কৃষি, যাতায়াত, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, কুটির শিল্প, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নে এ বোর্ড বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ১৯৭৫-৭৬ সাল হতে ১৯৯৫-৯৬ সাল পর্যন্ত ৭টি খাতে (বোর্ডের ব্যবস্থাপনা ব্যয় সহ) ১০৪১টি প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বমোট ৫.২৯৪.২৪ লাখ টাকা ব্যয় করেছে। খাতওয়ারী ব্যয় দেখুন ঃ

ক্রমিক	খাত	বাস্তবায়িত প্রকল্প	ব্যয়িত অর্থ (লাখ টাকায়)
১	কৃষি	১৩৯টি	৭৪৬.৫২
২	যাতায়াত	১৭১টি	৮৫০.১৬
৩	শিক্ষা	২৪৫টি	১,০১২.১০
৪	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৯৬টি	৪০০.৬৬
৫	সমাজ কল্যাণ	৩০২টি	৯০৭.২৫
৬	নির্মাণ	৬০টি	৪৩৪.৮৩
৭	কুটির শিল্প	২৮টি	৪৪.৯১
মোট		১০৪১টি	৪৩৯৬.৪৩
৮	বোর্ডের ব্যবস্থাপনা ব্যয়	-	৮৯৭.৮১
সর্বমোট			৫২৯৪.২৪

আলোচ্য বোর্ডের তত্ত্বাবধানে উল্লেখিত ১০৪১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ায় উপরোক্ত ৭টি খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে।

১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বর্ষে বোর্ড ৪৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে ২০টি অসমাপ্ত (১৯৯৫-৯৬ সালের) এবং ৫৭টি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

অন্যদিকে 'ইউনিসেফ' পার্বত্য চট্টগ্রামের সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে মৌলিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে, বিশেষ করে মা ও শিশুর পুষ্টিহীনতারোধ, মৃত্যুহার হ্রাস, পানি ও মলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব রোধ, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার হার বৃদ্ধিকরণ, ক্ষুদ্র পুঁজি গঠন, ঋণ প্রদান ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে উপজাতীয় জনগণের সনাতনী জীবন পদ্ধতি আধুনিকতার স্তরে পৌঁছতে শুরু করেছে। 'ইউনিসেফ' কেবল ১০ বছরে (১৯৮৫-৯৫) ২,১৫০.২৮ লাখ টাকা ব্যয় করে

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছে। ১৯৯৬ সনের ১ জানুয়ারী থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত 'ইউনিসেফ' পার্বত্য অঞ্চলের ৩৭৩টি মৌজার বিবিধ ধরণের উন্নয়নে ৩,৪৫০.৯৫ লাখ টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এ অর্থ ব্যয়ে ২০০০ সনের মধ্যে ৪,০২৮টি পাড়া-সেন্টার, ৪,০২৮টি শাক-সবজির বাগান, ৪,১০৩টি ফলের বাগান নির্মাণসহ ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৫ বছরে (১৯৭৯-৮০ সাল হতে ১৯৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত) ৫,১৯৩.১৩ লাখ টাকায় ২ হাজার পরিবার পুনর্বাসিত করা হয়েছে, ৮ হাজার একর উঁচুভূমিতে রাবার বাগান এবং ৪ হাজার একর জমিতে উদ্যান গড়ে তোলা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি, বাঘাইছড়ি এবং ছোট মেরুং এলাকায় স্থাপিত রাবার বাগানে ১৯৯৬ সনের জুন মাস পর্যন্ত ৬০২ টন রাবার উৎপাদিত হয় এবং উপজাতীয়রা তাদের প্রাপ্য অংশ লাভ করে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড যে বিশেষ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়, সেগুলো হলো ঃ

১. ভূমিহীন জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ;
২. খাগড়াছড়িসহ তিনটি পার্বত্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
৩. পার্বত্য অঞ্চলে কৃষি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন;
৪. কৃষি সম্প্রসারণ;
৫. নার্সারী উন্নয়ন;
৬. পরিবার পরিকল্পনা;
৭. স্বাস্থ্য-সুবিধা;
৮. কুটির শিল্প উন্নয়ন;
৯. কৃষিজাত দ্রব্যাদি গুদামজাতকরণের উদ্দেশ্যে গুদাম নির্মাণ;
১০. বনায়ন ও বন পুনর্বাসন;
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়ন;
১২. মৎস্য চাষ;
১৩. শিক্ষা বিস্তার;
১৪. দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ বরাদ্দের আওতায় উঁচুভূমি বন্দোবস্তী প্রকেল্পর অধীনে (২য় পর্যায়) ১৯৯৪ সনের ডিসেম্বর হতে ২০০০ সনের জুন পর্যন্ত ২৯৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে বান্দরবানে ৫শত এবং খাগড়াছড়িতে ৫শত

উপজাতীয় পরিবারকে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন, ৪ হাজার একর রাবার বাগান এবং ১ হাজার একর উদ্যান গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অন্যকোন সাবেক জেলাকে কেন্দ্র করে কোন উন্নয়ন বোর্ড গড়ে ওঠেনি। সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ এবং সেনাবাহিনী (তাদের শান্ত ও মৈত্রীকরণ কর্মসূচীর আওতায়) স্ব স্ব উদ্যোগে উন্নয়ন তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হলো বাড়তি ও বিশেষ (স্পেশাল) উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের অন্য কোন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে এত স্বল্প সময়ে এমন অভূতপূর্ব উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়নি। এই উন্নয়ন কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক বিষয়ে দেখাশুনা করার জন্য ১৯৯০ সনে রাষ্ট্রপতি'র (পরে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী অধীনে) বিশেষ কার্যাদি বিভাগ (Special Affairs Division) গঠন করা হয়েছে, যা মূলতঃ একটা মন্ত্রণালয়ের মতো কাজ করে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রম পার্বত্যবাসীর বিশেষতঃ উপজাতীয়দের জীবনে তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অভাবনীয় পরিবর্তন এনেছে। বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ২ হাজার ভূমিহীন জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। প্রতিটি পরিবারকে ৬.২৫ একর জমি দেয়া হয়েছে। এই ২ হাজার পরিবারের জন্য ৮ হাজার একর রাবার বাগান সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ৪টি রাবার কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।

এই ২ হাজার পরিবারের কথা উপমা হিসেবে উল্লেখ করা হলো। আসলে সারা পার্বত্য অঞ্চলে একই ধরণের পরিবর্তন এসেছে। উপজাতীয়দের সনাতন শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি এখন পার্বত্য অঞ্চলে গম, তূলা, ভুট্টা, কাকরল, কুমড়া, কলা, মিষ্টি আলু, হলুদ, আদা, আনারস, কাঁঠাল তেজপাতা, কমলা প্রভৃতি উৎপাদিত হচ্ছে। ব্রিটিশ কিংবা পাকিস্তান আমলে কেউ চিন্তাও করেনি যে, এসব ফসল পার্বত্য অঞ্চলে উৎপাদিত হতে পারে। সুচিন্তিত পরিকল্পনা দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান বৃক্ষের উদ্যান রচনায় উপজাতীয়দের সম্পৃক্ত করে তাদের আর্থিক প্রবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। জুম চাষ বহির্ভূত চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ ছিল ৪০ হাজার ৫ শত হেক্টর, বর্তমানে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ হেক্টরে। ১৯০০ সালে এর পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৪ শত ৫০ হেক্টর। অর্থাৎ পাকিস্তানীদের ১৩ (১৯৪৭-৬০) বছর মিলিয়ে মোট ৬০ বছরে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় (৪০,৫০০-৪,৫০০) ৩৬,০৫০ হেক্টর। অন্যদিকে পাকিস্তান আমলের পরবর্তী ১০ বছর (১৯৬০-৭০) এবং বাংলাদেশ আমলের ২২ বছর (১৯৭২-৯৪) মিলিয়ে ৩২ বছরে চাষযোগ্য

ভূমির পরিমাণ বেড়েছে (১,০০,০০০ - ৪০,৫০০)=৫৯,৫০০ হেক্টর। পার্বত্য অঞ্চলে বাঙ্গালী চাষীদের পুনর্বাসনের পর চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ রাতারাতি বৃদ্ধি পায় এবং সনাতনী জুমিয়া শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি নানাবিধ শস্য, ফল ও সবজি উৎপাদন শুরু হয়।

বাংলাদেশ সরকারের নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা উপমহাদেশের অন্য যেকোন অঞ্চলের উপজাতিদের তুলনায় অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। বাংলাদেশ সীমান্তের পূর্ব এবং পূর্ব-উত্তর পাশে ভারতীয় ভূ-খন্ডে ২১৭টি উপজাতি বাস করে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৫০ বছর পরেও এসব পার্বত্যবাসী উপজাতীয়দের কাছে স্বাধীনতার সুফল পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো পৌছায়নি। তারা এখনও শিক্ষা ও আধুনিক সভ্যতার আলো হতে অনেক দূরে রয়েছে। ■

বিদ্রোহ দমনের প্রক্রিয়া

- সেনাবাহিনী মোতায়েন
- সেনাবাহিনী ঃ রটনার শিকার
- মানবাধিকার সংস্থা
- বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা
- ত্রিপুরা থেকে ফ্যাক্স
- বিদ্রোহ দমনে ভারতীয় মডেল
- বিশেষ আইন প্রয়োজন

সেনাবাহিনী মোতায়েন

বিচ্ছিন্ন-প্রবণ পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের প্রত্যাহার করার দাবী উঠেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী জনসংহতি সমিতি এবং তার দোসরদের অন্যতম দাবী ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সেনাবাহিনী এবং সেনানিবাস প্রত্যাহার করতে হবে। তারা সেনাবাহিনীর নামে খুন, জখম, ধর্ষণ, অপহরণ, অগ্নিসংযোগ, লুন্ঠন প্রভৃতি অতিরঞ্জিত ও ভিত্তিহীন গুজব রটিয়ে তাদেরকে নির্মম ও মানবতা বিরোধী শক্তি হিসেবে চিত্রিত করে দেশে বিদেশে তাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত।

অথচ সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীদের প্রতিহতকরণে সেনাবাহিনীর কোন বিকল্প নেই। তাই ভারতসহ বিশ্বের যেসব দেশ বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যার সম্মুখীন তাদের সবাই তাদের বিচ্ছিন্ন-প্রবণ অঞ্চলে ব্যাপক সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য নিয়োগ করেছে। এ মুহূর্তে ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরে কাশ্মীরী জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম নস্যাত করার উদ্দেশ্যে ভারত ৬ লক্ষাধিক নিয়মিত সৈন্য নিয়োগ করেছে। এ ছাড়াও রয়েছে বিএসএফ, সিআরপিসহ বিভিন্ন নামের ও প্রকারের আরও প্রায় ৬ লাখ আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য। কাশ্মীরের জনসংখ্যা ৪০ লাখের মত। সুতরাং প্রতি ৩.৩৩ জন কাশ্মীরীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গড়ে ১ জন করে নিরাপত্তা কর্মী রয়েছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ সর্বজনবিদিত। বহুদিন যাবত ভারত তার বিচ্ছিন্নপ্রবণ এলাকাসমূহে বিদেশী মানবাধিকারকর্মী তো দূরের কথা, সাংবাদিকদের পর্যন্ত ঢুকতে দেয়নি। ভারত মনে করে যেকোন মূল্যে এবং পন্থায় ভূখন্ডগত অখন্ডতা রক্ষার অধিকার তার রয়েছে। সেনাবাহিনী সে অধিকার রক্ষার শ্রেষ্ঠ শক্তি।

আসলে সেনাবাহিনীর কাজ কি? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য কোন সামরিক বিশেষজ্ঞ বা রাজনীতিকের দ্বারস্থ না হয়ে জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর প্রভুদেশ হতে প্রকাশিত 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় মন্তব্যের দিকে তাকানো যাক। ঐ সম্পাদকীয়তে সেনাবাহিনীর একাধিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

"বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে দেশকে রক্ষা করা, দেশের সীমান্ত পাহারা দেওয়া। যখন যুদ্ধ বিগ্রহ নাই, তখনও অশান্তি ও অস্থিরতা থাকিতে পারে, থাকিতে পারে দেশের আঞ্চলিক অখন্ডতার প্রতি বিপদ, বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাস ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আভ্যন্তরীন সংকট। এই সব ক্ষেত্রেও সেনাবাহিনীকে সরকার

মোতায়েন করিয়া থাকেন। উদ্দেশ্য থাকে জনসাধারণকে সন্ত্রাসবাদীদের হাত হইতে নিরাপদ রাখা এবং রাষ্ট্রদ্রোহীদের দমন করা।"[১১১]

এই উদ্দেশ্যে ভারত কাশ্মীর ছাড়াও তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য প্রায় ৫ লাখ নিয়মিত সৈন্য মোতায়েন করেছে। এদের মধ্যে আসামে ১ লাখ ২৫ হাজার, মনিপুর ও নাগাল্যান্ডে ১ লাখ করে ২ লাখ, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে ২০ হাজার করে ৪০ হাজার এবং মিজোরাম ও অরুনাচল প্রদেশে ৩৫ হাজার সৈন্য রয়েছে। এছাড়া এ সাতটি রাজ্যের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী ছাড়াও অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনীর ৯৩ হাজার সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিএসএফ: সিআরপিএফ: পাঞ্জাব পুলিশ কমান্ডো, রাষ্ট্রীয় রাইফেল, মনিপুর রাইফেল, আসাম রাইফেল, নাগাল্যান্ড আর্মড পুলিশ প্রভৃতি। বিশ্বের অন্য কোন দেশে আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনের জন্য নিয়মিত বাহিনীসমূহকে এমন ব্যাপকহারে ব্যবহার করার নজির নেই।

উদ্ধৃত মন্তব্য পাঠান্তে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনে ভারত সরকার কর্তৃক নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যাপক সংখ্যক সদস্য নিয়োগের পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী নিয়োগে সরকারী সিদ্ধান্ত কতখানি যুক্তিযুক্ত তা আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়না।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষার প্রধান প্রহরী। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশী চরদের দেশোদ্রোহীতামূলক সন্ত্রাসী তৎপরতা প্রকট হবার প্রেক্ষিতে সরকার দেশের অখন্ডতা এবং স্থানীয় জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমিত সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করেন।

১৯৭২ সনে ২৭ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একটি সরকারী আদেশ বলে সমতলের তিনটি জেলা ও কক্সবাজার মহাকুমার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অপারেশন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে। অতঃপর ১৯৭৩ সনের ৩ আগষ্ট চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় সেনাবাহিনী মোতায়নের জন্য সরকারী আদেশ জারী করা হয়। পরবর্তীতে শান্তিবাহিনীর ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সনে বিশেষ অপারেশনে পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্ধিত সংখ্যায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। অদ্যাবধি

---

[১১১] আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ঃ ১২ নভেম্বর, ১৯৯৬।

বেসারিক প্রশাসনের সহায়তায় ১৯৭৩ সনের জারীকৃত আদেশ বলেই সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত রয়েছে।

সেনাবাহিনী কি করছে ?

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা বিশ্বের যেকোন বিচ্ছিন্ন-প্রবণ এলাকায় নিয়োজিত সেনাবাহিনী হতে ভিন্নতর। এখানে তারা বিদ্রোহী-সন্ত্রাসীদের দমনের নামে যথেচ্ছ হত্যা, অগ্নিসংযোগ, দেখামাত্র গুলি, বন্দীশালায় হত্যা, জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে অতিরিক্ত নিপীড়ন ইত্যাদি যতোদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে।

সাধারণভাবে মনে হতে পারে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর মূল দায়িত্ব হচ্ছে সন্ত্রাসী কার্যক্রম নির্মূল করা। কিন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ঐ অঞ্চলের জননিরাপত্তা বিধান এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিহতকরণের পাশাপাশি উপজাতীয় জনগণের হৃদয় জয় করার উদ্দেশ্যে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা বিশ্বের অন্যত্র নেই বললেই চলে। এর নাম দেয়া হয়েছে Pacification Programme, যাকে বাংলায় শান্তকরণ বা মৈত্রীকরণ কর্মসূচী বলা যেতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন তাদের প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অফিসারের যেসব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটেছে। রিপোর্টের ভাষ্য ঃ

i. Our aim is to gradually finish the insurgence and then come out of the Hill Tracts as soon as the insurgency is finished.[120] (ভাবানুবাদ ঃ "আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ক্রমান্বয়ে সশস্ত্র উপপ্লবী (Insurgence) কার্যক্রম নির্মূল করা, এবং সশস্ত্র কার্যক্রম নির্মূল হওয়ামাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বেরিয়ে আসা।")

ii. We are trying to win them (the Hill People) over, to give them the feeling that we are not different.[121] (ভাবানুবাদ ঃ 'আমরা তাদের (পাহাড়ী জনগণের) হৃদয় জয়ের চেষ্টা করছি তাদের মনে এমন অনুভূতি জন্মাতে যে আমরা (তাদের থেকে) পৃথক কিছু নই।'

Chittagong Hill Tracts Commission : Life is Not Ours : P.48.

Ibid. P.48.

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর কার্যক্রমকে আমরা নিম্নোক্তরূপে সাজাতে পারি ঃ

১. সড়ক যোগাযোগ (৭৮৬ কি.মি.) ও নৌপথ (২৪৪ কি.মি.) রক্ষা ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. যোগাযোগ কেন্দ্র ও শহরাঞ্চল সংরক্ষণ;

৩. শান্তিবাহিনীর আক্রমণ হতে নিরীহ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান;

৪. জনগুরুত্বপূর্ণ সেবা কার্যাদি অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫. সরকারী কর্মকর্তা ও সফরকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

৬. উন্নয়নমূলক প্রকল্প, বনজ সম্পদ সংগ্রহস্থল ও শিল্পাঞ্চলকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ;

৭. উপজাতীয় জনগণের বিশ্বাসভাজন হবার মতো জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং তাদেরকে দেশের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত হবার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ;

৮. স্বাস্থ্য সেবা প্রদান;

৯. বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনায় সর্বাত্মক সহায়তা দান; এবং

১০. পার্বত্য অঞ্চলের সর্বত্র নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান রাখা করা।

উপরোক্ত সবগুলো কাজই বস্তুতঃ 'বন্ধুত্ব ও মৈত্রীকরণ' কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক ও ভৌতিক অবকাঠামো উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে গহীন অরণ্যে বসবাসকারী উপজাতীয় জনগণ যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অবহেলা ও বঞ্চনার মধ্যে জীবন কাটিয়েছে, তারাও ধীরে ধীরে আধুনিক জীবনযাত্রার সুযোগ-সুবিধা ভোগের সুযোগ পেতে শুরু করেছে।

সেনাবাহিনীর শান্তকরণ কর্মসূচী তথা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সমুদয় চিত্র তুলে ধরার কোন অভিপ্রায় আমার নেই। তাদের (সেনাবাহিনীর) কার্যক্রম সম্পর্কে বিচ্ছিন্নতাবাদীচক্র এবং তাদের দোসরদের মিথ্যে প্রচারণার মুখোশ উন্মোচনার্থে কিছু তথ্য উপস্থাপন করাকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছি।

প্রথমেই দৃষ্টি দেয়া যাক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের দিকে। বাংলাদেশ সরকারের সড়ক ও জনপথ বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কিংবা স্থানীয় জেলা সরকার পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের বাইরে একেবারে যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন এলাকার যোগাযোগের উন্নয়নের প্রতিই সেনাবাহিনী প্রধানতঃ নজর দিয়েছে।

দৈনিক মিল্লাত (৫ অক্টোবর, ১৯৯৬ সংখ্যা) জানিয়েছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিজস্ব অর্থায়নে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। দৈনিকটি প্রাপ্ত তথ্যের বরাত দিয়ে জানিয়েছেন পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় কেবল ১৯৯৬ সালেই ৫০ কিলোমিটার সড়ক এবং পুল ও কালভার্ট নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত করার কাজে সেনাবাহিনী প্রায় ২৪ লাখ টাকা ব্যয় করেছে। সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে শান্তকরণ কর্মসূচীর অধীনে ১৯৯৫-৯৬ অর্থবর্ষে এই অর্থব্যয় করে। সেনাবাহিনী ১৯৯৬ সালে কেবল বান্দরবান জেলায় যেসব সড়ক নির্মাণ করে সেগুলো হলো-- রোয়াংছড়ি হতে বাংছড়ি পর্যন্ত ১০ কিঃমিঃ: উখিয়া টিএন্ডটি থেকে রেজু আমতলী পর্যন্ত ৯ কিঃ মিঃ (মেরামত); রেজু থেকে রেজু আমতলী পর্যন্ত ৪ কিঃ মিঃ, নাইক্ষ্যংছড়ি হতে লেবুছড়ি ৫ কিঃমিঃ, আশারতলী বিডিআর ক্যাম্প থেকে ৪৫নং সীমান্ত পিলার পর্যন্ত ৪ কিঃমিঃ।

খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারার জালিয়াপাড়া-গুইমারা সড়কে ইট বিছানো সেনাবাহিনীর অন্যতম কৃতিত্ব। তিনটি পার্বত্য জেলাতেই সেনাবাহিনীর উদ্যোগে বেশ কয়েকটি পুল ও কালবার্ট এবং সড়ক নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে দুর্গম পাহাড়ী জঙ্গলাকীর্ণ এলাকার শতাব্দীর অন্ধকারে থাকা উপজাতীয় জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন পরিবর্তনে বিরাট ভূমিকা রাখছে।

সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌতিক অবকাঠামো তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি পার্বত্যবাসী জনগণের, বিশেষতঃ উপজাতীয়দের স্বাস্থ্য-সুবিধা প্রদান করে আসছে। যে-সব স্থানে সেনাবাহিনী বা অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনীগুলোর শিবির রয়েছে, সে সব স্থান হতে উপজাতীয়দের বিনামূল্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ ও ঔষধপত্র প্রদান করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নে সেনাবাহিনীর বহুবিধ কার্যক্রমের দীর্ঘ তালিকা প্রদান করলে বক্ষ্যমান অধ্যায়টি সেনাবাহিনীর প্রশংসাপত্রে পরিণত হবে যা কোনভাবে আলোচ্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। তথাপি সেনাবাহিনীর মৈত্রী ও বন্ধুত্বকরণ কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় নিয়োজিত

সেনাবাহিনীর ভূমিকার প্রতি তাকালেই পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাদের কার্যক্রমের স্পষ্ট ও বাস্তব ধারণা পাওয়া যাবে, যা উল্লেখ করার দাবী রাখে।

১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বর্ষে বান্দরবান আঞ্চলিক বিগ্রেড কমান্ড সর্বমোট ২.১৭.৭০.২২২ টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই অর্থের মধ্যে যোগাযোগ খাতে ১.০৪,৮৯,০০০ টাকা: আর্থ-সামাজিক খাতে ৩৪,৯২,৫০০ টাকা: কৃষি উন্নয়নে ৭.২৯.৫০০ টাকা: শিক্ষা খাতে ৩৩.৪৪.৭০০ টাকা: উপজাতীয় সংস্কৃতি উন্নয়নে ৬৫.০০০ টাকা: ধর্মীয় উপসনালয় নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে ১.২৯.৬০০ টাকা: ক্রীড়া উন্নয়নে ২০,০০০ টাকা: চিকিৎসাখাতে ৬,১৩,৭০৮ টাকা: পুনর্বাসন খাতে ১০,১৯,৭০৩ টাকা এবং সরাসরি আর্থিক সাহায্য খাতে ৭.০০.১১১ টাকাসহ সর্বমোট ২,১৭,৭০,২২২ টাকা। সেনাবাহিনীর রাঙামাটি অঞ্চল গত ৪ বছরে (১৯৯৩-৯৬) শান্তকরণ কর্মসূচীর অধীনে যথাক্রমে ২.৪০৯.৪৫৮: ১.৫৪১.৮৯১: ২,১৪৬,১১০ এবং ১,৯৪৩,১৬২ মেট্রিক টন গম বরাদ্দ করে।

এসব কিছুরই সিংহ ভাগ চলে যায় উপজাতীয়দের হাতে। তিনটি পার্বত্য জেলায় ব্যাপক সফরকালে বিভিন্ন উপজাতীয় জনপদে আলাপ করে জানা গেছে যে, উপজাতীয়রা তাদের মেয়ের বিবাহ কর্ম সম্পাদন করার জন্যও সেনাবাহিনীরা কাছ হতে মোটা অংকের আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী পেয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আর্থিক সংকট দূরীকরণে সেনাবাহিনী উপজাতীয়দের প্রায়ই সহায়তা করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙালী সাংবাদিক, শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের সবাই প্রায় অভিন্ন মত প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং সরকারী সাহায্য সহযোগিতা তো বটেই, এমনকি সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ব্যয়কৃত অর্থের সিংহ ভাগ অর্থ চলে যায় উপজাতীয় পাড়ায় বিদ্যালয়, কিয়াং, গীর্জা, উপজাতীয় ছাত্রাবাস নির্মাণে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন বহু উপজাতীয় জনপদ রয়েছে যেখানে মাত্র ১০টি পরিবারের জন্য সেনাবাহিনী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিয়াং নির্মাণ করে দিয়েছে। অথচ মুসলমানরা সমুদয় জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও সেখানে পর্যাপ্ত তো দূরের কথা ন্যূনতম সংখ্যক মসজিদ-মাদ্রাসা নেই। যে ক'টি আছে সেগুলো সরকারী অনুদান এবং সেনাবাহিনীর সহযোগিতা তেমন একটা পায়না। মাদ্রাসা মসজিদ নির্মিত হয় মুসলমানদের খয়রাতি সাহায্যে এবং সেগুলোর অবস্থা নড়বড়ে ও জীর্ণ-শীর্ণ।

বাঙ্গালীরা ক্ষোভের সাথে বলেছেন সেনাবাহিনীর মৈত্রীকরণ বা শান্তকরণ কর্মসূচীর মূল লক্ষ্যই হলো উপজাতীয় জনগণকে সার্বিক সুবিধা প্রদান করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো। ফলে বাঙ্গালীরা সর্বদিক হতেই বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকারে পরিণত হয়েছেন। তারা বলেন যে, উপজাতীয় জনগণের প্রতি তারা বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন নন, কিন্তু তাই বলে তারা অবহেলা ও বৈষম্যের শিকারে পরিণত হবেন তাও গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের মতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙ্গালীদের আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্বল রেখে উপজাতীয়দের পেছনে অর্থ ঢাললে তা লক্ষ্যার্জনে যে সক্ষম হবে এমন নিশ্চয়তা নেই। তারা মনে করেন বাঙ্গালীরা শক্ত অবস্থানে থাকলেই পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সুসংহত হবে। ■

সেনাবাহিনী ঃ রটনার শিকার

জনসংহতি সমিতির ৫টি আপত্তিকর দাবীর মধ্যে অন্যতম হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সেনাবাহিনী ও সেনানিবাস প্রত্যাহার। জনসংহতি সমিতি এবং তাদের মূল শক্তি ভারত মনে করে পেশাদার সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থান করলে শান্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের এক কিলোমিটার এলাকাও স্থায়ীভাবে দখলে আনতে পারবে না। গত সিকি শতাব্দী যাবত সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করেও শান্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন অঞ্চলই তাদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি। এই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন স্থানেই তাদের কোন ঘাঁটি, অস্ত্রাগার বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। এমন লজ্জাজনক ব্যর্থতা বিশ্বের অন্যকোন গেরিলা যুদ্ধের ভাগ্যে খুব কমই ঘটেছে।

এর চেয়ে বড় কথা হলো এ পর্যন্ত শান্তিবাহিনী কখনোই সেনাবাহিনীর সাথে সম্মুখে সমরে লিপ্ত হতে কিংবা সেনাছাউনি আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। বড় জোর দু'চারজন সৈন্যের টহলের ওপর চোরাগোপ্তা হামলা (এ্যামবুশ) ছাড়া শান্তিবাহিনী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তেমন কার্যকর আক্রমণ হানতে পারেনি। এই কারণেই গত ২৫ বছরে (১৫ মার্চ ১৯৯৭) সেনাবাহিনীর অফিসার, জেসিও এবং সৈন্য মিলিয়ে ৩৩৯ জন নিহত এবং ৩৭১ জন আহত হন।

তাদের এ চরম ব্যর্থতার ইতি ঘটানো তথা পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার পথে সেনাবাহিনীই হলো কার্যকর প্রতিবন্ধকতা। তাই সম্মুখ সমরে লিপ্ত না হয়ে জনসংহতি সমিতি এবং তার প্রভু ভারত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নানা ধরণের ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক অভিযোগ ছড়িয়ে দেশে-বিদেশে তাদেরকে নির্মম হত্যাকারী ও মানবতাবিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। তারা বিভিন্নভাবে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তিকে কেবল কলঙ্কিতই করছেনা, বরং পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করার একটি যৌক্তিক ক্ষেত্র প্রস্তত করতে সচেষ্ট রয়েছে। তাদের একচেটিয়া প্রচারণার ফলে ইতোমধ্যে একশ্রেণীর এনজিও, মানবাধিকার সংস্থা, দাতাদেশ ও সংস্থা বিভ্রান্তিতে ভুগতে শুরু করেছে এবং বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করছে। তাদের প্রকৃত দেশপ্রেম, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও শৃংখলার মানকেও প্রশ্নের সম্মুখীন করছে। বাংলাদেশের ভিতরে একশ্রেণীর পেশাদার ও বিবৃতিবাজ বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করা হয়েছে যারা এসব অপপ্রচারকে সত্য হিসেবে ব্যবহার করে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়, প্রতিরক্ষা বাজেট হ্রাস করার দাবী জানায়, সর্বোপরি, সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে।

শান্তিবাহিনী তথা ভারত এবং তাদের ভাড়াটে মানবাধিকার সংস্থাসমূহ হতে উত্থাপিত সেনাবাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিশেষত, নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ যে কতখানি ভিত্তিহীন তার দু'একটি নজিরের দিকে তাকানো যাক।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণকারী হিসেবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্র এবং তাদের বিদেশী প্রভুরা নানা প্রকার ধর্ষণের চিত্রায়িত ভিডিও দেশে-বিদেশে প্রচার করে থাকে। কখনও কখনও ভারতসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ধর্ষণের দৃশ্য-সম্বলিত ভূয়া চিত্রায়িত করার দাবী করে থাকে।

ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের সাথে আলোচনা করে জানা গেছে এসব ভিডিও আসলে ত্রিপুরা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চিত্রায়িত নাটক বিশেষ। অর্থাৎ পরিকল্পিত উপায়ে কাউকে বাংলাদেশী নিরাপত্তাকর্মী সাজিয়ে উপজাতীয় মহিলাদের ওপর যৌন আক্রমণের দৃশ্য চিত্রায়িত করা হয়।

প্রায় একই ধরণের বিবরণ দিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী বাঙ্গালী এবং উপজাতীয়রা। তাদের মতে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আনীত ধর্ষণের কাহিনী ভিত্তিহীন ও সাজানো। তারা জানান ঃ শান্তিবাহিনী তথা ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' নিজস্ব উদ্যোগে ধর্ষণের সত্যতা বহির্বিশ্বে প্রচার ও প্রমাণের জন্য ধর্ষণের কিছু অভিনয় চিত্রায়িত করেছে। তাদের মতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শান্তিবাহিনীর সদস্যদেরকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কিংবা বি.ডি.আর-এর পোশাক পরিয়ে তাদেরকে কোন উপজাতীয় যুবতীর পেছনে ধাওয়া করতে বলা হয় এবং এক পর্যায়ে উক্ত যুবতীকে ৩/৪ জন বাঙালী সৈন্য ধর্ষণ করছে এমন একটা ভাব দেখানো হয়। সর্বশেষে দেখানো হয়, ধর্ষিতা মহিলা বিবস্ত্র কিংবা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছেন। এ ধরণের দৃশ্যের শট বেশ দূর থেকে নেয়া হয় এই বিশ্বাস জন্মানোর জন্য যে, শান্তিবাহিনীর লোককে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ধরে ফেলতে পারে এই আশংকায় দূর থেকে ধর্ষণের ছবি ক্যামেরাবন্দী করা হয়েছে। এ ধরণের দৃশ্য যে একান্তভাবেই পাতানো খেলা তার আরও একটি প্রমাণ হলো ক্যামেরায় কখনোই ধর্ষণকারীর মুখ দেখানো হয় না। কেবল তার পেছনের দিক দেখানো হয়। যিনি ধর্ষণকারীর ভূমিকায় অভিনয় করেন, তিনি বাঙ্গালী নন বলেই ধর্ষিতার মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখানো হলেও ধর্ষণকারীর মুখ দেখানো হয় না। আর কোন ক্ষেত্রে দেখানো হলেও সে মুখোশ পরিহিত অবস্থায় থাকে। এ ধরণের ধর্ষণের অভিনয় চিত্রিত করে ভারত সারাবিশ্বে বলে বেড়াচ্ছে যে, উপজাতীয় মহিলারা যৌন হয়রানির শিকার।

সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আনীত সর্বশেষ মিথ্যে প্রচারনা হলো শান্তিবাহিনীর সক্রিয় সহযোগী ও হিল উইম্যান ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমা অপহরণ নাটক। অভিযোগ করা হয়েছে যে, ১৯৯৬ সনের ১২ জুন রাতে সেনাবাহিনীর জনৈক অধঃস্তন অফিসার কল্পনা চাকমাকে তার গ্রামের বাড়ী হতে অপহরণ করেছে। এ অভিযোগের প্রকৃত তথ্য উদ্ধারের উদ্দেশ্যে দেশের কিছু দেশপ্রেমিক সাংবাদিক সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে অনেকটা ছদ্মবেশে কল্পনা চাকমার গ্রামসহ সন্নিহিত এলাকা সফর করে যেসব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, অভিযোগটি সম্পূর্ণ আষাঢ়ে গল্প বিশেষ।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, গত ২১ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানকারী কোন সেনা সদস্য নারীঘটিত কেলেঙ্কারীর সাথে সংশ্লিষ্ট হবার সামান্যতম সুযোগও পায়নি। এ ধরণের সন্দেহ সৃষ্টি হলেই তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, যার মধ্যে ন্যূনতম শাস্তি হলো চাকরিচ্যুতি। সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য তাই নারী কেলেঙ্কারীর সাথে জড়ানোর প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকেন। এ কারণে পার্বত্য অঞ্চলে মোতায়েনকৃত সেনাবাহিনীর কোন সদস্য কোন মহিলার সাথে সৌজন্য বিনিময়ের জন্যও কথা বলেননা।

সরজমিন তদন্তে দেখা গেছে কল্পনা চাকমা'র বাড়ী রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার ল্যান্যাঘোণা গ্রামে উগলছড়ি সেনা শিবির হতে মাত্র ৮০০ গজ দূরে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। তার বাড়ীর ১০০ গজ উত্তরে রয়েছে উগলছড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অপহরণ ঘটনার রাতে ঐ বিদ্যালয়ে অন্যান্যের মধ্যে প্রিসাইডিং অফিসার শিশকমুখ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জ্ঞানময় চাকমা এবং পুলিশের সুবেদার ইদ্রিছ আলীসহ ৫ জন পুলিশ কনস্টেবল উপস্থিত ছিলেন।

১২ জুন ১৯৯৬ সালে সকাল সাড়ে এগারটায় কল্পনার বড় ভাই কালেন্দী কুমার চাকমা ঘটনার বিবরণ দিয়ে বাঘাইছড়ি থানায় যে মামলা (নং ২ তারিখ ১২ জুন (রাত) ১৯৯৬) দায়ের করেন তাতে উল্লেখ করা হয় যে, ১২ই জুন দেড়টা থেকে ২টায় আনুমানিক ১০/১৫ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তাদের বাড়ীতে গিয়ে তাদেরকে ডেকে উঠায়। তাকে এবং তার ছোটভাই লাল বিহারী চাকমা ও কল্পনা চাকমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে চোখে বেঁধে ফেলে। তারা লাল বিহারীকে একটু দূরে নিয়ে যায় এবং একটি গুলি ছোঁড়ে লাল বিহারী ভয়ে পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর কল্পনাকে কালন্দীর নিকট হতে পৃথক করা হয় এবং কালন্দীও পালিয়ে যায়।

এখানে প্রশ্ন ওঠে ঃ

১. চোখ বাঁধা অবস্থায় তারা কিভাবে পালায়?

২. আপন যুবতী বোনকে নিশ্চিত বিপদের মুখে ফেলে দুই ভাই পালিয়ে যাওয়া কি স্বাভাবিক?

৩. তারা ঐ সময়ে পালিয়ে গিয়ে কেন চিৎকার করেনি? কেন ৮০০ গজ দূরে সেনা শিবির, অথবা ১০০ গজ দূরে প্রাথমিক বিদ্যালয় বা অন্য কোন প্রতিবেশীকে বিষয়টি জানায়নি কিংবা কেন তাদের সাহায্যে চায়নি?

৪. বোনকে খোঁজাখুঁজি না করে কিভাবে তারা বাকী রাত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে?

৫. অপহরণকালীন কল্পনা চাকমা স্বয়ং, তার দুই ভাই কিংবা বাড়ীর অন্যান্য সদস্যরা আগে বা পরে কেন চিৎকার করেনি ?

৬. অপহরণকারীরা যেহেতু কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হননি, তখন তারা গুলি করলেন কেন? আর পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো গোলযোগপূর্ণ এলাকায় গুলির শব্দ শুনে ৮০০ গজ দূরের সেনা শিবির হতে সৈন্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে আসবেন না এমন হতে পারে না। অথবা ১০০ গজ দূরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থানকারী ৬৫ জন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কি গুলির শব্দ শোনেনি? গুলি করলে তারা দু'ভাই-ই একেবারে অক্ষত থাকল কি ভাবে?

৭. থানার এজাহারে কোন ব্যক্তিকে চেনার কথা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে শান্তিবাহিনী ও তার শুভানুধ্যায়ীরা লেঃ ফেরদৌস নামক সেনাবাহিনীর একজন জুনিয়র অফিসারকে অপহরণের জন্য দায়ী করে পত্র-পত্রিকার বিবৃতি দেয়। ঘটনার দিন রাতে সংসদীয় নির্বাচন উপলক্ষ্যে উগলছড়ি ক্যাম্পে লেঃ ফেরদৌস ছাড়াও আরও তিনজন অফিসার উপস্থিত ছিলেন। এরা হলেন মেজর মমিনুর রহমান, ক্যাপ্টেন সৈয়দ মশিউর রহমান এবং লেঃ ফরিদ মাহমুদ। একজন লেঃ তার উর্ধতন অফিসারের উপস্থিতি উপেক্ষা করে একজন মহিলাকে অপহরণ করতে সাহস পাবে এমন সম্ভবনা বাস্তব বিবর্জিত।

৮. লেঃ ফেরদৌসসহ অন্যান্যদের যদি তারা চিনতেই পারেন, তবে থানায় কেন অপহরণকারীদের অজ্ঞাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে? কিংবা কেন তাৎক্ষণিকভাবে বা পরে সেনা শিবিরে তাদের নাম বলা হয়নি?

৯. তদন্তকারী পুলিশ কল্পনার বাড়ীতে গিয়ে তার পরিধানের পোশাক, বই-পত্র, প্রসাধন প্রভৃতি ব্যবহার্য দ্রব্যাদি দেখতে পাননি কেন? অপহরনকারীরা এসব কিছু নিয়ে গেছে তেমন অভিযোগ কেউই উত্থাপন করেনি? অপহৃত হলে এসব জিনিস ঘরেই থেকে যাবার কথা।

এ অপহরণ উপাখ্যান যে পূর্বপরিকল্পিত, বিশ্বব্যাপী এর তড়িৎ প্রতিক্রিয়া থেকেই তা প্রমাণিত হয়। কল্পনার অপহরণ সংবাদ উগলছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ সেনাছাউনীসমূহে, চট্টগ্রামস্থ ২৪ পদাতিক বাহিনীর ডিভিশন সদর দফতরে, এমনকি বাংলাদেশ সরকার কিংবা বাংলাদেশী সংবাদ মাধ্যমে পৌঁছার আগেই তা আগরতলা, কলিকাতা, নয়াদিল্লীস্থ 'র' কার্যালয়ে এবং ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমসমূহে পৌঁছে যায়। বাংলাদেশ বেতারের আগেই আকাশ বাণী ও দূরদর্শনসহ ভারতের বেসরকারী টিভি চ্যানেলসমূহ কল্পনা চাকমা'র অপহরণ সংবাদ প্রচার করে। ভারতীয় দূতাবাসসমূহ সারা বিশ্বে এই মিথ্যে অপহরণ উপাখ্যান ছড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন দেশ হতে অজ্ঞাত-অখ্যাত ৪০টিরও বেশী মানবাধিকার সংস্থাসহ দাতাদেশ ও সাহায্য সংস্থা কল্পনা চাকমার অপহরণের নিন্দা ও তার আশুমুক্তির দাবী-সম্বলিত চিঠি বাংলাদেশ সরকারের কাছে আসতে শুরু করে। সারা বিশ্বে কল্পনাকে নিয়ে হৈ চৈ পড়ে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা অকারণে আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা যেসব সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের কাছে বার্তা তথা দাবীনামা প্রেরণ করেছে তাদের মধ্যে রয়েছেঃ Caribbean Association For Feminist Research and Action (Trinidad & Tobago): Centre for study of Society & Secularism (India): Woman Living under Muslim Laws (Pakistan); Pous les Droits de l' Homme (France): Women's Network For Reproductive Rights (The Netherlands) Association Du Cote des Femmes (France), Groupe Non Violent Lecoin (France): Quest For the Eradication of Female Genital Mutilation (Canada); Women In Black Against War (Belgrade, Serbia). Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (Malaysia).

এ উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণপরিষদ, পাহাড়ী মহিলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সব প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও স্মারকলিপি যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তবে নিম্নোক্ত পারস্পারিক স্ববিরোধিতা ও অসংলগ্নতা ধরা পড়ে ।

১২জুন প্রদত্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছেঃ একদল বাঙ্গালী সশস্ত্র অবস্থায় হামলা চালিয়ে কল্পনা চাকমাকে নিজ বাড়ী হতে অপহরণ করে নিয়ে যায়। কিন্তু পরের দিন (১৩ই জুন) বলা হয় যে, সেনাবাহিনীর ১০ জন জোয়ান স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে লেঃ ফেরদৌসের নেতৃত্বে কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করে।

১৬ জুন ১৯৯৬ সালে রাঙামাটি জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরিত স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে, লেঃ ফেরদৌসের নেতৃত্বে ৮/৯ জন সেনাসদস্য এবং ভিডিপি সদস্য নূরুল হক ও সালেহ আহম্মদসহ আরো কয়েকজন ভিডিপি সদস্য কল্পনা চাকমাসহ তার দুই ভাইকে অপহরণ করে।

২৫ জুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর প্রেরিত স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে, লেঃ ফেরদৌসের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ও ভিডিপি সদস্যরা কল্পনাকে অপহরণ করে।

উপরোক্ত পারস্পারিক স্ববিরোধিতা ছাড়াও উল্লেখ করতে হয় যে, কল্পনা চাকমা কথিত অপহরণ মামলা নথিভুক্ত করার পর বাঘাইছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কল্পনা চাকমার বাড়ী তদন্ত করতে যান। তিনি কল্পনা চাকমার কাপড়-চোপড়, বই-পত্র কিছুই বাড়ীতে পাননি। কেউ তাকে জোরপূর্বক অপহরণ করলে তার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি অবশ্যই ঘরে পাওয়া যেত।

উগলছড়ি সেনাশিবির এবং স্থানীয় লোকজনের সাথে আলাপ করে জানা গেছে যে, লেঃ ফেরদৌস কল্পনা উধাও হবার অব্যবহিত আগে শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে কতিপয় সফল অভিযান চালিয়ে শান্তিবাহিনীর মাথা ব্যথাতে পরিণত হয়েছিলেন। তাই তাকে ঐ শিবির হতে প্রত্যাহার করার পরিবেশ তৈরীর জন্য উপরোক্ত অপহরণ উপাখ্যানের সাথে তাকে জড়ানো হয়েছে। এই অপহরণ উপাখ্যানের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল লেঃ ফেরদৌসকে উগলছড়ি সেনাশিবির হতে প্রত্যাহার করানো এবং সদ্য নির্বাচিত সরকারের ওপর স্বদেশী-বিদেশী চাপ সৃষ্টি করা। আর দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের জন্য আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলা, যার সাথে তাদের দাবীর সামঞ্জস্য রয়েছে। একই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে তো বটেই রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবনে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এবং তাদের সহযোগীরা বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা বিবৃতি দেয়, একশ্রেণীর সংবাদপত্রসেবী সেনাবাহিনীর চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে।

অন্যদিকে নিরপেক্ষ মানবাধিকার সংস্থা এবং সাংবাদিকদের সরজমিন তদন্তে দেখা গেছে যে, কল্পনা তারই সতীর্থ সহযোগীদের রণকৌশলের অংশ হিসেবে তাদের সাথেই উধাও হয়েছে। পরবর্তীকালে এই সত্যও বেরিয়ে আসে যে, কল্পনা চাকমা ভারত সরকারের সম্মানিতা অতিথি হিসেবে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থান করছে।

সেনাবাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেসব অভিযোগ জনসংহতি সমিতি, তার সহযোগী সংগঠনসমূহ, ভারতীয় কূটনীতিক ও প্রচার মাধ্যম, দেশী-বিদেশী সংবাদ মাধ্যম ও মানবাধিকার সংস্থা, ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা উত্থাপন করছে, সেগুলো যে বাস্তবতা বিবর্জিত ও ভিত্তিহীন উপরোল্লিখিত বিশ্লেষণে তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

সেনাবাহিনী, বিশেষতঃ অস্ত্রবিরতির পর, তাদের শিবিরেই অবস্থান করছে। তাদের ওপর কড়া নির্দেশ রয়েছে যে, আক্রান্ত না হলে তারা কাউকে আক্রমণ করতে পারবে না। সশস্ত্র না হলে তারা কোন উপজাতীয়কে গ্রেফতার করাতো দূরের কথা, সন্দেহবশতঃ রাস্তায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না। তাদের ভূমিকা একান্তভাবেই রক্ষনাত্মক। অস্ত্র বিরতি চলা সত্বেও শান্তিবাহিনী বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ৯০১ বার (২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ পর্যন্ত) তা লঙ্ঘন করছে। কিন্তু সেনাবাহিনী অস্ত্র বিরতি লঙ্ঘন করছে, এমন একটি নজিরও নেই। এমনকি শান্তিবাহিনী অস্ত্রবিরতি লঙ্ঘন করা সত্বেও তাদেরকে পাকড়া করতেও সেনাবাহিনী তৎপর হয়নি, কেননা তাতেও অস্ত্রবিরতি লঙ্ঘিত হবে।

অস্ত্রবিরতির আগে ও পরে শান্তিবাহিনী সেনাবাহিনীকে ব্যাপক মাত্রায় প্রতিক্রিয়া দেখানোর মতো উত্যক্ত করলেও সেনাবাহিনী ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে। এমনকি চরম দেশদ্রোহীতামূলক অপরাধে ধৃত খুনী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সাথেও সেনাবাহিনী অত্যন্ত মানবিক আচরণ করে। চিটাগাং হিল ট্রাক্টস কমিশনকে প্রদত্ত সাক্ষাতকারে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত জনৈক সেনাকর্মকর্তার বক্তব্যের প্রতি তাকালেই অনুমতি হয় সেনাবাহিনী আসলে মানবাধিকারের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধাশীল। তার বক্তব্য ঃ

"My man knows how he has to behave with the prisoners. We have interrogation. but no manhandling or beating is used. I'd like to know if there is any excess. Everybody is kept in civil jail. There is no military jail here. Cordon and search tactics have been banned here since 1984. ------ No one below the rank of officer can interrogate. No body can enter anybody's house".[১২২]

(ভাবানুবাদ ঃ আমাদের সেনাবাহিনী জানে কিভাবে বন্দীদের সাথে আচরণ করতে হয়। আমরা (বন্দীদের) জিজ্ঞাসাবাদ করি, কিন্তু কাউকে মারধর করিনা বা পিটাই না। কোন বাড়াবাড়ি হলে আমি তা জানতে চাই। সবাইকে বেসামরিক কারাগারে রাখা হয় এখানে (পার্বত্য চট্টগ্রামে) কোন সামরিক

Life is Not Ours : Ibid, P.48

কারাগার নেই। ১৯৮৪ সাল হতে এখানে অবরোধ (কিংবা ঘেরাও) এবং তল্লাশী নিষিদ্ধ। অফিসার পর্যায়ের নীচে (কোন সৈন্য) কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ গ্রেফতার করতে পারেনা। কেউ কারো গৃহে প্রবেশ করতে পারেনা।)

এ ধরণের নমনীয় আচরণ বিশ্বের অন্যান্য বিচ্ছিন্ন-প্রবণ অঞ্চলে, এমনকি ভারতেও যে নেই তা ইতোমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। আমাদের সেনাবাহিনী শান্তিবাহিনীর উস্কানিমূলক গোলাবর্ষণ, কিংবা চোরাগোপ্তা হামলা মোকাবেলায় অধৈর্য হয়ে পাল্টা বেপরোয়া সামারিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, ধীর-স্থিরভাবে বিভিন্ন শান্তকরণ কর্মসূচীর মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে প্রতিহত করার বেসামরিক পন্থা অবলম্বন করেছে। ■

মানবাধিকার সংস্থা

সারা বিশ্বে এমন কিছু সৌখিন ও ভাড়াটে মানবাধিকার সংস্থা গড়ে ওঠেছে, যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সর্বোপরি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গণহত্যা ও দেশদ্রোহীতামূলক কার্যক্রমের নির্মমতা বিবেচনা না করে মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবাস্তব, ভিত্তিহীন, একপেশে এবং পক্ষপাতদুষ্ট তথ্য ও কাহিনী প্রচার করে। (১) বিশ্ব সমাজের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ম্লান করছে; (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে আন্তর্জাতিক রূপ দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে; (৩) সর্বোপরি , পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসী বিদেশী চরদের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে।

কোন কোন মানবাধিকার সংস্থার অতি উৎসাহী ভূমিকা প্রমাণ করে যে, কেবলমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে নাক গলানোর মধ্যেই তাদের কার্যক্রম সীমিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বাঙ্গালী, সেখানে নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অতিরঞ্জিত দুর্নাম রটালেও শান্তিবাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অত্যাচার, নির্মমতা, হত্যা, ধর্ষণ, গুম, অপহরণ, অগ্নিসংযোগ, চাঁদাবাজি, সর্বোপরি, একটি দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করার অপরাধ প্রসঙ্গে বাস্তব অর্থে নিরবতা পালন করে।

ইতোমধ্যে কেবলমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে কতিপয় মানবাধিকার সংস্থাকে মাঠে নামানো হয়েছে। এ ধরণের কোন কোন সংস্থার আত্মপ্রকাশের পেছনে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা "র" এর প্রত্যক্ষ পৃষ্টপোষকতা সক্রিয় ছিল বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। কারণ এসব সংস্থা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বর্বরোচিতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হওয়া সত্বেও সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরব থাকে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যেসব সংস্থা চাকমাদের অনুকূলে কাজ করতে প্ররোচিত হচ্ছে সেগুলো হলো অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল (ইউ. কে), অ্যান্টি স্লেভারি ইন্টারন্যাশনাল(ইউ. কে), দি অরগানাইজিং কমিটি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ক্যাম্পেন(নেদারল্যান্ডস), হিউমিনিটি প্রটেকশান ফোরাম (ইন্ডিয়া), সাউথ এশিয়া হিউম্যান রাইটস্ ডকুমেন্টেশান সেন্টার (ইন্ডিয়া), কমিশন ফর পীস অ্যান্ড

জাস্টিস (বাংলাদেশ), কো-অর্ডিনেশান কাউন্সিল ফর হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ (বাংলাদেশ), এবং চিটাগাং হিলট্রাক্টস কমিশন (নেদারল্যান্ডস)।[১২৫]

ভারতীয় গোয়েন্দাচক্র, এর প্রচার মাধ্যম এবং দূতাবাসসহ সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অসত্য ও বানোয়াট তথ্য ও ঘটনা প্রচার করে গণতান্ত্রিক বিশ্বের মানবতাবাদী সংস্থাসমূহকে নানাভাবে প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত করছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে মুসলিম বিদ্বেষী কিছু কট্টর খ্রিস্টান মিশনারী, যারা তথাকথিত উন্নয়নমূলক কাজের আবরণে সহজ-সরল উপজাতীয় জনগণকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার কাজে ব্যস্ত। তারা মনে করে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বাংলাদেশকে দূরে রাখা গেলে এর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া ও ধারাবাহিকতা স্থবির হয়ে যাবে, পার্বত্য উপজাতীয়দের মধ্যে সচেতনতা আসবে না, ফলে তাদের দারিদ্রতা ও অজ্ঞতা, সর্বোপরি সহজ-সরল বিশ্বাসকে ব্যবহার করে তাদেরকে দ্রুত খ্রিস্টানে পরিণত করা সম্ভব হবে। এই জন্য এনজিও নামক খ্রিস্টান মিশনারীগুলো বাংলাদেশের রক্ষাণাত্মক ও গঠনমূলক ভূমিকার তুখোড় সমালোচক।

এনজিওগুলোর মিথ্যে প্রচারণা কিভাবে পাশ্চাত্যের মানবতাবাদীদের প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন করছে, তার বাস্তব প্রমাণ হলো CHITTAGONG HILLTRACTS COMMISSION ১৯৯৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার অবস্থা সম্পর্কিত "Life is not ours" শীর্ষক যে রিপোর্ট এ সংস্থাটি প্রকাশ করেছেন তার প্রারম্ভিক মন্তব্যে স্বীকার করা হয়েছে যে, কতিপয় এনজিও এর পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে এই সংস্থাটি আত্মপ্রকাশ করেছে। মন্তব্যটি শুনুন ঃ

"For over 20 years non-govermental organisations have reported disturbing accounts of killing, torture. rape, arson, forced relocation and the cultural oppression of the hill peoples of Chittagong Hill Tracts in Bangladesh. Since 1983. these amounts have increased considerably with reports published by Amnesty International, Anti-slavery International. the Organising Committee Chittagong Hill Tracts Compaign (Netherlands). Gesellschaft fur Bedrohte Volker (Germany). International Work Group for Indigenous Affairs

১২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ সীমান্তের রাজনীতি ও সংগ্রাম ঃ পৃঃ ৮২।

(Denmark). Parliamentary Human Rights Group and Survival International (UK). among others".[১২৫]

(ভাবানুবাদ ঃ বিগত ২০ বছর যাবত বেসরকারী সংস্থাসমূহ (এনজিও) বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, জোরপূর্বক স্থানান্তরণ, এবং সাংস্কৃতিক অবদমন সংক্রান্ত বিরক্তিকর বিবরণী প্রচার করে আসেছ।

এ্যামনেষ্টী ইন্টারন্যাশনারল, এ্যান্টিস্লেভারি ইন্টারন্যাশনাল, (নেদারল্যান্ডস) দ্য অর্গানাইজিং কমিটি চিটাগাং হিল ট্যাক্টস ক্যাম্পেন, (জার্মানী) গিসেলচ্যাপ্ট ফার বেডরোট ভলকার, (ডেনমার্ক) আদিবাসী বিষয়াবলী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কর্মদল; (যুক্তরাজ্য) সংসদীয় মানবাধিকার গ্রুপ এবং সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতি সংস্থা ১৯৮৩ সাল হতে তাদের প্রচারণা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে।)

এই রিপোর্টের মন্তব্য, বক্তব্য এবং রিপোর্ট সংগ্রহের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যাবে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক প্রণীত এ ধরণের রিপোর্ট একপেশে, ভূয়া ও উদ্দেশ্যপ্রনোদিত বলে প্রকৃত পরিস্থিতির প্রতিফলন এসব রিপোর্টে ঘটেনি।

চিটাগাং হিল ট্রাক্টস কমিশনের ৪ জন প্রতিনিধি ১৯৯৩ সালের নভেম্বর ভারতের ত্রিপুরাস্থ শরণার্থী শিবির (৫ দিন) এবং বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম (২১ দিন) সফর করেছেন। এরা ছিলেন (১) তেরেসা এ্যপারিনো (ডেনমার্ক), জেনিক এ্যারেন্স (নেদারল্যান্ড), আন্দ্রে গ্রে (যুক্তরাজ্য) এবং উলফগ্যান্ড মী (জার্মানী)।

এই সংস্থার রিপোর্ট সংগ্রহ পদ্ধতির প্রতি নজর দিলেই বুঝা যায় সমুদয় মানবাধিকার সংস্থাসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সত্যিকার পরিস্থিতি এবং তা নিরসনে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলী সম্পর্কে কেমন অবাস্তব এবং কাল্পনিক তথ্য বিশ্বময় প্রচার করছে।

সমুদয় মানবাধিকার সংস্থা, তাদের পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থকরা যেসব বিষয় যথার্থভাবে হয়তো অনুধাবন করেন নি সেগুলো হলো ঃ

---

[১২৫] Chittagong Hill Tracts Commission : Life is not Ours; Land And Human Rights In Chittagong Hill Tracts, Bangladesh : The Report of the Chittagong Hill Tracts Commission : May : 1994.

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সেখানে বাংলাদেশ কোন ভাবেই দখলদার শক্তি নয়। যেকোন মূল্যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে টিকিয়ে রাখার সার্বভৌম ও নৈতিক অধিকার বাংলাদেশের রয়েছে;

২. পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বাংলাদেশের সৃষ্ট নয়। বরং ইহা চাকমা উপজাতিভুক্ত কিছু বিদেশী চরের বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দেয়া সমস্যা। বাংলাদেশ সেখানে বিদেশী চর এবং দেশদ্রোহীকে প্রতিহত ও শায়েস্তা করার জন্য সীমিত সংখ্যক নিরাপত্তাকর্মীকে মোতায়েন করেছে। যাদের ভূমিকা রক্ষনাত্মক, আক্রমণাত্মক নয়; এবং

৩. সর্বোপরি, যেকোন মূল্যে দেশের অখন্ডতা, রক্ষার ক্ষমতা ও অধিকার বাংলাদেশের রয়েছে এবং তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই।

কমিশন ত্রিপুরা রাজ্যে ৫ দিন অবস্থান করে ৩টি উপজাতিভুক্ত সর্বমোট ৮৫ জন শরণার্থীর সাক্ষাতকার নেয়। এই ৮৫ জনের মধ্যে ৬০ জন চাকমা, ৭ জন মারমা, ১৭ জন ত্রিপুরা, এবং অন্য একজন সাঁওতাল। (যদিও আদমশুমারী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন সাঁওতাল বাস করে না।)

সাক্ষাৎকার গ্রহণে কমিশনকে সাহায্য করেছে আগরতলাস্থ চাকমা দোভাষীরা। কমিশনের সদস্যদের সাক্ষাৎকার বাণীবদ্ধ করার জন্য টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করতে দেয়া হয়নি এবং সমুদয় সাক্ষাৎকার ছিল মৌখিক, যা দোভাষীর মাধ্যমে শুনে তারা লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে সম্পূর্ণ রিপোর্টে বর্ণিত ঘটনাবলীর সত্যতা, যথার্থতা ও বাস্তবতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ঃ

১. টেপ রেকর্ডে সবগুলো সাক্ষাৎকার বাণীবদ্ধ করা হলে বুঝা যেত দোভাষী কমিশনকে যে ভাবানুবাদ বলেছেন তার সাথে শরনার্থীদের বক্তব্যের কতখানি মিল রয়েছে। Motivated দোভাষী আসলে সত্যিকার অর্থে কি প্রশ্ন করেছেন এবং শরণার্থীরাই বা কি উত্তর দিয়েছেন তার মাথামুন্ড কিছুই কমিশন সদস্যগণ বুঝতে পারেননি। Motivated দোভাষীরা সত্য-মিথ্যে, বা অতিরঞ্জিত যা-ই বলেছেন সদস্যদের তা-ই বিশ্বাস করতে হয় এবং তারা তা-ই লিপিবদ্ধ করেছেন। ভারত সরকার দোভাষীদের মাধ্যমে মিথ্যে তথ্য সরবরাহ করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করতে দেয়নি। টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করতে দেয়া হলে দোভাষী মিথ্যের আশ্রয় নিতে পারত না। সুতরাং সমুদয় রিপোর্ট নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

২. ভারতের দাবী মোতাবেক ৫০ সহস্রাধিক শরনার্থীর মধ্যে মাত্র ৮৫ জনের এবং ১৩টি উপজাতির মধ্যে ৩টি উপজাতিভুক্ত শরণার্থীর সাক্ষাৎকার নেয়া যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক নয়।

৩. যে ৮৫ জনের সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে তাদেরকে বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও কমিশন সদস্যদের হার মানতে হয়েছে। এই ৮৫ জন কিংবা আরো বেশী সংখ্যক শরণার্থীকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার চররা পূর্বাহ্নেই প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করে রেখেছিল বলে মনে করা হয়। কোন শরণার্থী কি বলবে, কি ধরণের অভিব্যক্তি দেখাবে, কি ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে এবং তাদের উত্তরে কি বলতে হবে, ইত্যাদি সব কিছুই সাজানো এবং পূর্ব-নির্ধারিত। শরণার্থীরা যে তাদের ইচ্ছে মতো কথা বলতে পারেন না তার সাক্ষ্য দিয়ে বাংলাদেশী সাংবাদিক নুরুর রহমান ত্রিপুরাস্থ শরণার্থী শিবিরে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ যেখানেই শরণার্থীদের সাথে কথা হয়েছে সেখানেই ছিল তৃতীয় আরেকজন। বাড়তি কিছু বলতে গেলেই ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়া হয়েছে।[১২]

৪. শরণার্থীদেরকে এমন ভাষায় প্রশ্ন করা হয় যা প্রতিনিধিরা বুঝতেই পারেননি। সুতরাং প্রশ্ন করার ওপরও তাদের হাত ছিলনা। অথবা যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে বলে তাদেরকে জানানো হয়েছে, বাস্তবে হয়তো সে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়নি।

এ ধরণের অবস্থার জন্য আলোচ্য মানবাধিকার কমিশন আংশিক দায়ী। কারণ তারা ভারতীয় গোয়েন্দাচক্রের পূর্ব-পরিকল্পিত ব্যবস্থা ও শর্তকে উপেক্ষা করতে পরেননি। ভারতের দাবী অনুযায়ী তৎকালীন ৫০ হাজার শরণার্থীর মধ্যে মাত্র ৮৫ জনের সাক্ষাৎকার কতখানি প্রতিনিধিত্বমূলক এবং এই স্বল্পসংখ্যক শরণার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত অবস্থা এবং ঘটনাবলী কতখানি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছে তা রীতিমত জিজ্ঞাসার বিষয় হিসেবে বিবেচিত।

এই ৮৫ জনের সবাই বা আংশিক যে জনসংহতি সমিতির সক্রিয় কর্মী কিংবা সমর্থক অথবা শান্তিবাহিনী, পাহাড়ী ছাত্রপরিষদ, পাহাড়ী গণপরিষদ, হিল ওম্যান ফেডারেশন প্রভৃতি অঙ্গ সংগঠনের সক্রিয় কর্মী বা সদস্য নয়, তেমন নিশ্চয়তা কমিশনের কাছে ছিল না।

আলোচ্য কমিশনের আরো কিছু অসংগতির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে কমিশন সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ভাড়াটে হিসেবে কাজ করেছে।

---

[১২] দৈনিক সংবাদ ঃ ঢাকাঃ ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।

১. শান্তিবাহিনী যে ভারতের প্ররোচনায় এ যুদ্ধ বাধিয়েছে, সে সম্পর্কে কমিশন কোন তথ্য বা সাক্ষাতকার প্রকাশ করেনি: যদিও পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙ্গালী-উপজাতি নির্বিশেষে বহু বাংলাদেশী এ সমস্যার জন্য ভারতকে দায়ী করে কমিশনের সম্মুখে বক্তব্য রেখেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এ কমিশন ভারতের পৃষ্টপোষকতায় বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে হেয় প্রতিপন্ন করার এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অনুকূলে বিশ্ব জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'র' এর ইঙ্গিতে মাঠে নেমেছিল। এই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও কমিশনের রিপোর্ট সে বিষয়ে কোন তথ্য বা মন্তব্য নেই। অথবা এ হেন জঘন্য অপরাধ হতে ভারতকে নিবৃত্ত হবার জন্য কোন উপদেশ বা পরামর্শও নেই।

২. এ রিপোর্টের ৯৯ পৃষ্ঠায় উপজাতীয়দের বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ (ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করানো) সংক্রান্ত উপ-অধ্যায় রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, জামায়াত-ই-ইসলামী বাংলাদেশ নাকি পার্বত্য চট্টগ্রামে বল-পূর্বক মুসলমানকরণের কাজে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু জামাতে ইসলামী কোন জায়গায়, কাকে, কখন বা কত জন উপজাতীয়কে মুসলমান করেছে তার কোন তথ্য কিংবা পরিসংখ্যান কমিশন রিপোর্টে নেই। একই রিপোর্টে রাবেতা আল ইসলামীর বিরুদ্ধেও ধর্মান্তকরণের অভিযোগ রয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, রাবেতা ১৭ জন উপজাতীয়কে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছে। কিন্তু ধর্মান্তরীতদের নাম, ঠিকানা, কিংবা ধর্মান্তকরণ সংক্রান্ত ঘটনা কিংবা এতদসংক্রান্ত কোন প্রামাণ্য তথ্য প্রদান করেনি। রাবেতা আলমে ইসলামী বাংলাদেশ-এর পরিচালক মীর কাসেম আলীর সাথে সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হলে তিনি কমিশনের রিপোর্টে বর্ণিত অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা প্রচারনা বলে উল্লেখ করেন। তিনি জানিয়েছেন যে, রাবেতা সম্পূর্ণ মানবসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। পার্বত্য চট্টগ্রামে এর মাত্র দু'টো সীমিত পরিসরের শাখা রয়েছে এবং ধর্মান্তকরণের কোন পরিকল্পনা আল রাবেতার নেই।

এছাড়া অভিযোগ করা হয়েছে যে, বাঙ্গালীরা চাকমা যুবতীদের ফুসলিয়ে হোক কিংবা অপহরণ করে হোক নিয়ে যায় এবং মুসলমানে পরিণত করে। এ গ্রন্থ রচনাকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য দীর্ঘদিন আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থান করেছিলাম। কমিশন রিপোর্টে বর্ণিত ধর্মান্তকরণ, মহিলাদের ফুসলানো এবং অপহরণসহ বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে উপজাতীয়দের সাথে আলাপ করেছি। তারা সবগুলো অভিযোগই অস্বীকার করেছেন। তবে তারা জানান যে, কোন কোন উপজাতীয় যুবতী বাঙ্গালীদের

সাথে স্বেচ্ছায় পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবার দু'একটি ঘটনা আশির দশকে ঘটেছিল। দু'একজন উপজাতীয় স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মও গ্রহণ করেছে। কিন্তু পরিকল্পিত উপায়ে কিংবা সাংগঠনিকভাবে কোন উপজাতীয়কে জোরপূর্বক কিংবা লোভ দেখিয়ে মুসলমান বানানোর ঘটনা তাদের জানা নেই। আমার বক্তব্যে যারা দ্বিমত পোষণ করেন তারা তাদের মতের অনুকূলে তথ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

৩. কমিশন সমুদয় বিবরণ কেবল চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত রেখেছে। সমুদয় রিপোর্টে মাত্র ২ জন বাঙ্গালী মহিলার স্বামীদের অপহরণ ও তাদের হত্যা সংক্রান্ত সাক্ষাৎকার স্থান পেয়েছে। ২৫ হাজার বাঙ্গালী নিহত হওয়ার, অগণিত মহিলা ধর্ষিতা হবার, শিশুহত্যা করার, তাদের বসতিতে অগ্নি সংযোগের যে হাজারো ঘটনা ঘটেছে, তার বিবরণ রিপোর্ট নেই।

৪. উপজাতীয়দের মানবাধিকার লঙ্গনের যেসব ঘটনা ও কাহিনী কমিশন রিপোর্ট উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো নিছক আষাঢ়ে গল্প বই কিছুই নয়। যেমন রিপোর্টের ৪৯ পৃষ্ঠায় ত্রিপুরায় অবস্থানকারী নাম-ঠিকানাবিহীন জনৈক শরণার্থীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, ১৯৮৬ সনের ১০ ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন ফারুক ও অন্য ৩১ জন সৈন্য ৭১ জন উপজাতীয়সহ তাকেও গ্রেফতার করে। সৈন্যরা তাকে রশি দিয়ে বাঁধে এবং মেশিন গান দিয়ে তার ওপর গুলি চালালে সে "অজ্ঞান" হয়ে যায়। এখন কথা হলো এতো কাছ হতে মেশিন গানের গুলি চালানো হলে লোকটি মুহূর্তের মধ্যে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাবার কথা।

মেশিনগানের গুলির ব্যাপারে যার সামান্যতম ধারণা আছে তিনি অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, এ ধরণের গুলি খাওয়া লোকটির বেঁচে থাকার কোন প্রশ্ন ওঠেনা। কারণ মেশিন হতে প্রতি সেকেন্ডে কমপক্ষে ৫টি বুলেট বের হয়। কাছ হতে মেশিনগানে ১ সেকেন্ড গুলি চালালেও লোকটি বাঁচার কথা নয়। এ ধরণের অবাস্তব কাহিনীকে কমিশন মানবাধিকার লঙ্গনের কাহিনী বলে চালিয়েছেন।

এ ধরণের বহুবিধ অসত্য ও ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কমিশন তাদের প্রতিবেদন তৈরী করেছিল বলে বিশেষজ্ঞগণ সুস্পষ্টভাবে দাবী করেন। তাদের মতে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার জন্যই ভুয়া তথ্যসম্বলিত এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।

শুধু হিল ট্রাক্টস কমিশনই নয়, এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালসহ আরো কতিপয় মানবাধিকার সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের কথিত মানবাধিকার

লঙ্ঘন প্রসংগে একই ধরণেই ভিত্তিহীন প্রচারণা চালিয়ে আসছে। কিন্তু তাদের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেই দেশী-বিদেশী জনমত বিভ্রান্ত হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভিত্তিহীন কল্প-কাহিনী প্রচারকারী দেশী-বিদেশী মানবাধিকার সংস্থাগুলো যে ভাড়াটে এবং তাদের সমুদয় কার্যক্রম যে সম্পূর্ণরূপে একপেশে ও উদ্দেশ্যপ্রনোদিত তার বহুবিধ প্রমাণ তারা ইতোমধ্যেই স্থাপন করেছে।

পার্বত্য মহিলা সমিতির নেত্রী কল্পনা চাকমা উধাও হয়ে যাবার পর প্রায় শতাধিক অজ্ঞাত-অখ্যাত প্যাডসর্বস্ব মানবাধিকার সংস্থা তার অনুকূলে বাংলাদেশে প্রতিবাদপত্র ও স্মারকলিপি প্রেরণ করে। কিন্তু রাঙ্গামাটির বাঘাছড়িতে ২৮জন বাঙ্গালীকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর কোন একটি বিদেশী মানবাধিকার সংস্থার পক্ষ হতেও কোন প্রতিবাদ বা নিন্দা জানানো হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বয় ও শান্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুবিনয় চাকমাকে প্রকাশ্যে গুলি হত্যা করা হয়। শান্তি বাহিনীর সাবেক সদস্য সুবিনয় চাকমা শান্তি বাহিনী ত্যাগ করে শান্তির সপক্ষ্যে আজীবন লড়াই করেছেন। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তার অবদান অপরিসীম। এতদসত্ত্বেও কোন একটি মানবাধিকার সংস্থাও সুবিনয় চাকমাকে হত্যা করার পর কোন ধরণের নিন্দা জ্ঞাপন করেনি। নিন্দা করেনি দীঘিনালা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান কালিজয় চাকমা কিংবা বেতছড়ির বিভূতি রঞ্জন কারবারী নিহত হবার পর।

অথচ এরাই পার্বত্য চট্টগ্রামে নুন থেকে চুন খসলে বিশ্বব্যাপী শোরগোল শুরু করে। শান্তিবাহিনীর হত্যা, অপহরণ, নির্যাতন তথা মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদ ও নিন্দা না করে এরা প্রমাণ করেছে যে, এরা জনসংহতি সমিতি তথা বিদেশী চর বিদ্রোহীদের ভাড়াটে।

মানবাধিকার সংস্থাসহ শান্তিবাহিনীর স্বদেশী-বিদেশী পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের বুঝতে হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দখলীকৃত উপনিবেশ নয়: ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অভিন্ন আইন ও প্রশাসন এবং শাসনতন্ত্রের আওতায় ইহা পরিচালিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব এখানেও সমানভাবে প্রযোজ্য ও কার্যকর। বাংলাদেশ ভূ-খন্ডের কোন অংশ কোন সম্প্রদায় বিশেষকে ইজারা দেবার কোন সুযোগ নেই। সম্প্রদায় বিশেষের অন্তর্ভুক্ত সামান্য সংখ্যক বিদেশী চরের উচ্চাভিলাসসুলভ ভ্রান্তির কাছে দেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা জলাঞ্জলি দেয়া যায়না। যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী প্রতিটি উপজাতীয়কে (যদিও চাকমা সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ শান্তিবাহিনীর সমর্থক) তথাকথিত জুম্মল্যান্ডের দাবীদার বলে গণ্য করা হয়,

তথাপি তারা হবে মোট জনসংখ্যার মাত্র .৪৫ শতাংশ। মাত্র .৪৫ শতাংশ বহিরাগত উপজাতীয়দের অন্যায় ও অযৌক্তিক দাবীর মুখে ৯৯.৫৫ শতাংশ জনগণের মাতৃভূমির ১০ শতাংশ ছেড়ে দেয়া কোন মানবাধিকার বা গণতন্ত্রের আওতার মধ্যে পড়ে? এ ধরণের আঞ্চলিক বা সম্প্রদায়গত দাবী কখনই মানবাধিকার বা গণতন্ত্রসম্মত হতে পারে না। কেউ উপজাতি বলেই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী বা দাবীদার হবে, আর ভূমিজ সন্তানরা অবৈধ চাপের মুখে তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে দেবে এর নাম গণতন্ত্র নয়। মানবাধিকার কেবল উপজাতিদের জন্যই সংরক্ষিত নয়, সমগ্র দেশবাসীর জন্য। মানবাধিকারের মোড়লরা এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করতে পারেন কি? ■

বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

বন্ধুবেশী ভারত সামরিক ও কূটনৈতিক পন্থায় বাংলাদেশকে কুপোকাত করতে ব্যর্থ হয়ে বাংলাদেশেরই কিছু সংখ্যক রাজনীতিক, সাংবাদিক, লেখক, শিক্ষক তথা বুদ্ধিজীবীকে মাঠে নামাতে সচেষ্ট হয়। তথাকথিত প্রগতিশীলতার আবরণে এরা পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে অতি দরদী হয়ে ওঠে। রহস্যজনক উদ্দেশ্যে এরা পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনাবলীর জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অভিযুক্ত করে। এমনকি দেশের অখন্ডতা রক্ষার মহান দায়িত্বে নিয়োজিত আমাদের বীর সেনাবাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে প্রত্যাহার করার পক্ষে যুক্তি খুঁজে বেড়ায়। এদের কেউ কেউ অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে লোগাং ও নানিয়ার চর অঞ্চলে ছুটে গিয়েছেন এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী চাকমাদের সুরে তাদেরই সৃষ্ট হত্যাকান্ডের সমুদয় ঘটনার জন্য বাংলাদেশ সরকারকেই দায়ী করেছেন। তারা একবারও ভেবে দেখেননি যে, ঐসব অঞ্চলের হত্যাকান্ডের পটভূমি সন্ত্রাসীরই সৃষ্টি করেছে।

লোগাং, নানিয়ার চর, বাঘাইছড়ি প্রভৃতি হত্যাকান্ডের মতো জঘন্য হত্যাকান্ড সন্ত্রাসীরা বহুবার চালিয়েছিল। চলমান তথাকথিত অস্ত্র বিরতির আগে এবং পরে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বাঙ্গালী শিশু-বৃদ্ধ-নারীরা প্রতিনিয়ত চাকমা সন্ত্রাসীদের হিংস্র আক্রমণের সম্মুখীন হয়। প্রতিনিয়ত মার খাওয়া বাঙ্গালীরা তাদের নিহত আত্মীয়দের লাশ সুদূর পার্বত্য অঞ্চল থেকে এমনকি ঢাকায় এনে শোক মিছিল করেছিলেন। এরপরেও সন্ত্রাসীদের বর্বরতা হ্রাস না পাওয়ায় বাঙ্গালী ও উপজাতীয়রা রাঙামাটি থেকে লংমার্চ করে ঢাকায় এসেছিলেন। আমাদের কথিত মানবতাবাদী রাজনীতিক বুদ্ধিজীবীরা ঢাকায় আনিত বাঙ্গালীদের লাশ পর্যন্ত দেখত যাননি। কিংবা সামান্যতম সহানুভূতিও প্রদর্শন করেন নি। অথবা গত ২৪ বছরে ২৫ হাজার বাঙ্গালী চাকমা সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হবার পর এরা কখনো প্রতিবাদ জানান নি। এমনকি ভারতের সহযোগিতায় স্বদেশকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত হতে বিরত থাকার জন্য চাকমা সন্ত্রাসীদের প্রতি অনুরোধ পর্যন্ত করেন নি। অথচ এসব সাংবাদিক, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবীরা সন্ত্রাসীদের সব অপরাধ ও দেশদ্রোহিতামূলক কার্যক্রম বেমালুম চেপে গিয়ে সন্ত্রাসীদের বক্তব্য ও দাবীকেই যথার্থ বলে প্রচার করে। এরা সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীদের আত্মসমর্পণের জন্য উপদেশ না দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবী জানায়। এরা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে সুর মিলিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে রাজনৈতিক সমাধানের আবরণে দেশের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতা দূর্বল করার পক্ষে ওকালতি করেন।এদের কেউ কেউ সন্ত্রাসীদের অনুকূলে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার জন্য বিদেশ সফর করতেও দ্বিধা করেন নি। ■

ত্রিপুরা থেকে ফ্যাক্স

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা হতে হিউম্যান রাইটস ফোরাম নামক একটি মানবাধিকার গোষ্ঠীর সভাপতি জনৈক চাকমা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে সম্প্রতি ফ্যাক্স পাঠিয়েছেন যাতে চট্টগ্রাম সীমান্ত হতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা হ্রাস করার আহবান জানানো হয়েছে। তার ভাষায় পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের সেনাবাহিনীর অবস্থান সেখানকার উপজাতিদের মানবাধিকারের জন্য হুমকিস্বরূপ। এবং এ প্রসংগে তিনি শান্তিবাহিনীর দোসর কল্পনা চাকমার তথাকথিত নিখোঁজ হবার জন্য সেনাবাহিনীকে দায়ী করে তাকে উদ্ধারের দাবীও জানিয়েছেন।

কথিত মানবাধিকার সংস্থার আলোচ্য কর্তাব্যক্তি ত্রিপুরায় অবস্থানকারী একজন বাংলাদেশী উপজাতি। তার সর্ম্পকে যে সব তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাতে দেখা যায় তিনিও পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করে তথাকথিত জুম্মল্যান্ড (আসলে চাকমাল্যান্ড) প্রতিষ্টিত করার উদ্দেশ্যে দেশদ্রোহীতামূলক দুঃস্বপ্নে লিপ্ত। সুতরাং তাঁর কিংবা তার সংস্থার পক্ষ হতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সৈন্যমুক্ত করার দাবী ওঠা স্বাভাবিক। এটা মূলতঃ জনসংহতি সমিতির দাবী।

কিন্তু জনসংহতি সমিতির সমর্থকরা মনে হয় ভুলে গেছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং যেকোন পরিস্থিতিতে যেকোন মূল্যে একে রক্ষা করার দায়িত্ব দেশের ক্ষমতাসীন সরকারের তথা জনগণের। দেশরক্ষার এই পবিত্র দায়িত্ব জনগণ সেনাবাহিনীর ওপর অর্পণ করেছে। প্রত্যেক দেশেই তাই সেনাবাহিনী রয়েছে, যারা জীবন দিয়ে হলেও তাদের দায়িত্ব পালন করেন, দেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা তথা অস্তিত্ব রক্ষা করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবী কোন নতুন ব্যাপার নয়। শান্তিবাহিনী এবং তার স্বদেশী-বিদেশী দোসররা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এ দাবী উথাপন করেছে। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নানাবিধ অসত্য ও ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করে তারা এমন ধরণের প্রচারণায় লিপ্ত হয়, যাতে দেশে-বিদেশে এ সংস্থার ভাবমূর্তি ও সুনাম ক্ষুণ্ন হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে তাদেরকে প্রত্যাহার করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চাপ সৃষ্টি হয়। বিগত ২৪ বছর যাবত দেশদ্রোহীরা এ ধরণের অপপ্রচার ও সৈন্য প্রত্যাহারের অবাস্তব আবদার অব্যাহত রেখেছে।

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সীমিত সংখ্যক সৈন্য রয়েছে, তাদেরকে সেখানে প্রেরণ করার পরিবেশ স্বাধীনতা বিরোধী শান্তিবাহিনীই সৃষ্টি করেছে এবং যতোদিন স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখন্ডতা বিরোধীরা সক্রিয় থাকবে স্বাভাবিকভাবেই সেনাবাহিনীর বর্তমান উপস্থিতি ততদিন সেখানে বিদ্যমান থাকবেই। দেশদ্রোহী সন্ত্রাসী এবং তাদের দোসররা ভাল করেই জানে যে, সেনাবাহিনীর এই সীমিত উপস্থিতিই হলো বাংলাদেশের ঐ অঞ্চলকে বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত রাখার একমাত্র পূর্বশর্ত। এই কারণেই সেনাবাহিনী শান্তিবাহিনী ও তাদের প্রভু-দোসরদের চক্ষশূলে পরিণত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে অভিযোগ জনসংহতি সমিতি এবং তার সতীর্থরা করছে তা বাস্তবতা বিবর্জিত। বিশ্বের অন্যসব অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমন করার জন্য সেনাবাহিনী তথা সরকার যে নির্মমতার আশ্রয় নিয়ে থাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বা সরকার তেমন কিছু করছে না। বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীদের দমন করার জন্য এমন উদার ও নমনীয় আচরণ অন্য কোন দেশের নিরাপত্তা রক্ষীরা করে বলে আমার জানা নেই।

শ্রীলংকার তামিল, ইরাক-ইরান-তুরস্কের কুর্দী, ফিলিপাইনে মরো, স্পেনের বাস্ক, ব্রিটেনের আইআরএ, ভারতের কাশ্মীরী-নাগা-মিজো-মনিপুরী-অহমিয়া-শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনে তথা নির্মূলকরণে যেমন নিবর্তনমূলক আইন রয়েছে, বাংলাদেশে তেমনটি নেই। আমাদের দেশের সাধারণ অপরাধীদের দমন তথা শাস্তিদানের জন্য যে সাধারণ আইন ও শাস্তির বিধান প্রচলিত, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীদের জন্য তা-ই প্রযোজ্য। অথচ ভারতে TADA'র মতো জঘন্য কালাকানুন চালু করে সাধারণ মানুষের সাথে পর্যন্ত নির্মম ও বর্বরতম আচরণ করা হয়। বিনা বিচারে দুই বছর আটক, কোন কারণ না দেখিয়ে যখন-তখন গ্রেফতার, পুলিশ হেফাজতে অত্যাচারজনিত আঘাতে মৃত্যু, নির্মম নির্যাতন প্রভৃতি ভারতে একেবারেই অতি সাধারণ ব্যাপার।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে TADA'র মতো কালা-কানুন ছাড়াও ভারত সরকার বিচ্ছিন্ন-প্রবণ এলাকাকে উপদ্রুত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে সেখানকার জনগণের সব মৌলিক, মানবিক, সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে সন্ত্রাসী দমনের নামে অপারেশন ক্রান্তি, অপারেশন আরচি, অপারেশন সানিভেল, অপারেশন 'ব্রজরং' 'অপারেশন ব্লু ষ্টার' অপারেশন রেইনো' প্রভৃতি সাংকেতিক নামের ছত্রচ্ছায়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনী মূলতঃ নির্মূল অভিযান চালাচ্ছে। সে তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের সেনাবাহিনীর ভূমিকা একেবারে রক্ষণাত্মক, আক্রমণাত্মক নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাস প্রকট হওয়া সত্ত্বেও সেনাবাহিনী কোন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে সন্দেহবশতঃ গ্রেফতার বা নির্যাতন করে না। সন্ত্রাস ও বিদ্রোহের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও আইনের শিথিলতা ও উদারতার সুযোগ নিয়ে বিশেষতঃ সন্ত্রাস দমনোপযোগী নিবর্ত্তনমূলক আইনের অনুপস্থিতে সন্ত্রাসীরা শাস্তিহীনই থেকে যায়। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীদের দমনার্থে অন্যান্য দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কঠোর নিবর্ত্তনমূলক আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা রক্ষীদের সংখ্যাও অন্যান্য সন্ত্রাস কবলিত দেশের তুলনায় একেবারে নগণ্য। সেখানে নিরাপত্তা রক্ষীদের মাত্র তিনটি বিভাগ রয়েছে। এই তিনটি শাখা হলো পুলিশ, বিডিআর এবং সেনাবাহিনী। এই তিনটি বিভাগই মূলতঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করছে। এই তিনটি বাহিনীর কোনটিই তাদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে স্বাধীন নয়। তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য সম্পূর্ণরূপে বেসামরিক প্রশাসনের কাছে দায়বদ্ধ।

অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সৈন্যরা একেবারে স্বাধীনভাবে গোলযোগপূর্ণ অঞ্চলে কাজ করছে। সন্ত্রাসীদের দমনের প্রক্রিয়া ও কৌশল তারাই গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে, সেখানে সরকারী হস্তক্ষেপ একেবারেই নগন্য। বরং নিরাপত্তাবাহিনী কোন মারাত্মক অভিযোগে অভিযুক্ত হলে সরকার জোরালোভাবে তাদের পক্ষ অবলম্বন করে। অথচ কল্পনা চাকমা'র স্বেচ্ছায় উধাও হয়ে যাওয়ার পর সেনাবাহিনীকে জড়িয়ে মিথ্যে অভিযোগ আনা হলে বাংলাদেশ সরকার সে ব্যাপারে নিরবতা পালন করে এই সত্যিই প্রমাণ করলেন যে, সেনাবাহিনী সদস্য যদি বাস্তবিকই এ ধরণের দায়িত্বহীন কাজ করে থাকে তবে তার প্রতি সরকারের কোনরূপ সমর্থন নেই। সরকারের এই ধরণের ভূমিকা সেনাবাহিনীকে যেকোন প্রকারে মানবাধিকার লঙ্ঘন হতে দূরে রেখেছে। এ কারণেই বিশ্বের যেকোন বিচ্ছিন্ন-প্রবণ ও সন্ত্রাস-কবলিত অঞ্চলের চেয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি অনেক উন্নত।

যে দেশে এবং যে অঞ্চলে বসে চাকমা সন্ত্রাসীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মিথ্যে প্রচারণা চালাচ্ছে সে অঞ্চলের ৭টি রাজ্যের মানবাধিকার পরিস্থিতি কেমন। ঐ সাতটি রাজ্যের অধিকাংশই ঐতিহাসিকভাবে ভারতীয় ভূ-খন্ড নয় এবং এগুলো মূলতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই ভারতের হাতে তুলে দিয়ে যায়। সুতরাং তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাস কখনই এক ও অভিন্ন নয়। ভারত অন্যের ভূ-খন্ডকে নিজ ভূ-খন্ডের অন্তর্ভুক্ত রাখতে চাইছে, আর আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশকে আমরা রক্ষা করছি।

আসলে প্রকৃত অর্থে মানবাধিকার লঙ্ঘন কেমন নির্মম তার কিছু চিত্র তুলে ধরলেই চাকমা সন্ত্রাসী এবং তার স্বগোত্রীয়রা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে, আসলে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলতে কি বুঝায়। এক্ষেত্রে আমরা অন্য কোন দেশের দিকে না তাকিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাধীনতাকামী কয়েকটি রাজ্যের দিকে তাকাব, কেননা চাকমা সন্ত্রাসীরা ঐ অঞ্চলেই অবস্থান করছে এবং ভারতই তাদেরকে মাঠে নামিয়েছে। ■

বিদ্রোহ দমনে ভারতীয় মডেল

বিচ্ছিন্নতাবাদী জনসংহতি সমিতি এবং তাদের শুভ্যানুধায়ীরা পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে নিরাপত্তা বাহিনী প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে আসছে। বিচ্ছিন্ন-প্রবণ এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীই যে একমাত্র অবলম্বন তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হলো ভারত, যেখান হতে জনসংহতি সমিতি সার্বিক সাহায্য পাচ্ছে। বিচ্ছিন্ন-প্রবণ এলাকায় ভারতীয় সৈন্যদের ভূমিকা কেমন--তা দেখা যাক।

উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্যের মধ্যে অন্তত ৪টি রাজ্যের স্বাধীনতা আন্দোলন জম্মু-কাশ্মীর কিংবা পাঞ্জাবের মতোই তীব্র। এই অঞ্চলের স্বাধীনতাকামী গেরিলাদের দমনার্থে ভারত যে এই অঞ্চলকে বাস্তবে সেনানিবাসে পরিণত করেছে মোতায়েনকৃত সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ব্যাপকতা দেখে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি রাজ্যে কমপক্ষে ৪ লাখ নিয়মিত সৈন্য বিদ্রোহীদের দমনে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া রয়েছে অজ্ঞাত সংখ্যক আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য।

আসামে উলফা জঙ্গীদের দমনের জন্য ভারত সরকার ১ লাখ নিয়মিত সৈন্য মোতায়েন করেছে, এদের মধ্যে তেজপুর সেনানিবাসে রয়েছে প্রায় ৬০ হাজার। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ২১তম মাউন্টেন ডিভিশন রাজধানী গৌহাটির কাছে নিয়োজিত। ২য় পার্বত্য ডিভিশন ডিব্রুগড়ে রয়েছে। এছাড়া বিএসএফ'এর ৬ ব্যাট্যালিয়ন, সিআরপি'র ১০ ব্যাট্যালিয়ন, পাঞ্জাব পুলিশ কমান্ডো বাহিনীর ৫ কোম্পানী, রাজ্য রাইফেল্স'এর ১ ব্যাট্যালিয়ন সদস্যকে আসামে মোতায়েন করা হয়েছে। জানুয়ারী '৯৭ এর মাঝামাঝিতে আরো ২৫ হাজার নিয়মিত সৈন্য সেখানে পাঠানো হয়েছে। আরো রয়েছে অজ্ঞাত সংখ্যক আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য।

পর্বতময় ক্ষুদে নাগাল্যান্ডে ১২ লাখ অধিবাসীর বিরুদ্ধে বিস্ময়করভাবে ১ লাখ ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে আসাম রাইফেলস'এর ১২টি ব্যাট্যালিয়ন, রাষ্ট্রীয় রাইফেলস'এর ৩টি ব্যাট্যালিয়ন, বিএসএফ'এর ২টি ব্যাট্যালিয়ন, নাগাল্যান্ড আর্মড পুলিশের ৪ ব্যাট্যালিয়ন এবং সিআরপি'র ৪টি ইউনিট।

মনিপুরে ১ লাখ নিয়মিত সৈন্য রয়েছে। এছাড়া সেখানে আসাম রাইফেলস'এর ১২টি, রাষ্ট্রীয় রাইফেলস'এর ২টি, বিএসএফ'এর ২টি, মনিপুর রাইফেলস এর ৬টি এবং সিআরপি'র ১২টি ব্যাট্যালিয়ন মোতায়েন করা হয়েছে।

ত্রিপুরার জনসংখ্যা ২৭ লাখ ৫০ হাজার হলেও উপজাতীয়দের সংখ্যা মাত্র ৫ লাখ ৫১ হাজারের মতো। এই সামান্য সংখ্যক উপজাতীয়কে দমন করার জন্য ত্রিপুরাতে ২০ হাজার নিয়মিত সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া বিএসএফ'এর ৪টি, আসাম রাইফেল' এর ২টি এবং সিআরপি'র ১টি ব্যাট্যালিয়ন ত্রিপুরায় রয়েছে। অতি সম্প্রতি গোলযোগ বেড়ে যাওয়ায় সেখানে আরো অতিরিক্ত সৈন্য ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য আমদানী করা হয়েছে।

মেঘালয়ে ২০ হাজার নিয়মিত সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। ইহা ছাড়া সেখানে বিএসএফ' এর ৫টি, আসাম রাইফেলস' এর ১টি এবং সিআরপি'র ২টি ব্যাট্যালিয়ন সদস্য রয়েছে।

অরুণাচল প্রদেশে রয়েছে ১৫ হাজার নিয়মিত সৈন্য। আরও রয়েছে আসাম রাইফেলস' এর ১০টি এবং বিএসএফ' এর ৪টি ব্যাট্যালিয়ন সদস্য।

মিজোরামে মোতায়েনকৃত নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ১০ হাজার। এছাড়া বিএসএফ' এর ৪টি এবং সিআরপি' এর ১টি ব্যাট্যালিয়ন সেখানে রয়েছে।[১২৬]

উপরে বর্ণিত বাহিনীসমূহের সদস্য ছাড়াও এই অঞ্চলে এমনসব বাহিনীর সদস্য নিয়োজিত রয়েছে, যাদের নাম অনেকেই কখনোই শুনেননি। ভারতের জনৈক সেনা কর্মকর্তা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নিয়োজিত এসব রকমারি নামের রক্ষীদের প্রসংগে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। কলিকাতা হতে প্রকাশিত The Statesman পত্রিকায় (১৫ এপ্রিল ১৯৯৬ সংখ্যা) অবসর প্রাপ্ত মেজর জেনারেল এস কে মাদক জানিয়েছেন ঃ

To keep these movements of secession or independence from spreading or creating trouble or toppling the state governments besides the regular army and the territorials, a host of para-military forces which include the BSF, Assam Rifles, CISF, RPF, DSC, India Reserve Battalions, Tea Estate Protection Force, Police commandos trained in Punjab and so on have been deployed. (ভাবানুবাদ ঃ বিচ্ছিন্নতাবাদী কিংবা স্বাধীনতাকামী এসব আন্দোলন যাতে ছড়িয়ে পড়তে কিংবা গোলযোগ সৃষ্টি করতে অথবা রাজ্য সরকারসমূকে ক্ষমতাচ্যুত করতে না পারে সেজন্য নিয়মিত সেনাসদস্য ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন

[১২৬] দৈনিক ইনকিলাব ঃ ঢাকা ঃ ১৯ নভেম্বর, ১৯৯৫। (ইদানীং স্বাধীনতাকামীদের তৎপরতা মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ায় প্রতিটি রাজ্যে আরো অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে--- লেখক।)

করা হয়েছে. যাদের মধ্যে রয়েছে বিএসএফ, আসাম রাইফেলস, সিআইএসএফ, আরপিএফ, ডিএসসি, ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাট্যালিয়ন, চা বাগান রক্ষীদল, পাঞ্জাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুলিশ কমান্ডো এবং অন্যান্য।)

সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর এসব সদস্যরা সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে নির্মমতা চালাচ্ছে, তা কেবল ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের ওপর পরিচালিত বর্বরতার সাথে তুলনীয় হতে পারে। তবে কশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘন যেমন প্রচারণা পাচ্ছে, উত্তর-পূর্ব ভারতের এসব রাজ্যে মানবাধিকার লঙ্গনের ঘটনাবলী সেভাবে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে ঃ

১. দুর্গম ও পর্বত-সংকুল হওয়ায় এবং অনুন্নত যোগাযোগের কারণে মূলতঃ ভারত তথা বাকী দুনিয়া হতে এ অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হওয়াতে এখানকার ঘটনাবলী বাইরের পৃথিবী তো দূরের কথা, ভারতের জনগণও অধিকাংশ সময়ে পায়না।

২. ভারত সরকার দীর্ঘদিন যাবত এসব অঞ্চলে বিদেশী সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী, এমনকি পর্যটকদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ রেখেছিল। এমনকি ভারতীয় সাংবাদিক কিংবা মানবাধিকার কর্মীরা এখনো এসব অঞ্চলে অবাধে চলাফেরা করতে পারে না। সামরিক বাহিনী নিরাপত্তার অজুহাতে তাদের ওপর এক ধরণের নিষেধাজ্ঞা জারী করে রেখেছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো নিরাপত্তা রক্ষীদের বর্বরতার কুৎসিত কাহিনী যতোদূর সম্ভব ঢেকে রাখা।

৩. এ অঞ্চলের তথ্য প্রকাশের ওপর এক ধরণের অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে। ৭টি রাজ্যের তথ্য বিভাগই নিয়ন্ত্রণ করে মূলতঃ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ। সুতরাং সেনাবাহিনী বা আধা-সামরিক বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্গন কিংবা তাদের ক্ষয়-ক্ষতি-জনিত তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য এসব রাজ্যের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীসমূহের নিজস্ব কোন সংস্থা নেই। ফলে ভারত সরকারের তথ্য দফতর এবং ভারতীয়দের মালিকানাধীন পত্র-পত্রিকাসমূহ যেসব সীমিত তথ্য সরবরাহ করে থাকে, বহির্বিশ্ব কেবল তা-ই জানতে পারে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ তথ্য অধিকাংশ সময়ই পাওয়া যায় না। কেবল মারাত্মক ঘটনাগুলো ছাড়া অপেক্ষাকৃত ছিটে-ফোটা ঘটনাসমূহ সর্বদাই লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম ও পত্র-পত্রিকা ভারতের ভাবমূর্তি জঘন্যভাবে ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন ধরণের

ঘটনাসমূহ যতোদূর সম্ভব সীমিত পর্যায়ে রেখে-ঢেকে প্রকাশ করে। যা প্রকাশ না করলেই নয়, কেবল তা-ই প্রকাশ করে।

এসব কারণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি রাজ্যে ভারতীয় রক্ষীদের ক্ষয়-ক্ষতি এবং তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত প্রকৃত তথ্যাবলী বিশ্ববাসী তো দূরের কথা ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম কিংবা সংবাদপত্রের দফতরেই পৌছে না।

এতদসত্ত্বেও নির্যাতনের যে সামান্য তথ্য ভারতীয় সংবাদপত্র এবং বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থাসমূহের দফতরে পৌছে, তা রীতিমত উদ্বেগজনক এবং লোমহর্ষক।

১৯৯১ সনের জানুয়ারীতে 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' আসামে সেনাবাহিনীর অপারেশন 'বজরং' চলাকালীন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেনঃ "Every single day reports pour in from different parts of the state about army atrocities, including killings. torture, rape and harrassment. The local newspapers are full of heart-rending reports of ordinary people being picked up by the army for no reason, women being raped and houses raided at uncanny hours". (ভাবানুবাদ ঃ প্রত্যহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হতে প্রাপ্ত তথ্য সেনাবাহিনীর হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ এবং হয়রানি ও উত্যক্তিকরণসহ জনগণকে সেনাবাহিনী কর্তৃক অকারণে তুলে নেবার, মহিলাদের ধর্ষিতা হবার, এবং অস্বাভাবিক সময়ে ঘরবাড়ী ঘেরাও হবার হৃদয়বিদারক কাহিনীতে ভরপুর থাকে।)

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তার বার্ষিক প্রতিবেদনে (১৯৯১) জানিয়েছেন যে, ১৯৯০ সনের ২৮ নভেম্বর হতে ১৯৯১ সনের ১০ এপ্রিল (যখন গেরিলা বিরোধী অভিযান একেবারে স্থগিত ছিল) সেনাবাহিনী উলফা গেরিলা সন্দেহে ১,৮৪৬ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। পুলিশ অন্য ১০০০ ব্যক্তিকেও এ সময়ে গ্রেফতার করেছিল। এদের অধিকাংশকেই গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের বাড়ী ঘেরাও করে। অন্যদেরকে আর্মি চেক পোষ্টে কিংবা সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করার কারণে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে কৃষক, দিন মুজুর, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক, সমাজকর্মী, চিকিৎসক ও ব্যবসায়ী ছিলেন। যুবক ও ছাত্ররা ছিল বিশেষ লক্ষ্যবস্তু। এ্যামনেষ্টি জানিয়েছেন গ্রেফতারকৃতদের অধিকাংশকেই নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়।

আসামে অকারণে এতো বেশী গ্রেফতার করা হয় যে, ঐ সব অবৈধ গ্রেফতারের বিরুদ্ধে ১৯৯০ সনের ২৭ নভেম্বর হতে ১৯৯১ সনের মার্চ পর্যন্ত গৌহাটি হাইকোর্টে ১০০টি হেবিয়াস কর্পাস মামলা দায়ের করা হয়। হাইকোর্ট

অধিকাংশ দরখাস্ত বিবেচনা করে বন্দীদের আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেন। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ঐ রিপোর্টে হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে নিরাপরাধ মানুষকে গ্রেফতার ও আটক রাখার একাধিক ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৯১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে মানবাধিকার সংস্থা CPDR এর একদল কর্মী আসামের ছয়টি জেলা পরিদর্শন করেন। তারা নির্যাতনের ৪৯টি, ধর্ষণের ১৩টি, বিচার বর্হিভূত হত্যার ৮টি এবং নিখোঁজ হবার ১টি ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করেন। PUDR নামক অন্য একটি নাগরিক অধিকার সংস্থা ১৯৯১ সনের মে মাসে আসামের ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে বলা হয় যে, সৈন্যদের হাতে আটককৃতদের অধিকাংশই নির্যাতিত হয়। তারা তিনটি হাসপাতাল পরিদর্শন করে আহত এবং চিকিৎসকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ঐ প্রতিবেদনে নির্যাতনের যে লোমহর্ষক বিবরণ দেয়া হয় তা যেকোন বিবেকবান মানুষকে ব্যথিত না করে পারে না। নির্যাতনের নমুনা দেখুন ঃ

"Beating. stripping and hanging them upside down and then beating on head and chest thumping on chest with boots pouring ice-cold water. burying them upto the chest and then beating or keeping a bucket over the head. squeezing testicles with clamps. dipping in cold water drums. forcefully keeping them awake for days together. denial of food or water are some of the forms of torture used. But the most common form is electric shocks. Sensitive parts of the body including ears. tongue. armpits. genitals and head were repeatedly given electric shocks sometimes in progressively higher voltages".

(ভাবানুবাদ ঃ পিটানো, বিবস্ত্রকরণ এবং তাদের পা উপরে তুলে মাথা নিচের দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে মাথা ও বুকে আঘাত হানা, বুট দ্বারা বুকে ঘা মারা, (শরীরে) বরফ-সম ঠান্ডা পানি ঢালা, বুক পর্যন্ত (মাটির নিচে) পোঁতা এবং তার পর পেটানো অথবা মাথা বালতির মধ্যে রাখা, লৌহ বা কাঠের পাত দিয়ে অন্ডকোষ কুঁচকানো, ঠান্ডা পানির ড্রামে (মাথা) ডুবানো, জোরপূর্বক ক্রমাগতভাবে বহুদিন যাবত বিনিদ্র রাখা, খাবার বা পানি দিতে অস্বীকার প্রভৃতি হলো কয়েক প্রকার নির্যাতনের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু সবচেয়ে সাধারণ (নির্যাতন) হলো বৈদ্যুতিক শক্ দেয়া। কান, জিহ্বা, বগল, লিঙ্গ, মাথা প্রভৃতির মতো স্পর্শকাতর স্থানসমূহে বারংবার, কখনো কখনো তীব্র ভোল্টেজে বৈদ্যুতিক শক্ দেয়া হয়।)

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানাচ্ছেন যে, ১৯৮৯ সনের মার্চ মাসে আসাম পুলিশ ট্রাক্সফোর্স কোকড়াঝাড় জেলার রূপনাথপুর গ্রামে উগ্রপন্থীদের

সন্ধান করার অজুহাতে গ্রাম ঘেরাও করে ১৫ জন উপজাতীয় বালিকাকে ধর্ষণ করে।

মনিপুর রাজ্যের অবস্থা আরো জঘন্যতর। 'অপারেশন ব্লুবার্ড' এর সময় (১৯৮৭) এবং তার পরবর্তীকালে নানা অজুহাতে অকারণে বহু অসামরিক লোককে আটক করা হয়। একটি সামরিক চৌকির ওপর হামলা চালানোর পর সৈন্যরা এনএসসিএন গেরিলাদের পাকড়াও করার অজুহাতে ১৯৮৭ সনে ৩০০ গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসাবাদ তথা নির্যাতন করে। এদের কারো কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে ফেলা হয়। বৈদ্যুতিক শক্ দেয়া হয়, সিগারেট দিয়ে (দেহের কোন কোন অংশ) পোড়ানো হয়, মাথা নিচের দিকে দিয়ে ঝুলানো হয়, গর্ভবতী মহিলাদের পিটানো হয়। ফলে অনেকেরই গর্ভপাত ঘটে। কোন কোন গ্রামবাসীর শরীরের স্পর্শকাতর অংশসমূহে মরিচের গুড়া প্রবিষ্ট করানো হয়। অন্যান্যদেরকে গলা পর্যন্ত পুঁতে বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয় যে, তাদেরকে তৎক্ষনাৎ হত্যা করা হবে। এ্যামনেস্টি জানাচ্ছেন নির্যাতিতদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠের বয়স ছিল ১ বছর এবং বয়োজেষ্ঠ্যের ৬৫ বছর। ৩৪ জন ছিল ১২ বছর কিংবা তার চেয়েও কম বয়সী কিশোর। ১৫-১৬ বছর বয়সী ছেলেদের বৈদ্যুতিক শক্ দেয়া হয়।

নাগা চিকিৎসক ফোরাম, এবং পশ্চিম বঙ্গের ড্রাগ এ্যাকশন ফোরাম নাগাল্যান্ডের ১০৪ জন নির্যাতিত গ্রামবাসীকে পরীক্ষা করে ১৯৯০ সনের আগষ্ট মাসে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ১০৪ জন গ্রামবাসীর মধ্যে মাত্র ৩ জন ব্যতীত বাকী সবাই নির্যাতনের কারণে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যায়।

১৯৯০ সনের অক্টোবর মাসে নাগাল্যান্ডে সৈন্যদের স্বেচ্ছাচারিতার বিবরণ দিয়েছেন 'Hill Exprcss' নামক সংবাদপত্রটি। পত্রিকাটি জানিয়েছেন এনএসসিএন গেরিলারা বোটসা'র কাছে সৈন্যদের এক টহলে অতর্কিতে আক্রমণ (এ্যামবুশ) করে। এই হামলায় ৩ জন সৈন্য নিহত এবং অন্য কয়েক জন আহত হয়। বাহ্যত এনএসসিএন গেরিলাদের নির্মূল করার আবরণে আসাম রাইফেলস কয়েকটি গ্রাম ঘেরাও করে। পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয় যে, গ্রামবাসীদের ঘুষি, লাঠি ও রাইফেলের বাট দ্বারা আঘাত করা হয় এবং তাদের চোখে মরিচের গুড়া এবং নাকে পানি ঢুকানো হয়। নারহেমা গ্রামের ২৮ বছর বয়সী শ্রী কেভিকোলি এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কাছে একটি হৃদয়-বিদারক নির্যাতনের কাহিনী তুলে ধরেন। তিনি বলেন ঃ "দু'জন সৈন্য আমাকে চড় দেয়, তৃতীয় জন আমার চুল টেনে ধরে। যখনই আমি পড়ে যাই ৫ থেকে ৬ জন আমাকে লাথি মারতে শুরু করে এবং তাদের রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করতে থাকে। তারপর তারা আমাকে রাস্তার পাশে নিয়ে যায় এবং দেওয়ালের সাথে বাঁধে। আমি

দাঁড়াতে পারছিলাম না এবং আমি পড়ে যাই। তারা আমার মুখের ভিতর রাইফেলের ব্যারেল ঢুকিয়ে দেয় এবং আমাকে হয়তো কথা বলতে অথবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হবে বলে।"

এবার ত্রিপুরার দিকে নজর দেয়া যাক। ১৯৮৮ সনের জুন মাসে আসাম রাইফেলস কোয়াই মহাকুমার উজান ময়দানে ঘেরাও করে গেরিলা অনুসন্ধান অভিযান চালায়। এ অভিযান চলাকালীন ১৪ জন উপজাতীয় মহিলা ধর্ষিতা হন। জনৈক মহিলা বলেন যে, তার স্বামীকে বেঁধে সৈন্যরা তাকে ধর্ষণ করে। সর্বকনিষ্ঠা ধর্ষিতার বয়স ছিল ১২ বছর। ১৯৮৯ সনে এপ্রিল মাসে তৎকালীন বিরোধী দল (বর্তমানে ১৯৯৬ হতে ক্ষমতাসীন) মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ক'মাসে ১০০ মহিলা নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ধর্ষিতা হবার অভিযোগ এনে ছিলেন। ১৯৯১ সনের জুন মাসে ত্রিপুরার ধর্ম নগর এলাকায় ১৪ জন উপজাতি মহিলাকে তাদের কুটির হতে টেনে-হেঁচড়ে বের করে এনে পুলিশ তাদের ধর্ষণ করে। এই সময় পুরুষদেরকে গ্রামের এক প্রান্তে আটকে রাখা হয়।

নাগাল্যান্ড রাজ্যে সেনাবাহিনীর স্বেচ্ছাচারিতার সাম্প্রতিকতম তথ্য প্রকাশ করেছেন কলকাতা হতে প্রকাশিত প্রখ্যাত সাপ্তাহিকী Sunday। ঐ পত্রিকা (আগষ্ট ১৮-২৪, ৯৬ সংখ্যায়) জানিয়েছেন যে, ৩ আগষ্ট রাত দশটায় সৈন্যরা রাজধানী কোহিমার একটি হোটেল কক্ষে প্রবেশ করে দু'জন হোটেল খদ্দেরকে কোন সংকেত না দিয়েই গুলি করে। এতে কলিকাতাভিত্তিক একটি ইনজিনিয়ারনিং সংস্থার প্রতিনিধি এন কে দাস সাথে সাথে নিহত, অন্যদিকে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের নাগা কর্মচারী আহন হন। সৈন্যরা তাদের ভুল অনুধাবন করে ঘোষণা করে যে আহত ও নিহত ব্যক্তি জঙ্গীদের সাথে সৈন্যদের গুলি বিনিময়ের মাঝখানে পড়ে দুর্ঘটনাক্রমে বিপদাপন্ন হয়েছেন। পত্রিকাটির মতে রাজ্যের শহরাঞ্চলের অবস্থা এমন ভীতিকর যে, সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে কোহিমা ও ডিমাপুর ভূতুড়ে নগরীতে পরিণত হয়। শহরবাসীরা ঘরের বাইরে যেতে সাহস করেনা। সেনাবাহিনী বহনকারী যানবাহন এবং সৈন্যদের গুলির শব্দই কেবল নিরবতা ভঙ্গ করে।

নাগাল্যান্ড সম্পর্কিত 'Sunday' এর তথ্য ব্যতীত ওপরের অন্য সব তথ্যই 'এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর ১৯৯১ সনের রিপোর্ট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ৬ বছরের এসব নির্মমতা ও নির্যাতনের পরিধি বেড়েছে বই কমেনি। কারণ গত ক'বছরে গেরিলা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বেড়েছে। গেরিলা তৎপরতা যতো বাড়ে সৈন্যদের অভিযান ও নির্মমতা ততই ব্যাপকতা লাভ করে। 'Sunday' সাপ্তাহিকী পরিবেশিত তথ্য---তারই প্রমাণ।

সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি রাজ্য মূলত ভারতীয় সৈন্যদের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত নির্যাতিত স্বাধীনতাকামী জনগণের করুণ আর্তনাদের নীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। সেখানে আহত, নিহত, বিকলাঙ্গ ও নিখোঁজ হওয়া মানুষের সঠিক পরিসংখ্যান বিশ্ববাসী কখনই জানতে পারবো না। গণতন্ত্র, মানবতাবাদ এবং অহিংসনীতির মোড়ল ভারত সরকার কেবল নির্যাতনের ওপর নির্ভর করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এই ৭টি রাজ্যে উপনিবেশিক শাসন ও শোষণ টিকিয়ে রাখছে। সারাবিশ্বে ভারতই একমাত্র দেশ যে ক্রমাগ্রতভাবে এবং ব্যাপক হারে তার সেনাবাহিনীকে তার দেশের জনগণকে নির্মূল করার কাজে লেলিয়ে দিয়েছে। অথচ সেই ভারতের পৌষ্য জনসংহতি সমিতি এবং তাদের শুভানুধ্যায়ীরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছে, আর ভারতও সে রটনায় নেপথ্য শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। স্ববিরোধিতা কাকে বলে ? ■

বিশেষ আইন প্রয়োজন

দীর্ঘ চার বছরের তথাকথিত অস্ত্রবিরতি, ২২ দফা সংলাপ বৈঠক (১২ মার্চ '৯৭সহ), অসংখ্যক চিঠি বিনিয়ময় সত্ত্বেও সশস্ত্র সন্ত্রাস, বার বার বিনা প্ররোচণায় অস্ত্র বিরতি লঙ্ঘন, দেশে-বিদেশে বাংলাদেশ বিরোধী প্ররোচণা, শরণার্থীদের আবরণে দেশের নাগরিকদের বিদেশের মাটিতে জিম্মি হিসেবে আটকে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস, সর্বোপরি, সংলাপ নামক গল্প-গুজবের আড়ালে অযথা সময় ক্ষেপণের কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সংগঠনের তহবিল ও শক্তি জোরদার করার প্রক্রিয়া দেখে -- এ সত্যই এখন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে, সন্ত্রাসীরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদেরই সৃষ্ট সমস্যার সমাধান চায়না। বরং তাদের মূল লক্ষ্য অর্জনে (অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্নকরণ) তারা অনমনীয়ভাবে এগিয়ে চলছে।

আসলে বিশ্বের কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনই ছাড়, সংলাপ ও অস্ত্র বিরতির মাধ্যমে পরিসমাপ্ত হয়নি। আমাদের সামনে এমন বহু নজির রয়েছে যে এ ধরণের সহনশীল আচরণ বাস্তবে সন্ত্রাসীদের লক্ষ্যার্জনের সম্ভবনা সম্পর্কে আস্থাবান এবং শক্তিশালীই করেছে। সুস্পষ্ট সামরিক ও আইনগত প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ ছাড়া নমনীয় আচরণ বিচ্ছিন্নতাবাদকে সক্রিয় ও সাহসী করে।

জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীদের উৎসাহ ও আশ্রয়দাতা ভারত তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন (১৯৪৭) থেকেই একাধিক অঞ্চলে যৌক্তিক বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যা মোকাবেলা করে আসছে, যেসব অঞ্চল ঐতিহাসিক এবং নৈতিকভাবেই ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল না। কাশ্মীর-পাঞ্জাবের কথা বাদ দিলাম। কেবলমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বয়স ভারতের বয়সের মতোই ৫০ বছর। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বন্ধ করার জন্য ভারত পাঞ্জাবসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রায় অধিকাংশ বিচ্ছিন্নতাবাদী সংস্থার সাথেই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছে, সংলাপে বসেছে, অস্ত্র বিরতি করেছে। বিভিন্ন রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবদীরা অস্ত্রসহ বেশ কয়েকবার আত্মসমর্পণও করেছিল। কিন্তু আন্দোলন মোটেই দুর্বল কিংবা স্তিমিত হয়নি। আত্মসমর্পণের সামান্য ক'দিন পরে নতুন নেতৃত্ব কিংবা সংগঠনের অধীনে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আরো শক্তিধর হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। যে নেতা চুক্তি করেছে, আত্মসমর্পণ করেছে, তারই অনুসারীরা এগিয়ে এসেছে অন্য নামে। এ কারণেই শ্রীলংকা সরকার তামিল জংগীদের সাথে, ব্রিটেন আইআরএ'র সাথে, ভারত তার পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের বিদ্রোহীদের সাথে সংলাপ ও চুক্তির মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।

এই কারণে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীদের দমনার্থে শান্তিপূর্ণ সংলাপের পাশাপাশি এসব দেশ কেবল সামরিক চাপই অব্যাহত রাখেনি, বরং সেনাবাহিনীকে সন্ত্রাস দমনে পর্যাপ্ত আইনী সুযোগ দিয়েছে। সামরিক চাপ মানে কেবল নিরাপত্তাবাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতিকে বুঝায় না, বরং বিদ্রোহীদের দমনার্থে নিরাপত্তা বাহিনী যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা স্বাধীনভাবে আইনের আওতায় নিতে পারে এবং তাদের যেকোন যৌক্তিক ও অপরিহার্য পদপেক্ষ যাতে আইনের দৃষ্টিকোণ হতে অবৈধ বলে প্রতীয়মান না হয়, সর্বোপরি, ধৃত সন্ত্রাসীরা যাতে আইনের দুর্বলতা, অসংলগ্নতা ও অস্পষ্টতার কারণে শাস্তিহীন থেকে না যায়, কিংবা মুক্তি না পায় তজ্জন্য সুনির্দিষ্ট নিবর্তনমূলক আইনগত ক্ষমতা প্রদানকে বুঝায়।

ভারতসহ বিশ্বের যেসব দেশ বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা মোকাবেলা করছে, সেসব দেশের সামরিক বাহিনীকে বিভিন্ন ধরণের আইনগত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনের জন্য TADA ছাড়াও এমন বহুবিধ বিধি রয়েছে, যা সরাসরি মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত কালা-কানুন। স্বদেশ-বিদেশ হতে তীব্র প্রতিবাদ আসা সত্ত্বেও ভারত সরকার এসব কালা-কানুন বাতিল করেনি। কারণ ভারত মনে করে যে, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমন করতে হলে নিরাপত্তা বাহিনীই যথেষ্ট নয়, নিরাপত্তা বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য এমন ধরণের আইনের প্রয়োজন রয়েছে।

ভারতে 'TADA'র চেয়েও কয়েক গুণ বেশী মানবিক চন্ডীগড়-পাঞ্জাবে প্রবর্তিত 'বিশেষ বিধি ১৯৮৩' এর দিকে তাকালেই বুঝা যাবে বিচ্ছিন্নবাদীদের দমনার্থে কি ধরণের আইনগত ব্যবস্থা নিরাপত্তাবাহিনীকে দেয়া উচিত। ঐ বিধির অংশ বিশেষের দিকে তাকানো যাক ঃ

" Any commissioned officer, warrant officer, Non-commissioned officer, or any other person of equivalent rank in the armed forces, may, in a disturbed area...

Arrest, without warrant any person who has committed a cognizable offence or against whom a reasonable suspicion exists that he has committed or is about to commit a congnizable offence and may use such force as may be necessary to effect the arrest.

Enter and search without warrant, any premises to make such arrest as aforsaid or to recover any person believed to be wrongfully retained or confined or any property, reasonably suspected to be stolen property or any arms, ammunition or explosive substances believed to

be unlawfully kept in such premises and may for that pruposc use such force as may be necessary. and seize any such property. arms. ammunition or exercise or explosive substances :

Stop. search and seize any vehicle or vessel reasonably suspected to be carrying any person who is a proclaimed offender. or any person who has committed a non-cognizable offence. or against whom a reasonable suspicion exists that he has committed. or is about to commit a non-cognizable offence. or any person who is carrying any arms. ammunition or explosive substance believed to be unlawfully held by him and may. for that purpose. use such force as may be necessary to effect such stoppage. search. seizure as the case may be".[১১৭]

এ ধরণের নিবর্তনমূলক আইন আসলে ১৯৫৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর প্রবর্তিত হয় এবং ১৯৭২ সালে ইহা আসাম, মেঘালয়, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা. মিজোরাম এবং অরুণাচল প্রদেশসহ কাশ্মীরেও স্বাধীনতাকামীদের দমনার্থে প্রয়োগ করা হয়।

এ বিধিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত সশস্ত্র বাহিনীর কোন সদস্যের কোন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কোন মামলা রুজু বা অভিযোগ উত্থাপন না করার ব্যবস্থা রয়েছে। উপদ্রুত এলাকাসমূহে পুলিশ কর্মকর্তা এবং আর্মড পুলিশের হাবিলদারদেরকে একই ধরণের ক্ষমতা প্রদান করতঃ তাদের বিরুদ্ধে কোন পক্ষ হতে অভিযোগ উত্থাপন না করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ভারতে যেকোন অঞ্চলের প্রশাসক, রাজ্যপাল, বা কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ অঞ্চলে কিংবা রাজ্যে কিংবা ঐ অঞ্চল বা রাজ্যের অংশ বিশেষকে 'উপদ্রুত' কিংবা 'সন্ত্রাস-কবলিত' এলাকা ঘোষণা করে সেখানকার বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্রবাহিনী নিয়োগ করতে পারে। এ বিধি বলে ভারত সরকার, কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের ইংগিতে রাজ্য সরকার বা আঞ্চলিক প্রশাসক সন্ত্রাসী বা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনে নির্বিঘ্নে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণার নামে সশস্ত্রবাহিনীকে যথেচ্ছু ব্যবহার করতে পারে এবং সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরাও অনেকটা স্বাধীন বিবেচনায় চাপমুক্ত পরিবেশে সন্ত্রাসীদের দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

---

[১১৭] Received the ascent of the President on Decenbember 9. 1983. Published in Gazette of India (extra). part II. section 1. dated 8th December. 1993 PP. 1-3.

উপদ্রুত এলাকায় আটককৃত কোন ব্যক্তি সত্যিই সন্ত্রাসী, বা তাদের সমর্থক অথবা অপরাধী কিনা তা প্রমাণের জন্য নিরাপত্তা বাহিনীকে কিছুই করতে হয় না, এজন্য কেবল অভিযোগটিই যথেষ্ঠ। অভিযুক্ত ব্যক্তিরই দায়িত্ব নিজেকে নিরাপরাধ হিসেবে প্রমাণ করা।

বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনে উপরোক্ত বিশেষ আইনটিও ভারত সরকারের কাছে যথেষ্ঠ মনে হয়নি। তাই ভারত ১৯৮৫ সনের মে মাসে আরো কঠোর ও অমানবিক বৈশিষ্ট্যসম্বলিত TADA (Terrorist And Disruptive (Prevention) Act) প্রবর্তন করে এবং ১৯৮৭ সনে সংশোধনের মাধ্যমে একে আরো কঠোরতর করা হয়। টাডা'র অধীনে সন্ত্রাস-কবলিত এলাকায় যেকোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার, গ্রেফতার করার, বিনা কারণে দীর্ঘদিন নিরাপত্তাবাহিনীর হেফাজতে রাখার, দু'বছর আটক রাখার, কোন সমাবেশ, গাড়ী বা বাসগৃহ বা কাঠামো ভেংগে দেবার, এমনকি দেখামাত্র গুলি করার অধিকার দেয়া হয়। কোন রেলপথ, রাজপথ, অথবা খাল বা নৌপথের কাছে সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত কেউ উপস্থিত হলে তাকে গ্রেফতার করা যায়। সরকারী অনুমতি ছাড়া যেকোন খোলামেলা জায়গায় বিশ্রামরত কিংবা ঘোরাফেরাকালীন যে কাউকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে গ্রেফতার করার অধিকার নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রদান করা হয়েছে। এই আইন বলে পত্রিকা, ঔষধ অথবা কোন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যক্রয়ের সময়ও যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যায়, যদি পুলিশ মনে করে যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ঐসব দ্রব্যাদি সন্ত্রাসীদের সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করেছিল।

এ ধরণের আইনগত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী আইন বর্হিভূত কেমন মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত দুষ্কর্ম দ্বারা সন্ত্রাসী দমনের নাম দিয়ে বেসামরিক জনগণের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে তার কিছু নমুনা আমি অন্যত্র উল্লেখ করেছি। সারা বিশ্বের মানবপ্রেমিক সংস্থা ও সরকার হতে ভারতের মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভারত এ ধরণের বিধি বাতিল তো করেই নি, বরং এর চাইতে আরো জঘন্যতর মানবতাবিরোধী বিধি 'টাডা' প্রবর্তন করেছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ, নীতিনির্ধারক, সরকারী কর্মকর্তা ও আমলারা মনে করেন যে, এ ধরণের কঠোর নিবর্তনমূলক আইন দ্বারা নিরাপত্তা বাহিনীকে অবাধ ক্ষমতা প্রদান করা না হলে ভারতের আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষা করা যাবে না। কেবল ভারতই নয়, ভারতের অন্যতম প্রতিবেশী দেশ শ্রীলংকা ভারতেরই লেলিয়ে দেয়া তামিল সন্ত্রাসীদের নির্মূল করার জন্য বিশেষ বিধি প্রণয়ন করে নিরাপত্তা বাহিনীকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করেছে। সৈয়দ মাহমুদ আলী জানানঃ

"Colombo took legal steps to empower security forces to 'wipe out' Tamil insurrection. An idemnity act was passed in May to protect security forces from prosecution because it was necessary that public service officers should do their jobs and follow orders without fear of consequences from adverse court decisions"[১১৭] (ভাবানুবাদঃ তামিল জংগীদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা বাহিনীকে ক্ষমতাধর করতে কলম্বো আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নিরাপত্তা বাহিনীকে (তাদের কৃতকর্মের জন্য) বিচার হতে অব্যাহতি দানের উদ্দেশ্যে (১৯৮২ সনের) মে মাসে বিশেষ বিধি গৃহীত হয়, যাতে সরকারী সার্ভিসসমূহে (এখানে নিরাপত্তা বাহিনীসমূহকে বুঝানো হয়েছে) নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ আদালতের প্রতিকূল সিদ্ধান্তের ভীতি হতে মুক্ত থেকে নির্ভয়ে তাদের দায়িত্ব পালন ও নির্দেশ অনুসরণ করতে পারে।)

লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকায় (৭ জুলাই, ১৯৮৩) প্রকাশিত ডেভিড সেলবার্ন (David Selbourne) এর নিবন্ধের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে সৈয়দ মাহমুদ আলী তার একই গ্রন্থে (পৃঃ ২৩১) লিখেছেন যে, কলম্বো সরকার বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে এমন ক্ষমতা প্রদান করেছেন যাতে তারা তাদের হাতে নিহত কোন ব্যক্তির কোন প্রকারের পোষ্ট-মর্টেম (মরণোত্তর দেহ পরীক্ষা), বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধান বা তদন্ত ছাড়াই মৃতদেহ হস্তান্তর করতে পারে।

ভারত এবং শ্রীলংকার সন্ত্রাস দমন বিরোধী কঠোর আইন এই সত্যিই প্রমাণ করে যে, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখন্ডতা নিয়ে আপোষ হতে পারে না, এসব রক্ষার জন্য যেকোন ধরণের কঠোরতা অবলম্বন করা যেকোন দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল সরকারের পবিত্র দায়িত্ব।

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদী দেশদ্রোহীদের দমন করার জন্য আমাদের সরকারসমূহ তেমন ধরণের বিশেষ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে দূর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। সাধারণ অপরাধীদের বিচার ও শাস্তির জন্য যে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন রয়েছে শান্তিবাহিনীসহ সব দেশদ্রোহীদের তা দিয়ে বিচার করা হয়, যা বিদ্রোহীদের পাকড়াও, দমন তথা নির্মূল করণার্থে বাস্তবতার তুলনায় একেবারে অপ্রতুল ও অকার্যকর। জঘন্য কোন দেশদ্রোহী সন্ত্রাসী নিরাপত্তা বাহিনীর সামনে ঘোরাফেরা করলেও অস্ত্রহীন অবস্থায় তাকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা নিরাপত্তা বাহিনীর নেই। এমনকি, যদি কোন মহিলা সন্ত্রাসী সশস্ত্র অবস্থায় থাকে, তথাপি নিরাপত্তা বাহিনী তাকে গ্রেফতার করতে পারেনা। কোন

---

[১১৭] S. Mahmud Ali: The Fearful State: ZED Books; London & New Jersey: 1991: p 230):

সন্দেহভাজন পুরুষ-মহিলাকে প্রকাশ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোন তথ্য জানতে চাইবার, এমনকি খোঁজ-খবর নিতে চেষ্টা করার ক্ষমতাও তাদেরকে দেয়া হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানরত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা উপজাতীয়দের ভয়েই ভীত। তারা সন্ত্রস্ত থাকে কখন তাদের বিরুদ্ধে উপজাতীয়রা কি অভিযোগ আনে। জনৈক উপজাতীয় খোদ জনসমক্ষে মাতলামি করার কারণে সেনাবাহিনীর জনৈক সদস্য তাকে চড় মারার অপরাধে (?) চাকুরীচ্যুত হন। তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিব্রত করার, এমনকি চাকুরীচ্যুতির জন্য উপজাতীয়দের সামান্য অভিযোগই যথেষ্ঠ। গোপন সূত্রে সুনির্দিষ্ট খবর পেয়ে সেনাবাহিনীর সদস্যরা জনৈকা উপজাতীয় মহিলার গৃহতল্লাশী করলে তাদেরকে চাকরীচ্যুত হতে হয়। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কিংবা হিল উইমেন ফেডারেশন এর কোন কর্মী, এমনকি কোন উপজাতীয় ব্যক্তিগতভাবে সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটালে, উত্যক্ত করলে, গালাগালি করলেও সেনাবাহিনীকে তা হজম করতে হয়। বিশ্বের অন্য কোন বিচ্ছিন্নতাবাদ কবলিত অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনী এমন অসহায় অবস্থায় নেই। বিদ্রোহী ও সন্ত্রাসী এবং তাদের সহযোগীদের অপরাধমূলক তৎপরতা দমনে নিবর্তনমূলক আইন না থাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে আইনগতভাবে দুর্বল ও ক্ষমতাহীন অবস্থায় রয়েছে।

শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতা ছাড়াও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণপরিষদ, হিল উইম্যান ফেডারেশন (পাহাড়ী মহিলা পরিষদ) প্রভৃতি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন সব অমানবিক ও অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত, যা দেশদ্রোহীতামূলক। শান্তিবাহিনী সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত বিদ্রোহী। আর জনসংহতি সমিতি এবং তাদের সহযোগী সংগঠনগুলো দেশোদ্রোহীদের সহযোগী বিধায় তারাও দেশদ্রোহী। অনেক ক্ষেত্রে শান্তিবাহিনীর চিহ্নিত ও জঙ্গী খুনীরা এসব সংগঠনের কর্মী হিসেবে তাদের দেশদ্রোহীতামূলক কার্যক্রম চালায়।

শান্তিবাহিনীর হাতে এ পর্যন্ত কত লোক প্রাণ হারিয়েছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া খুবই দুস্কর। পার্বত্য গণপরিষদের মতে এ পর্যন্ত প্রায় ২৫ হাজার কেবল বাঙ্গালী মুসলমানকে শান্তিবাহিনী হত্যা করেছে। অন্যদিকে সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠানের হিসেব অনুযায়ী ১৯৭৯ সাল হতে ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সর্বমোট ১০৫৩ জন বাঙ্গালী নিহত এবং ৪৬১ জন আহত হন। একই সময়ে শান্তি বাহিনীর হাতে ১২৩ জন উপজাতীয় নিহত এবং ২৬১ জন আহত হয়। এই সময়ের মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর ৩৩৮ জন সদস্য নিহত এবং ৩৭২ জন আহত হন।

হত্যা ও অপহরণ ছাড়াও চাঁদাবাজি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি, রাস্তা অবরোধ, পুল ও কালভার্ট ধ্বংস, সরকারী স্থাপনার ওপর হামলা, সরকারী কর্মকর্তাদের কর্তব্য পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, অগ্নিসংযোগ এবং দেশদ্রোহীতামূলক বক্তৃতা ও শ্লোগান, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের কটাক্ষ ও উত্যক্তকরণ প্রভৃতি আইন ও দেশ বিরোধী কার্যক্রম অহরহ ঘটছে। বাংলাদেশ বিরোধী প্রচার-পত্র বিলি ও সভা-সমাবেশ করে এরা উপজাতীয়দের ওপর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের সমর্থন আদায় করে। আর সমর্থন না করলে কিংবা শান্তিবাহিনীকে আশ্রয়, খাবার ও অর্থ (চাঁদা) না দিলে অবশ্যই অপহরণ কিংবা হত্যা করে।

নিরাপত্তা বাহিনী সুনিশ্চিতভাবে জানে কারা দেশদ্রোহী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, চাঁদাবাজ, অপহরণকারী। কারা পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরহ মানুষকে খুন করে এসে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান শহরে, এমনকি ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেটে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কর্মী হিসেবে অবাধে ঘুরে বেড়ায়। বাঘাইছড়ি, নানিয়ারচরসহ প্রায় সব ক'টি হত্যাকান্ডের খুনীদের নাম, ঠিকানা, পরিচয়, নিরাপত্তা বাহিনীর জানা আছে। কিন্তু যেহেতু তাদেরকে অকুস্থলে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করা যায় নি, তাই সনাক্ত করার পরেও তাদের গ্রেফতার করা যাচ্ছে না আইনগত ক্ষমতা না থাকার কারণে।

কোন দাগী খুনীকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেফতার করা হলে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী মহিলা পরিষদ কিংবা পাহাড়ী গণপরিষদ নামধারী সংগঠনসমূহের খুনী-সন্ত্রাসী-কাম-রাজনৈতিক কর্মীরা সাথে সাথে সহিংস বিক্ষোভে নেমে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, রাস্তায় অবরোধ দাঁড় করায়, অফিস আদালতে আক্রমণ চালায়, যানবাহন দোকান-পাট ভাঙ্গ-চুর করে, এমনকি নিরীহ বাঙ্গালীদের ওপর হামলা চালায়। অন্যদিকে ঢাকায় অবস্থানকারী সন্ত্রাসী-সমর্থক কিছু পেটুয়া বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিবৃতি ঝাড়ে, এমনকি সন্ত্রাসীদের মুক্তির জন্য বিভিন্ন আদালতে রীট পিটিশন দায়ের করে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এসব বেতনভুক্ত শুভানুধ্যায়ীদের পাকড়া করার মতো যথোপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা দেশে নেই। যদিও দেশদ্রোহীদের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন প্রদানও দেশদ্রোহীতার সামিল। ভারতসহ সব বিচ্ছিন্নতাবাদ কবলিত দেশে এসব ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী ও শুভ্যানুধায়ীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার আইনগত ব্যবস্থা রয়েছে।

এর ফলে কেবল নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাই ক্ষমতাহীন ও বিব্রতকর অবস্থা নেই, বরং সাধারণ জনগণও সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মী হয়ে রয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী অপরাধীদের দমন করে জনজীবনকে সন্ত্রাস ও শঙ্কামুক্ত করতে

পারছে না। একই কারণে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতার ভিতও দিন দিন দুর্বলতর হচ্ছে।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে শান্তিবাহিনী এবং তার সহযোগী সন্ত্রাসীদের দমন করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শত্রুমুক্ত করতে হলে অন্ততঃ ভারতের অনুকরণে 'টাডার' মতো কঠোর না হোক, কমপক্ষে পাঞ্জাব, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, সর্বোপরি কাশ্মীরের মতো বিশেষ ক্ষমতা আইন অতি শীঘ্র প্রনয়ন করা উচিৎ।

'টাডা'র মতো কালা-কানুন কিংবা বিশেষ ক্ষমতা ছাড়াও সন্ত্রাস-কবলিত এলাকা বা রাজ্যকে উপদ্রুত (Disturbed) এলাকা হিসেবে ঘোষণা করার বিশেষ ক্ষমতা যে ভারত সরকারের রয়েছে ইতোপূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরণের উপদ্রুত এলাকার সাধারণ নাগরিকদের সব ধরণের মৌলিক ও মানবিক এবং সাংবিধানিক অধিকার হরণ করে বা স্থগিত রেখে সন্ত্রাসী দমনের নামে নিরাপত্তা বাহিনী সাধারণ মানুষকেই বিব্রত ও নাজেহাল করছে, অনেক সময় তাদের হত্যা করছে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম বহুদিন আগেই উপদ্রুত এলাকায় পরিণত হলেও অজ্ঞাত কারণে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে আজ পর্যন্ত উপদ্রুত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেননি। কিংবা দেশদ্রোহীদের দমনে উদ্যোগী হননি। ফলে সন্ত্রাসী এবং তাদের সহযোগীরা কেবল শাস্তিহীনই থাকছেনা, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বও চরম হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

বিশ্বের খুব কম সংখ্যক সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে নিস্ক্রীয় হয়েছে। তাদেরকে প্রথমে নিস্ক্রীয় করা হয়েছে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে। সামরিক চাপ বৃদ্ধি করে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কোণঠাসা করতে না পারলে এরা সংলাপে বা সমঝোতায় আসবে না। সুতরাং এ মুহূর্তের দায়িত্ব হবে নিরাপত্তা বাহিনী সমূহকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করে শান্তিবাহিনীকে এমনভাবে কোণঠাসা করা, যাতে তারা সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দমন করার আইনগত ক্ষমতা ও অধিকার তথা দায়-দায়িত্ব সামরিক বাহিনীর ওপর ছেড়ে দিতে হবে। সামরিক চাপ অব্যাহত না রাখলে রাজনৈতিক সমাধানে জনসংহতি সমিতি কখনোই আন্তরিক হবে না। ১৯৯২ সনে সামরিক চাপের মুখে পর্য্যুদস্ত হয়েই একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিল জনসংহতি সমিতি। সন্ত্রাসীদের সামরিক পন্থায় কোণঠাসা করেই সংবিধানের আওতায় রাজনৈতিক সমাধানে জনসংহতি সমিতিকে রাজী হতে বাধ্য করা যাবে। সেজন্য চাই কঠোর আইনগত ক্ষমতা।

জনসংহতি সমিতি তথা সন্ত্রাসীদের সাথে অস্ত্রবিরতি, সংলাপ, সমঝোতা যা-ই হোক না কেন, তা বিশেষ আইন প্রণয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীকে আইনগতভাবে ক্ষমতাহীন রেখে সন্ত্রাসী-বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নির্মূল করা যাবে না। সামরিক চাপ অব্যাহত না রেখে কেবল ছাড় দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎসাহিত করলে দেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা বিপন্ন হবে। ■

শরণার্থী সমস্যা

- যেভাবে শুরু হয়েছে
- দুর্বিসহ জীবন
- ত্রিপুরায় প্রতিক্রিয়া
- ফিরিয়ে আনার চেষ্টা

যেভাবে শুরু হয়েছে

সন্ত্রাস-নির্ভর বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন তো দূরের কথা যেকোন ন্যায্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছাড়া কখনই ব্যাপকতা লাভ করেনা, সফলও হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত একেবারে প্রারম্ভিক মুহূর্তে থেকেই ছিল গণবিচ্ছিন্ন ও অযৌক্তিক। এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন বহু উপজাতীয় রয়েছে যারা জনসংহতি সমিতি বা শান্তিবাহিনী আসলে কি চায়, তা বুঝেনা। কিন্তু একটি বিষয় তারা খুব ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারছে যে, শান্তিবাহিনী নামক সন্ত্রাসীরা আসলে চাঁদাবাজ, খুনী, অপহরণকারী ও লুণ্ঠনকারী, সর্বোপরি, বিদেশী চর।

১৯৭৩ সন হতে এ শান্তিবাহিনী এবং তার শুভানুধ্যায়ী পরামর্শকরা পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্রমাগতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে বাঙ্গালী-উপজাতি নির্বিশেষে পার্বত্যবাসী জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি করে চলেছে। তারা না পেরেছে পার্বত্যবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন আদায় করতে, না পেরেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামান্যতম অংশ তাদের দখলে নিতে।

শান্তিবাহিনী ও তার দোসররা ভেবেছিল জুম্মল্যান্ডের নামে সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করলে উপজাতীয় জনগণ তাদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এমনকি উপজাতীয় জনগণ তাদেরকে আশ্রয়, খাদ্য, অর্থ প্রদান করতে অস্বীকার করতে থাকে । কোন কোন উপজাতীয় বাংলাদেশের অখন্ডতা রক্ষায় কর্তৃপক্ষের সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করতে এগিয়ে আসে।

এ ধরণের জনসমর্থনহীনতার মুখে শান্তিবাহিনীর নতুন সদস্য সংগ্রহ বলতে গেলে অসম্ভব হয়ে যায়। এ পরিস্থিতির অবসানকল্পে শান্তিবাহিনী বেপরোয়া হয়ে ওঠে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে শান্তিবাহিনীর মন্ত্রণাদাতারা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। নতুন কৌশল হিসেবে তারা ব্যাপক সংখ্যক উপজাতীয়কে ভারতে ভাগিয়ে নেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে, উপজাতীয়দেরকে ভারতে ভাগিয়ে নিতে পারলে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সিদ্ধ হবে ঃ

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা দ্রুত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে;
২. শরণার্থীদের নাম ভাঙ্গিয়ে বিভিন্নসূত্র হতে অর্থ আদায় করা যাবে;
৩. শান্তিবাহিনীর নতুন ক্যাডার প্রাপ্তির সুনিশ্চিত উৎস সৃষ্টি হবে;

৪. বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে (শরনার্থীদের) ব্যবহার করা যাবে।

এসব উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য প্রথমতঃ উপজাতীয় জনগণকে ফুসলিয়ে ভারতে নিয়ে যাবার চেষ্টা চালানো হয়। সে উদ্যোগ সফল না হওয়ায় শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীরা মুখোশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর পোশাক পরে রাতের আঁধারে উপজাতীয় গ্রামসমূহে হানা দেয়, তাদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করে, মহিলাদের ধর্ষণ করে এবং সম্পদ লুণ্ঠন করে। পরদিন সকাল বেলা শান্তিবাহিনীর ঐ সব দুষ্কৃতকারীরাই সর্বহারা উপজাতীয়দের কাছে গিয়ে সমবেদনা প্রকাশ করে, নিরাপত্তা বাহিনীর নির্মমতার প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নেয়, পুনঃ হামলার আশংকা ব্যক্ত করে, সর্বোপরি, এ অসহায় ও দুর্বিসহ জীবন হতে মুক্তি পাবার জন্য উপজাতীয়দের ভারতে চলে যাবার পরামর্শ দেয়।

উপজাতীয়দের জীবনকে বিপন্ন করে তাদেরকে ভারতে ভাগিয়ে নেবার দ্বিতীয় কৌশল আরো মারাত্মক ও অমানবিক। এ প্রক্রিয়ার একটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ দিয়েছেন প্রখ্যাত সাপ্তাহিকী 'Far Eastern Economic Review' - এর Editor-in-Chief Mr. Devis Derek তার প্রতিবেদন দেখুন ঃ

"The SB (Shanti Bahini) founded as a "home guard" to resist the pressure of Bengali immigrants from the plains, eventually went on the offensive and began targeting Bengali settlers and fellow tribals who collaborated with the authorities. Attacks on Bengali settlement had frequently led to Bengali reprisal raids and both sides have routinely made exaggerated claims. (One Bengali officials said that if Bengali settlers and the army had killed as many "innocent tribals" as the SB claimed, there would be none alive today).

The AI reports plainly establish that many of the most bloody incidents, involving Bengali reprisal raids on tribal villages, were in response to atrocities committed by the SB.

Evidently, between the mid-70s and 1986, the SB were successful in attacking Bengali settlements and provoking vicious reprisal raids by Bengalis, sometims with the active assistance if not encouragement of at least non-senior members of the Bangladesh armed forces. Equally evidently, since 1986, the Bangladeshi army, under the command of Maj-Gen. Abdus Salam, has succeeded in re-establishing discipline in its own ranks and discouraging Bengali reprisals.

The spring of 1986 produced a watershed incident in the conflict. The SB killed 38 Bengalis and injured 24 in the northern CHT in the villages of Taindong, Tanakkopara, Sentilla and Assalong - and in response, Bengali communities went on the rampage, venting their fury on local tribal communities.

In the aftermath of the bloodshed, in what the Bangladesh Government claims was an organised exodus, tens of thousands of tribal families moved out over the border into Tripura state.[১১১]

(ভাবানুবাদ ঃ সমতল হতে বাঙ্গালীদের আগমন হ্রাসের উদ্দেশ্যে "হোমগার্ড" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত শান্তিবাহিনী বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারী এবং কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগীতাকারী আপন উপজাতীয়দের ওপর অবশেষে আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়। বাঙ্গালী বসতির ওপর হামলা প্রায়ই বাঙ্গালীদের প্রতিশোধমূলক প্রতিআক্রমণে প্ররোচিত করে এবং উভয়পক্ষই (ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে) অতিরঞ্জিত দাবী উত্থাপন করে। (জনৈক কর্মকর্তা জানান বাঙালী বসতি স্থাপনকারী এবং সেনাবাহিনীর হাতে যদি শান্তিবাহিনীর দাবীকৃত এত সংখ্যক নিরাপরাধ উপজাতীয় নিহত হতো-ই, তবে আজ আর কোন উপজাতীয়ই বেঁচে থাকার কথা নয়।)

(লন্ডনভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা) এ্যামন্যাস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট স্পষ্টভাবে এ সত্যই প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, বাঙ্গালীদের ওপর শান্তিবাহিনীর অধিকাংশ বর্বরতম রক্তক্ষয়ী আক্রমণের পর বাঙ্গালীরা উপজাতীয় গ্রামসমূহে প্রতি-আক্রমণ চালায়।

স্পষ্টতঃ সত্তর দশকের মাঝামাঝি এবং ১৯৮৬ সালে শান্তিবাহিনী বাঙ্গালীদের বসতির ওপর আক্রমণ হানতে এবং তাদেরকে প্রতিশোধ-প্রবণ হয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অধঃস্তন সদস্যদের উৎসাহে না হোক সক্রিয় সহায়তায় উপজাতীয়দের ওপর ক্ষুদ্ধ প্রতি-আক্রমণে প্ররোচিত করতে সফল হয়।

----- ১৯৮৬ সনের বসন্তে এ দ্বন্দ্বের চরম অবনতি ঘটে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশে শান্তিবাহিনী ৩৮ জন বাঙ্গালীকে খুন এবং ২৪জনকে আহত করে। এর প্রত্যুত্তরে বাঙ্গালী সম্প্রদায় তাদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে স্থানীয় উপজাতীয়দের ওপর চড়াও হয়।

---

[১১১] Far Eastern Economic Review : Hongkong : March 23, 1989.

এ ধরণের রক্তক্ষয়ী ঘটনার পরিণতিতে, বাংলাদেশ সরকারের ভাষ্যমতে, পরিকল্পিত উপায়ে, হাজার হাজার উপজাতীয় পরিবার ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রস্থান করে।)

Far Eastern Economic Review এর অন্য একটি সংখ্যা (জুন, ১৯৮৬) প্রতিবেদনের দিকে তাকালে উপজাতীয়দের ভারতে প্রস্থান করার ক্ষেত্র প্রস্তুতে শান্তিবাহিনীর ভূমিকা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। প্রতিবেদনটি দেখুন ঃ

"----- a recognised Shanti Bahini force carried out its biggest coordinated attack on 29 April as it simultaneouly raided several Bangladeshi army camps and the outposts of Paramilitary - Bangladesh Rifles and followed it up with swoops on new settlements of immigrant Bengali Muslims. In turn the Muslim settlers and government forces carried out reprisal on tribal villages forcing the tribes-people to flee to India ------"[১৩]

(ভাবানুবাদ ঃ --- ১৯৮৬ সনের ২৯শে এপ্রিল শান্তিবাহিনীর একটি চিহ্নিত দল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শিবির এবং আধা-সামরিক বাহিনী-বাংলাদেশ রাইফেলস-এর চৌকির ওপর একযোগে বড় ধরণের সমন্বিত আক্রমণ চালিয়ে (হামলার এক পর্যায়ে) মুসলমান বাঙ্গালীদের বসতির ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। এর ফলশ্রুতিতে মুসলমান বসতি স্থাপনকারী এবং সরকারী বাহিনী উপজাতীয় গ্রামসমূহে প্রতিশোধমূলক হামলা চালায় যা উপজাতীয়দের ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে'।)

এ প্রসংগে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর কাছে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তারা যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে প্রমাণিত হয় যে, শান্তিবাহিনীর আক্রমণই বাঙ্গালীদের বেপরোয়া হবার জন্য দায়ী। এ্যামনেষ্টির ভাষ্য ঃ

"In general terms, Amnesty International's delegation was informed that, following the killings of non-tribal people by the Shanti Bahini in April 1986. reprisals had taken against the tribal people. The authority reiterated that the security forces had been unprepared for the sudden escalation of violence that occured, and were unable to contain the strong emotions aroused at that time. It was stated emphatically that it had not been deliberate government policy for

---

[১৩] Quoted in "Life Is not Our " The Report of the Chittagong Hill Tracts Commission : May, 1994 : PP 21-22.

such retaliation to take place. but it was acknowledged that elements of the security forces - for example junior personnel of the paramilitary or volunteer units - may have assisted in the reprisals in so far as they provided active support to the actions of the non-tribal people -----"[১২১]

(ভাবানুবাদ ঃ এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল এর প্রতিনিধি দলকে মোদ্দা কথায় জানানো হয় যে, ১৯৮৬ সালের এপ্রিলে শান্তিবাহিনী কর্তৃক অউপজাতীয় নিধনের পরবর্তীতে উপজাতীয়দের ওপর প্রতিশোধ নেয়া হয়। কর্তৃপক্ষ পুনর্ব্যক্ত করলেন যে, নিরাপত্তা বাহিনী আকস্মিক আক্রমণের বিস্তৃতির জন্য প্রস্তুত ছিল না এবং ঐ সময়ে তীব্র আবেগ প্রতিহতকরণে ব্যর্থ হয়। দৃঢ়তার সাথে দাবী করা হয় যে, এ ধরণের প্রতিশোধ গ্রহণ কোনভাবেই সরকারী নীতিমালার মধ্যে পড়ে না। কিন্তু ইহা স্বীকার করা হয় যে, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা - বিশেষত আধা-সামরিক বাহিনীর অধঃস্তন সদস্য অথবা স্বেচ্ছাসেবী ইউনিট সমূহ - অউপজাতীয়দের প্রতিশোধমূলক অভিযানে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করে থাকতে পারে।)

এ পরিস্থিতিতে প্রধানতঃ চাকমা উপজাতিভুক্ত প্রায় অর্ধ লক্ষ বাংলাদেশী উপজাতি ভারতে চলে যায়। নানিয়ার চর, লংদু, মহালছড়ি. রামু, লক্ষ্মীছড়ি, মাটিরাঙা, রাঙামাটি, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, দীঘিনালাসহ পার্বত্য অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র উপজাতীয় পুরুষ-মহিলার সাথে আলাপ করে জানা গেছে যে, এমন কিছু উপজাতীয় শরণার্থী পরিবার রয়েছে, যাদের পরিবারের দু'একজনকে প্রতি বছরই জায়গা-জমি বন্ধক রাখতে বা বর্গা দিতে কিংবা ফসল বিক্রি করতে বাংলাদেশে আসতে দেয়া হয়। এসবের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ তারা ভারতেই নিয়ে যায়। অনেক শরণার্থী পরিবারের ছেলে-মেয়েরা রাঙামাটিসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে লেখাপড়া করছে এবং এরাও নিয়মিত ভারতে যাতায়াত করে। এর মানে এই দাঁড়ালো যে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শরণার্থীরা বহির্বিশ্বে যে ধরণের অসহনীয় পরিস্থিতির প্রচারণা চালিয়ে ভারতে অবস্থান করছে, বাস্তব অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ তার বিপরীত। জনসংহতি সমিতি এবং তার আশ্রয়দাতা ভারত শরণার্থী সমস্যাকে তাদের স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ঝুলিয়ে রেখেছে। ■

---

[১২১] Life Is not Ours : Ibid : P.22

দুর্বিসহ জীবন

ভারতে আশ্রিত শরণার্থীরা বিবিধ ধরণের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে ভারত সরকারের বিশেষ ব্যবস্থাধীনে এবং জনসংহতি সমিতির সহযোগিতায়।

ভারত সরকার শরণার্থীদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য প্রতিটি শিবিরে বিভিন্ন ধরণের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রশাসনিক সুবিধার্থে প্রতিটি শিবিরকে কয়েকটি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে প্রতিটি ব্লকে এক হতে দেড় হাজার শরণার্থী থাকে। প্রতিটি ব্লকে রয়েছে রেশন বিতরণকারী একজন সরকারী কর্মকর্তা। কর্মকর্তাকে সাহায্য করার জন্য শরণার্থীদের থেকে দুই জনকে কনভেনর (আহ্বায়ক) ও সহকারী কনভেনর হিসেবে নিয়োগ করা হয়। প্রত্যেক শিবিরে একটি করে পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে। পুলিশ শরণার্থীদের ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখে। কোন শরণার্থী অপরাধ করলে তাকে ভারতীয় দন্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হয়। কোন শরণার্থী বাংলাদেশে আসতে চাইলে পুলিশের অনুমতি লাগে এবং তার অনুকূলে তার পরিবারবর্গ কিংবা অন্য কোন প্রভাবশালী শরণার্থীকে এ মর্মে নিশ্চয়তা দিতে হয় যে, বাংলাদেশগামী ব্যক্তি পুনরায় ভারতে ফেরত যাবে।

জনসংহতি সমিতি শরণার্থীদের ওপর নিজস্ব কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বজায় রাখার জন্য যে বিশেষ ধরণের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলেছে তা নিম্নরূপ ঃ
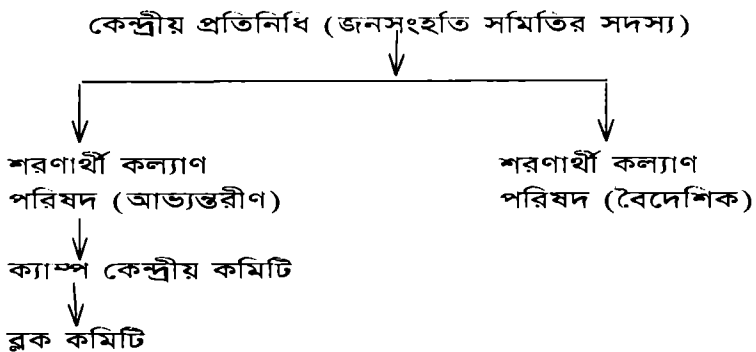
প্রতিটি ক্যাম্প কেন্দ্রীয় কমিটিতে ২/৩ জন শিবির পরিচালক রয়েছে, যাদেরকে লেফটেন্যান্ট থেকে ক্যাপ্টেন পদমর্যাদাসম্পন্ন বলে মনে করা হয়।

শরণার্থীরা বাংলাদেশে আসতে চাইলে কিংবা অন্য কোন দূরবর্তী স্থানে যেতে চাইলে তাদেরকে পরিচালকের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। বিদেশ হতে কোন দর্শনার্থী আসলে শিবির পরিচালক জনসংহতি সমিতির লাইনে তাদেরকে সংগঠনের বক্তব্য অভিহিত করেন।

শরণার্থী যুবকদের সংগঠিত করার জন্য প্রত্যেক শিবিরে ক্লাব গঠন করা হয়েছে। যেসব শরণার্থীকে গুপ্তচর হিসেবে সন্দেহ করা হয়, কিংবা যারা স্বদেশে ফিরে যেতে চেষ্টা করে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়। শরণার্থীদের মধ্যে এই আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে যে, যেহেতু তাদের সব সম্পত্তি বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারীরা দখল করে নিয়েছে, তাই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে কোথায় ঘর-বাড়ী তুলবে, কোথায় চাষাবাদ করবে। তাদেরকে আরো বলা হয় যে, বাংলাদেশ সরকার ফিরে আসা শরণার্থীদের যে ধরণের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা বলে আসছে, আসলে তা ভাওতা মাত্র। জনসংহতি সমিতি শরণার্থীদের মধ্যে এমন কিছু চর সৃষ্টি করেছে যারা বলে বেড়ায় যে, বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে সরকারের কাছ হতে তারা কিছুই পায়নি এবং জায়গা-জমিও ফেরত দেয়া হয়নি। তাই তারা পুনরায় ভারতে চলে এসেছে।

শরণার্থীরা হতাশা ও নানাবিধ সমস্যায় ভুগছে। তারা সমস্যার কোন রাজনৈতিফ সমাধানের সম্ভবনা দেখতে পাচ্ছে না। তারা অনুধাবন করে যে, জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনী তাদের নিজস্ব স্বার্থে শরণার্থীদের বছরের পর বছর ভারতে আটকে রাখবে। কারণ শরণার্থীরা হচ্ছে তাদের আসল পুঁজি। শরণার্থীদের দেখিয়ে তারা সীমিতভাবে হলেও দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহানুভূতি, সর্বোপরি আর্থিক সহযোগিতা পাচ্ছে। শরণার্থীরা স্বদেশে ফিরে আসলে তারা এসব সুবিধা পাবে না। সব সন্ত্রাসীরা এখন শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় পাবার যে সুযোগ পাচ্ছে, তখন তাদেরকে আশ্রয় দানের যুক্তি ভারতের কাছে থাকবে না। তারা মনে করে এই কারণে বার বার প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হলেও শেষ হয় না।

বস্তুতঃ জনসংহতি সমিতি শরণার্থীদেরকে অনির্দিষ্টকারের জন্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নিয়েছে। কারণ সমিতির নেতৃবৃন্দ জানে যে, শরণার্থীরা দেশে ফিরে আসলে তারা এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে দাবী করার এবং সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাবার যৌক্তিকতা হারাবে। তারা নেতৃত্বহীন হয়ে পড়বে। শান্তিপূর্ণ সমাধানের পর কোন নির্বাচন হলে সমিতি কিংবা শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ যে নির্বাচিত হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী হংসধ্বজ চাকমা ও বিজয় কেতন চাকমার বিপুল ভোটে পরাজয়

জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর কাছে এ দুঃসংবাদই পৌছে দেয় যে সাধারণ পার্বত্যবাসীদের মধ্যে তাদের কোন প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ নেই। সুতরাং শরণার্থী তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে অনির্দিষ্টকাল ঝুলিয়ে রেখে স্বঘোষিত নেতা বা প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদেরকে জাহির করা এবং স্বার্থসিদ্ধি করা তাদের জন্য সর্বাধিক লাভজনক।

জনসংহতি ও শান্তিবাহিনীর জন্য সুবিধা আদায়ের পরিবেশ সৃষ্টি করতে গিয়ে শরণার্থীরা সর্বশ্রান্ত হয়েছে। যেসব শরণার্থী তাদের সাথে নিয়ে যাওয়া হাজার হাজার টাকা ফেরত পাবার আশ্বাসে জনসংহতি সমিতি কিংবা শান্তিবাহিনীর নেতাদের কাছে জমা রেখেছিল, তা তাদেরকে ফেরত না দিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে। ভারতে পাড়ি দেবার সময় শরণার্থীদের আশ্বাস দেয়া হয়েছিল যে, তাদের অবর্তমানে শান্তিবাহিনী তাদের ঘর-বাড়ী এবং জায়গা-জমি দেখাশুনা করবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফেরত দেয়া হবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব ঘর-বাড়ী, জায়গা-জমি, গরু-মহিষ, শূকর শান্তিবাহিনী অন্যের কাছে বিক্রি করে অর্থ আত্মস্মাৎ করে এবং ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীদের কাছে এই মর্মে খবর পাঠায় যে, তাদের সম্পত্তি বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারীরা দখল করে নিয়েছে।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থীরা ছয়টি শিবিরে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তাদের জন্য নির্মিত বাসগৃহসমূহ ঢাকা শহরের বস্তিবাসীদের খুপড়ির মতো গাদাগাদি করে সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত কুটির বিশেষ, যা বাস্তব অর্থেই মানব বসতির পক্ষে অনুকূল নয়। এই সব খুপড়ির অবস্থা প্রসংগে নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ড হতে প্রকাশিত সাময়িকী "Himel : South Asia" লিখেছেনঃ

"The Chakma encampments in Tripura are not `refugee Campus as the United Nations High Commission for Refugees would define them .... The Chakma huts are of mud and thatch."[১১২] (ভাবানুবাদ ঃ ত্রিপুরাস্থ চাকমা শরণার্থী শিবিরগুলো জাতিসংঘ উদ্বাস্ত সংক্রান্ত হাই কমিশন কর্তৃক পরিচালিত শিবিরের পর্যায়ভুক্ত নয়। - - - চাকমাদের ঝুপড়িগুলো মাটি ও লতা-পাতার)

এসব ঝুপড়িগুলো নোংরা, সংকীর্ণ, অস্বাস্থ্যকর, বর্ষাকালে স্যাঁত-স্যাঁতে। সংস্কার ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষাকালে অধিকাংশ ঝুপড়ির চাল দিয়ে পানি

---

১১২ Himal South Asia : Kutmandhu : April : 1996.

পড়ে। ঝড় বৃষ্টির ফলে অনেক শিবির ভেঙ্গে পড়েছে। অনেককেই খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাতে হয়।

দীর্ঘদিন যাবত এসব শরণার্থীরা মূলতঃ অনাহার-অর্ধহারে দিন কাটাচ্ছে। ভারতের মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক "Frontline" সাময়িকী শরণার্থী শিবিরের দুর্বিসহ জীবনের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন ঃ

"--- They are given ration by the government and a "Financial assistance" of Rs.2 each every 10 days. that is. 20 Paise a day. It is a life of despair. Suresh Kanti Chakma and Akshoy Moni Chakma Chairman and General Secretary respectively of the Takumbari Relief Camp Wealfare Association. were school teachers in government service in the CHT. "Our salaries would have been somewhere between Rs. 4.000 to Rs. 4.500 a month today. Here we have to make do with 20 Paise a day". they said.

The inmates. therefore. have had to find ways of earning money. One is doing manual labour, while the local rate is Rs 25 to Rs 30 a day in the farming season. The desparate camp people work for as little as Rs. 10 or even Rs. 5. Since fuel is scarce the camp women have to go to the nearby forests for fire wood. This exposes them to sexual assult. These are reported to government intellegence men who visit the camp regularly but nothing happens. First Information Reports (FIR) lodged with the police have not brought any result. There are reports that some women are forced to have sex with Indian security personnel for paltry sums even Rs.2 sometimes.

Health care for the inmates is almost non-existent. But it is the lack of education that hurts them the most. There are primary schools in all six camps where --- teachers render voluntary service and each works for an allowance of Rs.100 each. There are secondary schools (upto class x). ----- Unfortunately government of Tripura turned down the refugees request that their children be allowed to take the state's Madhyamik examination."[১৩৩]

(ভাবানুবাদ ঃ সরকার তাদেরকে রেশন দিয়ে থাকেন এবং প্রতি ১০ দিনে প্রত্যেককে দু'রুপী অর্থাৎ প্রত্যহ ২০ পয়সা দেয়া হয়। ফলে তারা হতাশ জীবন-যাপন করছে। টাকুমবাড়ী রিলিপ ক্যাম্প কল্যাণ-পরিষদের সভাপতি সুরেশ কান্তি চাকমা এবং সাধারণ সম্পাদক অক্ষয়মনি চাকমা উভয়ে পার্বত্য

Frontline : July 2, 1993. Madras - 600002; India 1993.

চট্টগ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তারা বললেন, "এখন আমাদের মাসিক বেতন ৪,০০০ থেকে ৪,৫০০ টাকার মধ্যে হতো। এখানে আমাদেরকে দৈনিক ২০ পয়সা দিয়ে চলতে হয়।"

ফলে শরণার্থীদের কিছু অর্থ উপার্জনের উপায় খুঁজতে হয়। কেউ কেউ কায়িক শ্রম করে থাকে। ফসলের মওসুমে স্থানীয় একজন দিন-মুজুর যেখানে দৈনিক ২৫ থেকে ৩০ রুপীর বিনিময়ে কাজ করে, শিবিরের বেপরোয়া লোকেরা মাত্র ১০ রুপী, এমনকি ৫ রুপীর বিনিময়ে ঐ কাজ করে থাকে। ফলে (শরণার্থীদের ব্যাপারে) স্থানীয় লোকদের মধ্যে প্রায়ই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। জ্বালানী সামগ্রী দুস্প্রাপ্য বলে শিবিরের মহিলাদেরকে পার্শ্ববর্তী বনে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহে যেতে হয়। সেখানে তারা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। নিয়মিতভাবে শিবির পরিদর্শণকারী গোয়েন্দা সংস্থার লোকদের কাছে যৌন নিপীড়নের এসব খবর জানানো হয়, কিন্তু এর কোন প্রতিকার হয়না। এমন সংবাদও পাওয়া যায় যে, ভারতীয় নিরাপত্তা রক্ষীরা কখনো কখনো মাত্র ২ রুপীর বিনিময়ে শরণার্থী মহিলাদেরকে দেহদানে বাধ্য করে থাকে।

কিন্তু লেখাপড়ার সুযোগহীনতাই তাদেরকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ ও মর্মাহত করছে। ছয়টি শিবিরেই প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ---- শিক্ষকরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে প্রত্যেকে ১০০ রুপী ভাতায় কাজ করে থাকেন। --- মাধ্যমিক (১০ম শ্রেনী পর্যন্ত) বিদ্যালয়ও রয়েছে। --- দূর্ভাগ্যজনকভাবে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার শরণার্থীদের সন্তানদের রাজ্যের মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেবার সুযোগ দানের অনুরোধ বার বার প্রত্যাখ্যান করে আসছে।)

ত্রিপুরায় শরণার্থী শিবির থেকে পালিয়ে এসেছেন এমনকিছু শরণার্থী জানিয়েছেন যে, তাদের জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্য একজন মানুষের নূন্যতম চাহিদার তুলনায় অতি সামান্য। 'হিমেল সাউথ এশিয়া' জানিয়েছেন যে, বছরের পর বছর যাবত চাকমা শরণার্থীরা দৈনিক মাত্র চারশত গ্রাম চালসহ সামান্য পরিমাণ লবণ পেয়ে থাকে। সম্প্রতি এর পরিমাণ আরো হ্রাস করে অর্ধেক করা হয়েছে।

"ত্রিপুরা ঘুরে এসেঃ সরজমিন প্রতিবেদন" শীর্ষক একটি সংবাদভাষ্যে বাংলাদেশের একটি দৈনিক জানিয়েছেনঃ "ভারত সরকার থেকে শরণার্থীদের প্রত্যেকদিন প্রাপ্ত বয়স্কদের ৪৫০ গ্রাম চাল, ৫০ গ্রাম ডাল, ৫ গ্রাম রান্নার তেল, ১৫ গ্রাম লবন, শুকনো মাছ ৩০ পয়সার, জ্বালানী কাঠ ৩০ পয়সার এবং নগদ ২০ পয়সা দেয়ার কথা থাকলেও এসব কিছুরই অর্ধেক করে সরবরাহ করা হয়।"[১১৫]

---

[১১৫] নুরুর রহমান ঃ দৈনিক সংবাদঃ ঢাকাঃ সেপ্টেম্বর ৪, ১৯৯৬।

কখনো কখনো শরণার্থী শিবিরে চালের পরিবর্তে আলু সরবরাহ করা হয়। নূন্যতম খাবার না পেয়ে অপ্রাপ্ত বয়স্কা শরণার্থী মেয়েরা দেহ ব্যবসায়ে নামার কথা তারা স্বীকার করেছেন। তারা জানিয়েছেন যে, বিএসএফ ও শান্তিবাহিনীর সদস্য, শরণার্থী কল্যাণ সমিতি ও জনসংহতি সমিতির অনেক নেতার বিরুদ্ধে শরণার্থী যুবতীদের ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে। অনেক যুবতী এবং তাদের অভিভাবকরা জীবনের ভয়ে ধর্ষিতা হবার পরেও মুখ খোলেনা। প্রায় ৫ হাজার কিশোরী ও যুবতী শরণার্থী শিবির হতে নিখোঁজ হয়েছে বলে জানা গেছে। শরণার্থী কল্যাণ সমিতি ও জনসংহতি সমিতির নেতারা কিংবা তাদের যোগসাজশে ভারতীয় নারী পাচারকারীরা এ সব হতভাগ্য কিশোর-যুবতীদের ভারতসহ অন্যান্য দেশের গণিকালয়ে বিক্রি করে দিয়েছে বলে সন্দেহে করা হচ্ছে। বিদেশে চাকমা সম্মেলনে যোগদানের কিংবা বিদেশ সফরের অথবা বিদেশে চাকরি প্রদানের লোভ দেখিয়ে বহু চাকমা শিক্ষিতা যুবতীকে তাদের নেতারা বিদেশে নিয়ে একদিকে তাদেরকে ভোগ করে, অন্যদিকে বিদেশীদের কাছে বিক্রি করে অর্থের লোভে, যেখানে তাদের প্রধান কাজ হলো দেহদান।

স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থা ও চিকিৎসা সুবিধার অভাবে শরণার্থীদের জীবন আরো দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। শিবিরগুলোতে নিয়মিতভাবে ডাক্তার কিংবা ঔষধ পাওয়া যায় না। ম্যালেরিয়া ও আমাশয় প্রায় প্রতিটি শরণার্থী পরিবারেই লেগে আছে। প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থীরা জানিয়েছেন যে, (১৯৯৫ সন পর্যন্ত) প্রায় ৭ হাজার শিশু ও বৃদ্ধ চিকিৎসাজনিত রোগে মৃত্যুবরণ করেছে।

শরণার্থী শিবির সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে ১৯৯৬ সনের ২১ জুন আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সাবেক ল্যাফটেনেন্ট আলোক বিকাশ চাকমা জানিয়েছেন, "অধিকাংশ শরণার্থীরাই মানবেতর জীবন যাপন করছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কোন সময়েই নির্দিষ্ট তারিখে মাসিক রেশন প্রদান করে না। রেশন বিতরণ কর্মীদের বিভিন্ন অবৈধ ইচ্ছা পূরণ না করলে রেশন কার্ড বাতিলসহ তালিকা হতেও নাম কাটা যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। স্থানীয়, পুলিশ, বিএসএফ ও গোয়েন্দা সংস্থার বহু লোক ও ফটকা ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সদা তৎপর থাকে। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও পিছিয়ে নেই, বিশেষ করে কংগ্রেস কর্মীরা।"

"রেশন তুলে বিক্রি করে দেয়া, ভারতীয় শাড়ী-কাপড়সহ বিভিন্ন পণ্যের ব্যবসায়ে বাধ্য করা, গাঁজা ও রামসহ (ভারতীয় মদ) ও হেরোইনের চালান বাংলাদেশে পৌছে দেয়া ও বিক্রি করা, স্থানীয়ভাবে তৈরী রিভলবার ও পিস্তলের ব্যবসা ইত্যাদি শরণার্থী শিবিরের নিত্যকার ঘটনা প্রবাহ। পছন্দসহ নারীকে না পেলে রেশনকর্মীরা রেশন কার্ড বাতিল করে দেয়। পুলিশ ও বিএসএফ নানা

হয়রানি করে। শিবির হতে পলায়নকারীরা পরিবারসহ ধরা পড়লে যুবতী স্ত্রী-কন্যাকে ২/১ দিনের জন্য বিএসএফ ক্যাম্প বা পুলিশ ক্যাম্পে তথ্য আদায়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ---- শারিরীকভাবে ভোগ করা ছাড়া আর কোন তথ্যই তাদের প্রয়োজন হয় না।" ■

ত্রিপুরায় প্রতিক্রিয়া

ত্রিপুরা হলো ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্যগুলোর অন্যতম। রাজ্যটির আয়নত ৪,১১৬ বর্গমাইল। ১৯৮১ সানের আদম শুমারী অনুযায়ী ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ছিল ২০,৪৭,৩৫১।[১৩৫] ফলে ইহা ভারতের সর্বাধিক জনবহুল রাজ্যগুলোর অন্যতম। অথচ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একেবারে পশ্চাদপদ। আধুনিক তেমন কোন শিল্প-কারখানা সেখানে গড়ে ওঠেনি। কৃষিকাজই অধিবাসীদের প্রধান পেশা। রাজ্যের ৭৪% অধিবাসীরাই ভূমিহীন।[১৩৬] ফলে বিপুল সংখ্যক ত্রিপুরাবাসী বেকার এবং অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র। বিশেষতঃ ত্রিপুরার মূল আদিবাসীরা টিপরাসহ অন্যান্য উপজাতিভুক্ত অধিবাসীরা দিল্লীর শোষণ এবং বহিরাগতদের ব্যাপকহারে বসতি স্থাপনের ফলে ক্ষুদ্ধ হয়ে বিদ্রোহী ভূমিকায় অবতীর্ণ।

এ পটভূমিতে ত্রিপুরার মাটিতে বাংলাদেশী চাকমা শরণার্থীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। যারা অউপজাতীয় বসতি স্থাপনকারী তারা মনে করে চাকমাদের ত্রিপুরায় এভাবে থাকতে দেয়া হলে এদের মধ্য থেকে বেশ কিছু সংখ্যক স্থায়ীভাবে ত্রিপুরাতেই থেকে যাবে। তাদের মতে এসব শরণার্থী উপজাতি কালক্রমে স্থানীয় উপজাতিদের সাথে মিশে যাবে এবং স্থানীয় উপজাতীয়দের মতোই সশস্ত্র বিদ্রোহীতে পরিণত হবে বসতি স্থাপনকারীদের বিতাড়নের জন্য।

অন্যদিকে উপজাতীয় অধিবাসী, বিশেষতঃ ভারতীয় শাসনের বিরোধী জঙ্গীরা মনে করে চাকমা শরণার্থীরা ত্রিপুরায় অবস্থান করছে ভারতে স্বার্থরক্ষা করার জন্য। তাদের মতে শরণার্থীরা বিশেষতঃ জনসংহতি সমিতি এবং শান্তিবাহিনীসহ ইহার অন্যান্য সহযোগী সংগঠন ভারতের 'চর' এবং ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সপ্তরাজ্যের স্বাধীনতাকামী জঙ্গীদের নির্মূল করতে তারা ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই ত্রিপুরার জঙ্গী সংগঠনগুলো চাকমা শরণার্থীদের ত্রিপুরায় অবস্থানের তীব্র বিরোধী। All Tripura Tigers Forces (ATTF) নামক একটি জঙ্গী সংগঠন ১৯৯৬ সনের জুন মাসে চাকমা শরণার্থীদেরকে তাদের শিবিরের বাইরে যেতে নিষেধ করে দিয়েছে। এমনকি তাদেরকে সাহায্য করছে এমন ভারতীয় নাগরিকদেরকেও সহযোগিতা প্রদান হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। ATTF এর মৃত্যু-হুমকি এড়ানোর জন্য কুরবাক শরণার্থী শিবিরের ২ জন

---

১৩৫ শাহজাহান সরদার ঃ দৈনিক ইত্তেফাকঃ ২ নভেম্বরঃ ১৯৯৬

১৩৬ নূরুর রহমান ঃ দৈনিক সংবাদঃ ঢাকাঃ ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।

কর্মকর্তা ১৯৯৬ সনের জুলাই মাসে পদত্যাগ করেছিলেন। এদের নাম হলো অতুল প্রসাদ পাল ও রবি মোহন পাল।

চাকমা শরণার্থীদের অব্যাহতভাবে ত্রিপুরায় অবস্থানের প্রেক্ষিতে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিভিন্ন সময়ে শরণার্থীদের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে। আগরতলা হতে প্রকাশিত "দৈনিক সংবাদ"-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে বাংলাদেশের "দৈনিক মিল্লাত" জানিয়েছেন যে, শরণার্থীদের অবস্থানের ফলে অমরপুরের (যেখানে শরণার্থী শিবির রয়েছে) ব্যাপক অঞ্চলে বনজ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, "প্রতিদিন শরণার্থীদের জ্বালানীর জন্য ২৫০ ট্রাক কাঠ ক্রয় করা হচ্ছে। এই সুযোগে মূল্যবান কাঠ কেটে ফেলে হচ্ছে"।

শরণার্থীদের জন্য ব্যাপক বন উজাড়ের ফলে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ফলে কিছুকাল হতে বিভিন্ন শিবিরে রহস্যজনক অগ্নিকান্ড ও চোরাগোপ্তা হামলা চলছে। যদিও ভারতের কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা এ ধরণের ঘটনাকে বাংলাদেশের চরদের কান্ড বলে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে, বাস্তবে এর জন্য স্থানীয় জনগণের অসন্তোষই মূলত দায়ী। ১৯৯০ সনের মে মাসে কাঠালছড়ি শরণার্থী শিবিরে অতর্কিত হামলায় ৩ জন শরণার্থী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। দেশে ফেরত আসা উপজাতীয়দের কাছ থেকে জানা গেছে যে, শরণার্থীদের ওপর বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েই স্থানীয় জনসাধারণ এ জঘন্য পন্থা অবলম্বন করেছে যাতে শরণার্থীরা ত্রিপুরায় না থাকে।

শরণার্থীদের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার জনগণের ক্ষুব্ধ হবার আরো কারণ রয়েছে। শরণার্থী শিবিরের রিলিফ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তীব্রভাবে অপ্রতুল হওয়ায় কেবলমাত্র শরণার্থী হিসেবে প্রাপ্ত রেশন দিয়ে তাদের পক্ষে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ায় তাদের অনেকেই শিবিরের বাইরে গিয়ে নামমাত্র মুজুরীতে কাজ করে। ফলে স্থানীয় শ্রমিকদের মধ্যে শরণার্থীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোশ সৃষ্টি হয়। কোথাও কোথাও স্থানীয় দিন-মুজুররা শরণার্থী শ্রমিকদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে "১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাসে অমরপুরের মহাকুমা প্রশাসক শিখর আগোরওয়াল শরণার্থীদের স্বাধীনভাবে যাতায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। এতে বলা হয় যে, কোন শরণার্থী যদি বিনা অনুমতিতে তার নিজ জায়গা ছেড়ে অন্যত্র যান তাহলে উক্ত শরণার্থীর নাম তালিকা হতে কেটে দেওয়া হবে এবং তার প্রাপ্ত সাহায্যও বন্ধ করে দেওয়া হবে।"[১৩৭]

---

[১৩৭] দৈনিক মিল্লাত ঃ ১৪ ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৯১

নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ড হতে প্রকাশিত একটি সাময়িকী এ প্রসংঙ্গে লিখেছেন ঃ

"Because the dole is not enough many Chakmas Work outside the camps for wages lower than what the locals ask. This has created tension and recently the Tripura State Government passed order restricting the refugees to the camps".[১৩৮]

(ভাবানুবাদঃ প্রাপ্ত অতি সামান্য খয়রাতি সাহায্য জীবন ধারণের জন্য মোটেই যথেষ্ঠ নয়। তাই বহু চাকমা স্থানীয় শ্রমিকদের চেয়ে কম মুজুরিতে শিবিরের বাইরে কাজ করে। ফলে (সংশ্লিষ্ট এলাকায়) উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে এবং সম্প্রতি ত্রিপুরা সরকার শরণার্থীদের শিবিরের ভেতর অবস্থানের তাগিদ জানিয়ে নির্দেশ জারী করেছেন।)

বিভিন্ন কারণে "ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতিসহ অন্যান্য উপজাতি-প্রধান দলগুলোও শরণার্থীদের এই রাজ্য থেকে চলে যাবার স্বপক্ষে মত দেয়।"[১৩৯]

দৈনিক ইত্তেফাক'এর পক্ষ হতে সাংবাদিক শাহাজাহান সরদার সম্প্রতি ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থিত শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে গেলে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং কতিপয় সাংবাদিকের সাথে মত বিনিময় করেন। তাদের সবাই শরনার্থীদের ত্রিপুরা ত্যাগের জন্য তাগিদ দিয়েছেন। ত্রিপুরাবাসী চায় অনতিবিলম্বে চাকমা শরণার্থীরা স্বদেশে ফিরে যাক। ত্রিপুরা রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমর চৌধুরী জানান, "চাকমা শরণার্থীদের জন্য আমাদের ত্রিপুরাবাসীদের খুবই অসুবিধা হইতেছে। কঠিন সমস্যা আমাদের । সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যা হইতেছে (শরণার্থীদের কারণে) ত্রিপুরাবাসীদের ভোগান্তি, ক্ষয়ক্ষতি হইতেছে তাহাদের জন্য।"[১৪০]

আগরতলা হতে প্রকাশিত সরকার সমর্থক "দৈনিক দেশের কথা"র সম্পাদক গৌতম দাস 'ইত্তেফাক'এর প্রতিনিধিকে জানান ঃ "পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারা স্বল্প পারিশ্রমিকে শ্রম দিতেছে। সেই কারণে স্থানীয় লোকজন কাজ পাইতেছেনা।"

---

[১৩৮] The Himal South Asia : Katmunda : Nepal : April: 1996.

[১৩৯] দেবযানীদত্ত ও অনসূয়া বসুরায় চৌধুরী ঃ পূর্বোক্তঃ পৃঃ ৬০।

[১৪০] দৈনিক ইত্তেফাক ঃ ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ঃ ২ নভেম্বর ঃ ১৯৯৬ইং

ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের সূত্র হতে একই প্রতিনিধিকে জানানো হয়েছে যে, চাকমা শরণার্থীদের কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে আইন-শৃংখলার অবনতি, স্থানীয় জনগণের সাথে ঝগড়া-ফ্যাসাদ, এমনকি খুন-খারাবি হচ্ছে।

অভিজ্ঞমহল মনে করেন যে, চাকমা নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই ত্রিপুরায়, বিশেষতঃ আগরতলায়, জায়গা-জমি কিংবা ঘর-বাড়ী কেনায়, বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করায় ত্রিপুরার রাজনীতিক ও রাজনীতিক মহলে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। তারা মনে করেন এসব নেতৃবৃন্দ ভারতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের মতলবে রয়েছে। এক দশকের ব্যবধানে উচুঁ পর্যায়ের নেতা-কর্মী ছাড়াও সাধারণ শরণার্থীদের অনেকেই বাংলাদেশ হতে জায়গা-জমির আয় দিয়ে অথবা জায়গা-জমি বিক্রি করে 'ত্রিপুরা রাজ্যের নানাস্থানে, এমনকি দেশের (ভারতের) বহু সংখ্যক শহরে-গঞ্জে ছড়িয়ে গেছে'।[১৫১] শরণার্থীরা সুদীর্ঘকাল ভারতে থাকলে স্থানীয় ও জাতীয় সমস্যা ঘনীভূত হতে থাকবে আগরতলা হতে প্রকাশিত দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকার সাম্প্রতিক খবরের শিরোনাম ছিল "চাকমা উদ্বাস্তুরা ভারতবিরোধী প্রচারণায় নেমেছে।[১৫২] এ কারণে ত্রিপুরার জনগণ উপজাতি-অউপজাতি নির্বিশেষে সবাই চাকমা শরণার্থীদের অনতিবিলম্বে ত্রিপুরা ত্যাগের পক্ষপাতী। ■

---

[১৫১] দৈনিক সংগ্রাম ঃ ১২ নভেম্বর ঃ ১৯৯৬।

[১৫২] দৈনিক সংবাদ ঃ ঢাকা ঃ ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।

ফিরিয়ে আনার চেষ্টা

বাংলাদেশ সরকার উপজাতীয় শরণার্থীদের ফেরত আনার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নানা ধরণের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ চায় বাংলাদেশী নাগরিকরা দেশে ফিরে আসুক। ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের সরকার সর্বশেষ যেসব সুবিধাদি প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেগুলোর বিবরণ ঃ

১. সংবিধান ও আইনানুযায়ী উপজাতীয় শরণার্থীসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে।

২. প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি উপজাতীয় শরণার্থী পরিবারকে গৃহনির্মাণ ও কৃষি অনুদান বাবদ এককালীন পূর্ব পদত্ত ১০,০০০ টাকার স্থলে ১৪-২-১৯৯৪ তারিখে শরণার্থী নেতৃবৃন্দের দাবী অনুযায়ী আরও ৫,০০০ টাকা যোগ করে মোট ১৫,০০০ টাকা প্রদান করা হবে। পার্বত্য এলাকায় শরণার্থী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সরবরাহকৃত তালিকাভুক্ত পরিবারের নিহত সদস্যদের শেষকৃত্য পালনের জন্য অনুদান প্রদান করা হবে।

৩. প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি শরণার্থী পরিবারকে সপ্তাহে প্রতি প্রাপ্ত বয়স্ক ৫ কেজি এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ২.৫ কেজি হিসাবে ৯ মাস চাল এবং পরিবার প্রতি মাসিক ৪ কেজি ডাল, ২ কেজি সয়াবিন তেল ও ২ কেজি লবণ হিসাবে ৯ মাস প্রদান করা হবে।

৪. গৃহ নির্মাণ বাবদ প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি শরণার্থী পরিবারকে ২ বান্ডিল সি আই সীট (ঢেউ টিন) প্রদান করা হবে।

৫. যে সব শরণার্থী কৃষক পরিবারের চাষযোগ্য জমি রয়েছে দেশে ফেরার পর যথাযথ যাচাই সাপেক্ষে তাদের প্রতিটি পরিবারকে এক জোড়া হালের গরু বাবদ ১০,০০০ টাকা প্রদান করা হবে। যে সব ক্ষেত্রে শরণার্থীরা পিতা বা পিতামহের জমি নিজেদের নামে নামজারি করতে পারে নাই অথচ তারা ওয়ারিশ হিসেবে জমি জমা ভোগ করছে তারা হেডম্যানের কাছ থেকে প্রদত্ত ওয়ারিশ সার্টিফিকেট সাপেক্ষে এই সুযোগ পাবে।

৬. ভূমিহীন প্রতি পরিবারকে একটি গাভী বাবদ ৩,০০০ টাকা প্রদান করা হবে এবং প্রতি পরিবারের জন্য সরকারের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী ভূমি বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

৭. ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি শরণার্থী পরিবারের বেলায় প্রযোজ্য হবে।

৮. অন্যান্য সরকারী ব্যাংক ঋণ বাবদ পাওনা ভারতে অবস্থানরত সকল উপজাতীয় শরণার্থী পরিবার স্বদেশে ফেরার পর যথাযথ যাচাই সাপেক্ষে মওকুফ করা হবে।

৯. ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে গৃহীত ঋণ মওকুফ করা হবে।

১০. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সরকার ঘোষিত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা বলবৎ থাকবে। ইমারজেন্সি সংক্রান্ত সকল মামলার গ্রেফতারি পরোয়ানা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তা প্রয়োজন হবে।

১১. প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থীদের মালিকানাধীন জমি তাদের নিকট প্রত্যার্পণ করা হবে এবং ধর্মীয় স্থানসমূহ পুনর্বহাল করা হবে। উপজাতীয়দের গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিত করা হবে না।

১২. দেশ ত্যাগের পূর্বে যে সব শরণার্থী সরকারী/আধাসরকারী চাকরিতে ছিলেন, প্রত্যাবর্তনের পর চাকরিতে পুনর্বাসনের ব্যাপারে তাদের বিষয়ে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা হবে এবং বিদ্যমান চাকরি বিধি অনুযায়ী তাদেরকে জেষ্ঠ্যতা প্রদান ও চাকরি সুবিধাসহ পুনর্বহালের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অনগ্রসর এবং অনুন্নত জনগোষ্ঠী হিসেবে উপজাতীয়দের জন্য চাকরিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

১৩. ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরে স্থাপিত উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় থেকে যেসব ছাত্র/ছাত্রী এস, এস, সি এবং এইচ, এস, সি পরীক্ষার সার্টিফিকেট আনবে তাদের জন্য সংশ্লিষ্ট বোর্ডের অধীনে 'বিশেষ পরীক্ষা' গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে।

১৪. প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থী পরিবারের ছাত্র/ছাত্রীদের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় পুনঃভর্তি করার সুবিধাদি দেয়া হবে।

১৫. প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি শরণার্থী পরিবারকে পূর্ব সিদ্ধান্ত মত ২ বান্ডিল ঢেউটিন প্রদান ছাড়াও একটি ঘর নির্মাণের সুবিধার্থে প্রয়াজনীয় পরিমাণ কাঠের পারমিট প্রদান করা হবে।

১৬. যথাযথ যোগ্যতা সাপেক্ষে প্রত্যাবর্তনকারী উপজাতীয় তরুণ-তরুণীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের আওতাধীন

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদসমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১৭. যেসব বাংলাদেশী শরণার্থী ত্রিপুরায় অবস্থানকালে বাংলাদেশে চাকরিতে নিয়োগের নির্ধারিত বয়সসীমা অতিক্রম করেছেন, সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে তাদের বয়স শিথিল করার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনা করা হবে।

১৮. যে সকল উপজাতীয় শরণার্থীর বিরুদ্ধে পূর্বতন সরকারের আমলে অন্তর্ঘাতমূলক ফৌজদারী মামলায় শাস্তি ঘোষিত হয়েছে তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমার ব্যবস্থা করা হবে।

১৯. পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান পরিস্থিতির সাথে সংগতি রেখে পর্যায়ক্রমে বেসামরিক এলাকা থেকে ক্যাম্পসমূহ তুলে নেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

২০. সকল প্রত্যাগত উপজাতীয় হেডম্যানদেরকে তাদের স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হবে।

উপরোক্ত সুবিধার পাশাপাশি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সুনিশ্চিত করার জন্যও কতিপয় ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। শরণার্থীদের জীবন ও সম্পদকে নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে সরকার জনসংহতি সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবকৃত অস্ত্রবিরতি নিঃশর্তে মেনে নেয়। নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়, নিরাপত্তা কর্মীরা আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ না করার নির্দেশ দেয়া হয়। নিরস্ত্র কোন উপজাতীয়কে সন্দেহবশতঃ গ্রেফতার কিংবা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাময়িকভাবে হলেও আটক না করা: মহিলা সন্ত্রাসী সশস্ত্র হলেও তাকে আক্রমণ, আটক, কিংবা গ্রেফতার করা হতে বিরত থাকা, কোন উপজাতির গৃহে কিংবা জনপদে আদালত কর্তৃক নির্দেশ প্রাপ্ত না হলে তল্লাশী না চালানো: ঐ সব গৃহ বা জনপদ ধ্বংস কিংবা অগ্নিসংযোগ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সর্বোপরি, নিরাপত্তা বাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের অধীনে থেকে বেসামরিক কার্যক্রমে সহায়তা করার ব্যবস্থা করে সরকার সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে মূলতঃ বেসামরিকীকরণের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

শরণার্থীদের প্রদত্ত সুবিধাদি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রমকে শূন্যের কোঠায় এনে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট হন যা বিশ্বের অন্য কোন দেশের সরকার কখনই করেনি।

এ ধরণের অনুকূল পরিবেশ প্রত্যক্ষ করে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের গভর্ণর মিঃ রমেশ ভান্ডারী এবং শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপেন্দ্র লাল

চাকমাসহ তাদের সফরসঙ্গীরা সরজমিনে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং শরণার্থীদের আশু প্রত্যাবর্তনের আশা প্রকাশ করেন।

কিন্তু ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ এবং নীতিনির্ধারকরা চাকমা শরণার্থীদের তাদের স্বার্থ সিদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দুই দফায় মাত্র ৪৮৯৮ জন শরণার্থীকে ফেরত পাঠিয়ে কোন কারণ না জানিয়ে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া স্থগিত করে দেয়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর নতুন উদ্যোগ শুরু হয় এবং উপরোক্ত ২০ দফা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আশ্বাসে প্রথম পর্যায়ে (২৮ মার্চ, '৯৭ থেকে) ৬,৭০০জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসার কথা। সকল শরণার্থীর প্রত্যাবর্তন কবে নাগাদ শেষ হবে, কিংবা আদৌ শেষ হবে কিনা, তা এ মুহূর্তে বলা যায় না।

কারণ শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ সরকার অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক যতো প্রকার পদক্ষেপই নিক না কেন ভারত সরকার এবং তার চররা অনুকূল সাড়া না দিয়ে নতুন নতুন শর্তারোপ করে এ সমস্যাকে প্রলম্বিত করছে। প্রথম প্রথম ভারত সরকার বলে আসছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত, শরণার্থীদের ফিরে যাবার মতো পরিবেশ সেখানে নেই। বাংলাদেশ সরকার ভারতীয় কর্তাব্যক্তিদের মন্তব্যানুযায়ী নিরাপদ পরিবেশ স্থাপন এবং আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার পর ৪ বছর (১৯৯৭ পর্যন্ত) কেটে গেল, কিন্তু শরণার্থীদের ফেরত পাঠানো হলো না, বারবার আলোচনা হলো, সফর বিনিময় হলো, কিন্তু কোন অগ্রগতি নেই। ভারত এমনভাব দেখায় যেন তারা কিছুই জানে না। কখনো কখনো দেখানোর জন্য শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হবার মুখে তারাই আবার অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, কিংবা শান্তিবাহিনীকে দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের শান্ত জনপদে হামলা চালায়। এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ভারত বহির্বিশ্বকে জানিয়ে দিতে চায় যে, শরণার্থীদের ধরে রাখার কোন ইচ্ছে ভারতের নেই, সুষ্ঠু পরিবেশ নেই বলেই তারা ফিরে যাচ্ছে না। শরণার্থীদের বুঝানো হয় ভারত ত্যাগ তাদের জন্য নিরাপদ নয়।

যেসব শরণার্থী ফিরে আসে তাদের ওপর শান্তিবাহিনী আক্রমণ চালায় কখনো মুখোশ পরে, কখনো রাতের আঁধারে। স্বাভাবিকভাবেই এসব শরণার্থী পুনরায় ভারতে ফিরে যায় এবং ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ দেয়। ফলে অন্যান্য শরণার্থীরা দেশে ফিরতে ভরসা পায় না।

প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থী এবং আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্যরা জানিয়েছে ত্রিপুরাস্থ শরণার্থী শিবিরে বাংলাদেশী উপজাতীয়রা মূলতঃ বন্দী জীবন

যাপন করছে। প্রতিটি শিবিরে গোয়েন্দা সংস্থার অজানা সংখ্যক সদস্য সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকে। শিবিরের ভিতরে এবং বাইরে শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীরা শরণার্থীদের চোখে চোখে রাখে। প্রতিটি শিবিরে পুলিশ পোষ্ট ছাড়াও বিএসএফ এর জোয়ানরা চাকমা শরণার্থীদের পাকড়াও করার জন্য ওৎ পেতে থাকে।

এ ছাড়া ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশে আসার যেসব রাস্তা রয়েছে সেগুলোর বিশেষ বিশেষ স্থানে চৌকি বসানো হয়েছে। সর্বোপরি, সীমান্ত অঞ্চলে বিএসএফ ছাড়াও শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীরা মোতায়েন থাকে।

এতগুলো চোখ ফাঁকি দিয়ে শরণার্থী শিবির থেকে পালিয়ে আসা নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য কাজ। এতদসত্ত্বেও শরণার্থী শিবিরের দুর্বিসহ জীবন-জ্বালা সইতে না পেরে, সর্বোপরি, স্বদেশের মায়ায় অনেক শরণার্থী সুযোগ পেলেই শরণার্থী শিবির থেকে পালাতে চেষ্টা করে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে হয়তো তারা স্বদেশের মাটিতে পৌছিতে পারে। অন্যথায় সন্ত্রাসী কিংবা ভারতীয় গোয়েন্দা বা নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে ধরা পড়ে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়। তাদেরকে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হয়, যেন অন্যান্য শরণার্থীরা শিবির ত্যাগের কথা কখনোই মাথায় না আনে।

শরণার্থীদেরকে নিয়ে এ ধরণের টালবাহানার পেছনে যেসব মতলব কাজ করছে তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলো প্রধান ঃ

* কূটনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে একঘরে করা। বন্ধুভাবাপন্ন দাতাদেশ ও সংস্থাসমূহের কাছে বাংলাদেশকে মৌলবাদী এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী হিসেবে চিত্রিত করে সার্বিক সাহায্য প্রদান স্থগিত কিংবা বন্ধ করা;
* শরণার্থী সমস্যাকে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর এমন ধরণের আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করা, যাতে সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসীদের দাবীসমূহ মেনে নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার মতো শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন করতে বাংলাদেশকে বাধ্য করা;
* শরণার্থী শিবিরকে শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা;
* শরণার্থীদের নাম ভাঙ্গিয়ে বিভিন্ন দেশ ও উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করে আত্মস্মাৎ করা;
* বাংলাদেশকে ভারতের কাছে নমনীয় ও নতজানু থাকতে এবং ভারতের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার অনুকূল নীতিগ্রহণ করতে বাধ্য করা। ■

শান্তি অন্বেষণ

- সন্ত্রাসীরা কখন নমনীয় হয়
- অভিনব অস্ত্রবিরতি
- সংলাপ ঃ আর কতদিন
- সংলাপ শান্তি আনতে পারবে কি
- সন্ত্রাসীদের আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন

সন্ত্রাসীরা কখন নমনীয় হয়

অস্ত্রশস্ত্র, লোকবল, বিশেষত গণসমর্থনের অভাবে সন্ত্রাসীরা দুর্বল হলেই অস্ত্রবিরতি করে, সংলাপে বসে, শান্তির প্রস্তাব দেয়। শক্তিশালী অবস্থানে থাকলে সন্ত্রাসীরা কখনোই শান্তির পথে আসে না। এ বাস্তবতা আমাদের নীতি নির্ধারকদের অনুধাবন করা উচিত। জনগনের অসহযোগিতা এবং প্রতি-আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে শান্তিবাহিনী ১৯৮৫ সনে সর্বপ্রথম ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। ফলে একটি উপদল অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণ জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর আভ্যন্তরীণ কোন্দলকে সর্বপ্রথম জনসমক্ষে নিয়ে আসে। সতীর্থ ও অনুসারীদের হাতে মানবেন্দ্র লারমার নিহত হবার ঘটনা প্রমাণ করে আভ্যন্তরীন দ্বন্ধ কেমন চরমে পৌছেছিল।

এই পটভূমিতে নিছক দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিয়োজিত সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে সংলাপে বসার সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার স্পষ্টতঃ অনুধাবন করে যে, কেবল শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে জনসংহতি সমিতি সময় চাচ্ছে বলেই তথাকথিত সংলাপের আহ্বান জানায়। তাই সরকার সংলাপের প্রস্তাব নাচক করে দেয়।

অন্যদিকে ১৯৮৯ সনের জুন মাসে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্বশাসনের প্রক্রিয়া চালু করার উদ্দেশ্যে তিন পার্বত্য জেলায় স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এ ব্যবস্থায় ৩০ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদের ২০ জন সদস্যই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং পরিষদের চেয়ারম্যানের পদটি চিরন্তনভাবে উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত হওয়ায় উপজাতীয়দের স্বশাসনের বা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ এলাকার মর্যাদা দানের দাবীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় সর্বস্তরের পার্বত্যবাসী এই সংস্কারকে স্বাগত জানায়। সর্বোপরি, এই পরিষদের হাতে ২২টি বিশেষ বিষয়ে ক্ষমতা ন্যস্ত করায় প্রকৃত অর্থে এই পরিষদ, তথা পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি জেলা স্বশাসনের অধিকার লাভ করে।

এ অবস্থায় জনসংহতি সমিতির আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীর গ্রহণযোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে যায়। উপজাতীয় জনগণ স্থানীয় সরকার পরিষদকে তাদের আশা-আকাংখার প্রতীক বলে মনে করে। ফলে উপজাতীয় জনগণের কাছে জনসংহতি সমিতির প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।

স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থাকে ভন্ডুল করতে ব্যর্থ হয়ে জনসংহতি সমিতি অউপজাতীয় নারী-পুরুষ-শিশুদের হত্যা ও অপহরণের কৌশল অবলম্বন করে। জনগণের প্রবল প্রতিরোধের মুখে এই অপচেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

অন্যদিকে অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়সমূহের কাছে চাকমা প্রভাবিত জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর মূল উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে প্রকাশ হতে থাকে। বিচ্ছিন্নতাবাদী বক্তব্য ও তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট সবগুলো সংগঠনের নেতৃত্ব যে মূলতঃ চাকমাদের হাতে কুক্ষিগত অন্যান্য উপজাতিগুলো এ সত্যিটি অনুধাবনে সক্ষম হয়। ফলে জনসংহতি সমিতির সমর্থন কিছু সংখ্যক চাকমার মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। অন্যান্য উপজাতিদের সাথে চাকমারা ঐতিহাসিক ভাবে বন্ধুভাবাপন্ন নয়। এমনকি চাকমা সম্প্রদায়ের সচেতন অংশও লক্ষ্য করল যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনসমূহের নেতৃত্বে মূলতঃ লারমা পরিবার এবং তার আত্মীয়-স্বজনদের হাতে কুক্ষিগত। অন্যান্য উপজাতির যে দু'চার জন ব্যক্তি নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে রয়েছেন, তাদের ক্ষমতা সীমিত এবং তাদের ওপর সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা নজর কার্যকর থাকে। বিশেষতঃ শত্রুহননের নামে লুসাই, পাংখো, বোম উপজাতিসমূহের নির্মূলের যে কর্মসূচী শান্তিবাহিনী নিয়েছে তাতে অন্যান্য উপজাতিভুক্ত শান্তিবাহিনীর ক্যাডারদের মনে এই ভীতির সঞ্চার করেছে যে, **যদি কোন দিন পার্বত্য চট্টগ্রামে পৃথক জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাতে চাকমারাই কর্তৃত্ব করবে এবং অন্যান্য উপজাতিদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে অনেকটা পরাধীনভাবে বসবাস করতে হবে। প্রকৃত স্বাধীনতা তারা কোনদিনই পাবেনা।** এই আত্মোপলব্ধি অন্যান্য উপজাতিদের ব্যাপকভাবে দল ত্যাগে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে ।

সর্বোপরি, নিকট ভবিষ্যতে তথাকথিত জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠার সম্ভবনা একেবারেই নেই বলে শান্তিবাহিনীর ক্যাডাররা নিরুৎসাহিত হয়। অন্যদিকে ভারতের ত্রিপুরাতে তাদের নেতৃবৃন্দের বিলাসবহুল ও নিরুদ্বেগ জীবনযাপন, কিন্তু শরনার্থীদের দুর্ভোগ শান্তিবাহিনীর ক্যাডারদের হতাশ করে। সাধারণ উপজাতীয়দের মনেও বিতৃষ্ণা ও বিরক্তির সূচনা হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে এসেছে, জনসংহতি সমিতির এমন একটি সার্কুলারে মন্তব্য করা হয়েছে যে, কর্মীর স্বল্পতার কারণে দলীয় কার্যক্রম প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগ নেয়া যাচ্ছিল না, কাঠ ও বাঁশ কাটা বন্ধ হয়ে যায় তাদের ৪/৫ কোটি টাকার যে চাঁদা আদায় হতো তা বন্ধ থাকায় এবং স্থানীয় জনগণের সমর্থনহীনতার দরুণ খাদ্য ও আর্থিক সংকটে কর্মীরা প্রায় নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়ে।[১৮৩] এসব কারণে তৃণমূল পর্যায়ে

---

[১৮৩] দৈনিক ইনকিলাব ঃ সম্পাদকীয় ঃ ৮ ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৯১।

জনসংহতি সমিতি এবং শান্তিবাহিনীর প্রভাব, সমর্থন, জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পেতে থাকে। এবং এর সাথে যুক্ত হয় সেনাবাহিনীর অনমনীয় ও অব্যাহত চাপ। ধীরে ধীরে সন্ত্রাসীদের মধ্যে দলত্যাগের প্রবণতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সরকার যেসব লোভনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছেন তাতে দল-ছুট প্রক্রিয়া আরো জোরদার হয়। আশির দশকের শেষ ভাগে এবং নব্বইয়ের প্রথম ভাগে শান্তিবাহিনীর অস্তিত্ব বিলুপ্তির মুখে এসে দাঁড়ায়। অবস্থা বেগতিক দেখে 'র' এর পরামর্শে জনসংহতি সমিতি অস্ত্র বিরতির ঘোষণা দেয়। ■

অভিনব অস্ত্রবিরতি

জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকারের এ পর্যন্ত বিদ্যমান অস্ত্রবিরতির সমুদয় কৌশলটি কৌতুকোদ্দীপক। জনসংহতি সমিতি নিজস্ব উদ্যোগে একটি লিপলেটের মাধ্যমে অস্ত্রবিরতির ঘোষণা দেয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের বৃহত্তর স্বার্থে সরকার অস্ত্রবিরতির এ প্রস্তাব মেনে নেয়। ১৯৯২ সনের ১০ আগষ্ট সমগ্র পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তথাকথিত এই অস্ত্রবিরতি মৌখিক ভাবে কার্যকর হয়।

এ ধরণের একটি মারাত্মক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে সরকার এ অস্ত্রবিরতির বিভিন্ন দিক বিচার বিশ্লেষণ করেনি। সরকারের উচিত ছিল অস্ত্রবিরতি কার স্বার্থে প্রয়োজন এবং এর ফলে কোন পক্ষ কিভাবে কতখানি লাভবান হবে তা পুঙ্গানুপুঙ্গরূপে বিশ্লেষণ করা। দুর্বলতর অবস্থান থেকে অস্ত্রবিরতির প্রস্তাব দেয়ায় সরকার জনসংহিত সমিতির ওপর কতিপয় শক্ত শর্তারোপ করতে পারত, যার মধ্যে অস্ত্রসমর্পণও অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারত। দুর্বল অবস্থানে থেকে ঘোষিত এ ধরণের অস্ত্রবিরতির মাধ্যমে জনসংহতি সমিতি কিংবা শান্তিবাহিনীর ওপর এমন সব শর্তারোপ করা যেত, যা তাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিতে পারত। কেননা ঐ সব শর্ত মেনে নেয়া ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর ছিলনা। যুদ্ধের নীতিই হলো - দুর্বল মুহূর্তে শত্রুর ওপর ঝাপিয়ে পড়া এবং তাকে খতম করা, কিংবা আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। সরকার সে সুযোগ গ্রহণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। মূলতঃ জনসংহতি সমিতি কিংবা শান্তিবাহিনীর ওপর কোন শর্তারোপ ছাড়াই সরকার অস্ত্রবিরতির প্রস্তাব মেনে নেয়। সরকার কিংবা জনসংহতি সমিতি কোন পক্ষই অস্ত্রবিরতি সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেনি। বিশ্বের অন্য কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাথে এমন ছেলেখেলা ধরণের অস্ত্রবিরতি সম্ভবত আর হয়নি। একটি নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের অস্ত্রবিরতির প্রস্তাব সরকার কোন যুক্তিতে মেনে নিলেন তা তারা কখনোই জাতির কাছে পরিষ্কার করে বলেন নি। বাংলাদেশ সরকার অস্ত্রবিরতির গুঢ় রহস্য ও উদ্দেশ্যে অনুধাবনে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ও চূড়ান্তরূপে ব্যর্থ হয়। এ অস্ত্রবিরতির প্রকৃত অর্থ, পরিসীমা, শর্ত, সুবিধা এবং অন্যান্য বিষয়াদি কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরুপিত হয়নি। অস্ত্রবিরতি ছিল অলিখিত এবং চূড়ান্তভাবে শর্তহীন। যেকোন পক্ষ যেকোন সময়, যেকোন অজুহাতে, কিংবা কোন অজুহাত বা কারণ ছাড়াই অস্ত্রবিরতি নামক এ প্রহসন হতে সরে আসতে পারে।

অস্ত্রবিরতি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অনুকূলে ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান অস্ত্রবিরতি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের শক্তি সঞ্চয়ে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। শক্তি সঞ্চয় এবং সংগঠিত হবার লক্ষ্যে জনসংহতি

সমিতির সময়ের প্রয়োজন ছিল। বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার জন্য অস্ত্রবিরতি জনসংহতি সমিতিকে সে দুষ্প্রাপ্য সময় প্রদান করে।

জনসংহতি সমিতির অস্ত্রবিরতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে সরকার এই নিষিদ্ধ ঘোষিত বেআইনী সংগঠনকে প্রকৃত অর্থে বৈধ সংগঠন হিসেবে স্বীকার করে নিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগণের পক্ষ হয়ে কথা বলার বৈধ প্রতিনিধির মর্যাদা দিলেন। সর্বোপরি, জনসংহতি সমিতিকে সরকারের প্রতিপক্ষ হিসেবে মেনে নিলেন। এসব পদক্ষেপ সরকারের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার তীব্র অভাবের প্রতিফলন বিশেষ। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ এবং মতামতের ভিত্তিতে যথার্থ পর্যালোচনার পরই কেবল অস্ত্রবিরতির মতো স্পর্শকাতর এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল।

সরকারকে অস্ত্র বিরতির টোপ গিলিয়ে জনসংহিত সমিতি নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ভারতে জমা রেখে বাংলাদেশের উপজাতীয় লোকালয়ে ও গ্রামাঞ্চলে পঙ্গপালের মতো ছড়িয়ে পড়ে বশীকরণ তথা গণসংযোগ কাজ জোরদার করে। তারা উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠার বাস্তবতা, প্রয়োজনীয়তা ও সাফল্য সম্পর্কে অবিরাম প্রচার-প্রপাগান্ডা অব্যাহত রাখে। উপজাতীয় জনগণের মধ্যে শান্তিবাহিনীর প্রভাব, আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, যা আশির দশকের শেষের দিকে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এ সাফল্যের প্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতির বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন যেমন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণপরিষদ, পাহাড়ী মহিলা পরিষদ (হিলস উইম্যান ফেডারেশন) প্রভৃতি বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এসব সংগঠনের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতি পুনরায় তৃণমূল পর্যায়ে নিজস্ব শক্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

জনসংযোগের পাশাপাশি জনসংহতি সমিতি এবং তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনসমূহ বিভিন্ন ধরণের পেশাজীবী মানুষের কাছ হতে চাঁদা, টোল ও খাজনা আদায় করে, যুবক-যুবতীদের শান্তিবাহিনীতে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করে এবং বাংলাদেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা বিরোধী প্রচারণা চালায়। শান্তিবাহিনী অস্ত্রবিরতি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত প্রায় ১০০০ বার তা লঙ্গন করেছে।[১৪৪]

অস্ত্রবিরতি জনসংহিত সমিতির জন্য ব্যাপক রাজনৈতিক সাফল্য ও স্বীকৃতি এনে দেয়। সরকারের অদূরদর্শিতাপ্রসূত অতি নমনীয়তা চলমান অস্ত্রবিরতির মূল নিয়ন্ত্রা হিসেবে শান্তিবাহিনীকে জাতীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক

---

[১৪৪] দৈনিক সংগ্রামঃ ঢাকাঃ ৭ মার্চ, '৯৭।

স্বীকৃতি অর্জনে সাহায্য করে। অস্ত্রবিরতি কতদিন চলবে তা নির্ধারণের একক কর্তৃত্ব জনসংহতি সমিতির। অস্ত্রবিরতির মেয়াদ শেষ হলেই তা বর্ধিতকরণের জন্য সরকার প্রতিবারই জনসংহতি সমিতির কাছে অনুরোধসম্বলিত প্রস্তাব পাঠায়। (তবে বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর শান্তিবাহিনীর কাছে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কোন অনুরোধপত্র পাঠানো হয়নি।) এ ধরণের পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে লজ্জাজনক এবং সরকারের দুর্বলতা ও পরাজয় বিশেষ। নিছক অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে জনসংহতি সমিতি একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করলেও সরকারের অদূরদর্শিতার কারণে একটি অবৈধ ও অস্তিত্বহীন সংগঠন সরকারের ওপর কর্তৃত্ব করার অভূতপূর্ব সুযোগ অর্জন করেছে। তারা যখন যেভাবে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি করে সরকারী পক্ষকে কেবল তা-ই মেনে নিতে হয়। জনসংহতি সমিতির সিদ্ধান্ত সমর্থন এবং অনুসরণের অঙ্গীকার প্রদানই যেন সরকারের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনসংহতি সমিতি দয়া করে অস্ত্রবিরতি বজায় রাখলেই যেন সরকারী পক্ষ কৃতার্থ হন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় পার্বত্যাঞ্চলের মূল নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে নয়, জনসংহতি সমিতির দখলে।

এ ধরণের অপমানজনক পরিস্থিতি দেশের আঞ্চলিক অখন্ডতার জন্য চরম হুমকি বই কি। সরকারের পক্ষ হতে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধির অনুরোধ না করে দেখা উচিত শান্তিবাহিনী কি মাত্রায় কি ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং সে প্রতিক্রিয়ার সমুচিত জবাব দানের জন্য সরকারকে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকা বাঞ্চনীয়। বার বার অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব পাঠিয়ে জনসংহতি সমিতি এবং শান্তিবাহিনীর নৈতিক মনোবল বৃদ্ধি করে তাদের মনস্তাত্তিক বিজয়ের পথ উন্মুক্ত রাখা কোনভাবে সুবিবেচনার কাজ হতে পারেনা।

চেচনিয়ায় রুশ বাহিনী, কাশ্মীরে ও উত্তর-পূর্ব ভারতে ভারতীয় বাহিনী, ইসরাইলে ইহুদী বাহিনী সারা বিশ্বের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে বিদ্রোহ দমনের নামে সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র ব্যবহার করে অবৈধ দখলদারিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যদি অবিরাম যুদ্ধ কতে পারে, তবে আমরা কেন বহিরাগত ও বিদেশী চর জনসংহতি এবং তার অনুসারীদের নির্মূল করে আমাদের স্বদেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা বিপদমুক্ত করতে ইতস্ততঃ করব ?

সরকার কিসের ভয়ে এতো পিছটান ভূমিকা নিচ্ছেন যেকোন মূল্য ও ত্যাগের বিনিময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম রক্ষা সাধারণভাবে সব জনগণের, বিশেষভাবে সরকারের পবিত্র দায়িত্ব। অস্ত্রবিরতির নামে অপ্রয়োজনীয় ও উদ্দেশ্যহীন আপোষকামিতার মাধ্যমে শত্রুর মনোবল ও সামরিক শক্তি বাড়ানো কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হতে পারে না। ■

সংলাপ ঃ আর কতদিন

অস্ত্রবিরতি বলবৎ থাকাকালীন জনসংহিত সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের মাঝে মাঝে তথাকথিত যে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়, তার প্রক্রিয়া এবং ব্যবস্থা একেবারে দুর্ভাগ্যজনক কৌতুক বিশেষ। এক্ষেত্রেও জনসংহতি সমিতি ব্যাপক রাজনৈতিক, এমনকি সামরিক সাফল্য লাভ করে। সরকারীভাবে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এখন জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে প্রতিনিধিত্ব করার স্বীকৃত এবং অঘোষিতভাবে বৈধ সংগঠন। সরকারের ভ্রান্তনীতি এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। অথচ ইহা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বাঙ্গালী, এমনকি অন্যান্য উপজাতিদের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করেনা। চাকমা-প্রভাবিত এই সন্ত্রাসী সংগঠনের প্রতি সমুদয় চাকমা সম্প্রদায়ের সমর্থন পর্যন্ত নেই।

অথচ এমন একটি জনসমর্থনহীন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংলাপের সময় সরকার যে ব্যবস্থায় রাজী হন তা আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় ভাবমূর্তির জন্য অবমাননাকর। প্রতিটি বৈঠক শুরু হবার ৫দিন আগ থেকে খাগড়াছড়ি জেলার চেঙ্গী এবং লোগং ইউনিয়নে বিদ্যমান নিরাপত্তা বাহিনীর ৮টি শিবির পুরোপুরি বন্ধ এবং ৫টি শিবির নিষ্ক্রীয় করতে হয়। বৈঠক শেষ হবার ৩ দিন পর পর্যন্ত এ ব্যবস্থা বলবৎ থাকে। এমনকি শনখোলা সীমান্ত চৌকি হতে আশ্চর্যজনকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা নামিয়ে রাখতে হয়। সংলাপের অন্য একটি লজ্জাজনক দিক হলো সন্ত্রাসীদের হেলিকপ্টারে করে ভারতীয় সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে আনতে হয় এবং পুনরায় সেখানে পৌছিয়ে দিয়ে আসতে হয়।

এ ধরণের আত্মসমর্পনমূলক ছাড় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে জনসংহতি সমিতির কাছে বন্ধক রাখার শামিল। সংলাপ-বৈঠকের সাথে শিবির বন্ধ কিংবা প্রত্যাহার, সর্বোপরি, পতাকা নামিয়ে রাখার নিয়ম সংযুক্ত করার যে অপমানসূচক নীতি আমাদের নীতি নির্ধারকরা মেনে নিয়েছিলেন তার পেছনে কোন বৈধ ও গ্রহণযোগ্য যুক্তি ছিল না। বর্তমান সরকার সাবেক সরকারের বহু নীতি বর্জন করলেও, জনসংহতির সমিতির সাথে আপোষমূলক সংলাপ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন। এমনকি সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঢাকায় এনে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন। বাস্তব অর্থে কোন সরকারেরই সংলাপের নামে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়ে এমন সর্বনাশা ছিনিমিনি খেলার অধিকার নেই। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও দেশের অখন্ডতা রক্ষার প্রধান দায়িত্ব সরকারের, এ সবকে খাটো কিংবা দুর্বল করার অধিকার কোন সরকারেরই নেই।

উপরোক্ত অপমানজনক ব্যবস্থা ছাড়াও সংলাপ চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর যেকোন ধরণের চলাচল, টহল, স্থানান্তর স্থগিত রাখতে হয়। অথচ প্রত্যেকবারই সংলাপ চলাকালীন শান্তিবাহিনীর ২০০/৩০০ সশস্ত্র সদস্য খাগড়াছড়ি জেলার পুজ গন্জ ও চেঙ্গী ইউনিয়নের প্রধান প্রধান স্পর্শকাতর স্থানে অবস্থান নেয়। তারা নিরাপত্তা বাহিনীর ছেড়ে যাওয়া শিবিরসমূহে অবস্থান গ্রহণ করে এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে বশীকরণ সভার ব্যবস্থা করে ভবিষ্যতে কর্মসূচী ও রণনীতি সম্পর্কে কর্মী-সমর্থকদের অভিহিত ও উজ্জীবিত করে। সংলাপের ফলাফল পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণ পরিষদ এবং পাহাড়ী মহিলা পরিষদের সদস্যদের অভিহিত করার জন্য সংলাপে অংশগ্রহনকারী জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিরা তাদের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হন।

এ পর্যন্ত এরশাদ আমলে ৬ বার, বিএনপি আমলে ১৩ বার এবং আওয়ামী লীগ আমলে ৪ বার (১২ মার্চ '৯৭সহ) জনসংহতি সমিতির সাথে সংলাপে বসে। কিন্তু কোন সংলাপ-বৈঠকে ফলপ্রসূ কোন সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। এ ধরণের সংলাপ মূলতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে ম্লান করার মহড়া বিশেষ এবং সরাসরি জনসংহিত সমিতির উচ্চস্তরের নেতৃবৃন্দের সাথে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের সাক্ষাৎ-সংলাপের সুযোগ সৃষ্টির বাহন।

অথচ এ ধরণের নিরর্থক সংলাপকে ধরে রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার যেন একপায়ে দন্ডায়মান। পার্বত্য অঞ্চলে নিরাপত্তাহীন অনিশ্চিত পরিস্থিতি সৃষ্টির কথা মনে রেখে জনসংহতি নিজেই সংলাপ হতে সরে দাঁড়ানোর বাহ্যিক হুমকি প্রদান করে। নতুন বৈঠক বা সংলাপ শুরু হবার আগে বা সংলাপ চলাকালীন নতুন নতুন শর্তারোপ করে জনসংহতি সমিতি সংলাপ হতে বেরিয়ে আসার অজুহাত খোঁজে। এ যাবতকাল জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনী সংলাপকে তাদের স্বার্থসিদ্ধির এবং বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

বাংলাদেশে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনসংহতি সমিতির পক্ষ হতে এমন দাবী করা হয় যে, সাবেক বিএনপি সরকারের আমলে সংলাপ-বৈঠকের আগে বা পরে যেসব সুযোগ - সুবিধা বা ছাড় প্রদান করা হয়েছিল, বর্তমান সরকারকেও সেগুলো অব্যাহত রাখতে হবে। এ দাবী হতে এ সত্যিই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সাবেক সরকারের কাছ হতে জনসংহতি সমিতি অভূতপূর্ব ছাড় ও সুবিধা আদায় করেছিল। বর্তমান সরকারও দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেসব ছাড় প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

সংলাপ এবং অস্ত্রবিরতির নামে জনসংহতি সমিতি এবং শান্তিবাহিনী তাদের সার্বিক শক্তি বাড়িয়ে চলেছে। তারা অস্ত্র ও সন্ত্রাসী সংগ্রহ, চাঁদা আদায়, অপহরণ, খুন-জখম, ধর্ষণ, নিরাপত্তা বাহিনীর টহল ও চৌকির ওপর হামলা, বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্রান্ত কোন কিছুই ত্যাগ করেনি।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে যেকোন দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল সরকারেরই দায়িত্ব হবে সম্পূর্ণ বিষয়টি স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতা সংরক্ষণের নিরিখে পর্যালোচনা করতঃ অস্ত্রবিরতি ও সংলাপের গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দেয়া। উদ্দেশ্যহীনভাবে অনির্দিষ্টকাল আলোচনা অব্যাহত রাখা আর স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের ভিতকে দুর্বল করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

অথচ বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারও সাবেক সরকারের অনুসৃত এবং জনসংহতি সমিতির নির্দেশিত শর্ত মোতাবেকই সংলাপে বসে। তবে এ সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য কোনরূপ অনুরোধপত্র পাঠায়নি। জনসংহতি সমিতির পক্ষ হতেই দু দু'বার অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বাড়ানো হয়। তেমনি সংলাপের তারিখও নির্ধারিত হয় সরকারের ইচ্ছানুযায়ী। ■

সংলাপ শান্তি আনতে পারবে কি?

এ গ্রন্থের একাধিক স্থানে আমি উল্লেখ করেছি যে, অস্ত্রবিরতি, সংলাপ, কিংবা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের কখনই ইতি ঘটেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতার নামে চলমান সন্ত্রাস বিশ্বের অন্যসব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হতে সম্পূর্ণরূপে বিপরীতধর্মী।

প্রথমতঃ ইহা ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।
দ্বিতীয়তঃ ইহা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।
তৃতীয়তঃ সর্বোপরি, ইহা সম্পূর্ণরূপে বিদেশীদের চাপিয়ে দেয়া চক্রান্ত।

মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান সন্ত্রাস কতিপয় স্বার্থান্বেষী বিদেশী চরের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার, যারা তথাকথিত জুম্মল্যান্ডের নামে জনগণকে জিম্মী রেখে নিজেরা ফায়দা লুটছে এবং বিলাসী জীবন যাপন করছে।

এ পটভূমিতে সংলাপ কিংবা চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের সম্ভবনা খুবই ক্ষীণ। **পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা তখনই সমাধান হবে যখন বিদেশী প্রভুরা তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে, আবার তখনই পুনরায় চাঙ্গা হয়ে উঠবে যখন বিদেশীরা পুনরায় তাদের পেছনে দাঁড়াবে।**

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা যে বিদেশীদের চাপিয়ে দেয়া চক্রান্ত তা এখন আর কোন গোপন বিষয় নয়। এই কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা গত ২৪ বছর যাবৎ সক্রিয় রয়েছে এবং ১৯৮৫ সন থেকে চলে আসা সংলাপ কোন সুফল বয়ে আনেনি। বিচ্ছিন্নতার উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ সনে প্রদত্ত ৫-দফা দাবী হতে সন্ত্রাসীরা এই দীর্ঘ সংলাপে চুল পরিমাণেও সরে আসেনি। ১৯৮৫ সালে ২৬ অক্টোবর খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানা/উপজেলার পুজগাং গ্রামে শান্তিবাহিনীর সাথে প্রথম বৈঠক হয়। ১৯৯৭ সনের ২৫ জানুয়ারী পর্যন্ত সর্বমোট ২২বার সংলাপের আয়োজন করা হয়। কোন ফলোদয় হয়নি।

জনসংহতি সমিতি বিভিন্ন সময়ে আকারে ইঙ্গিতে, কখনো প্রকাশ্যে সংলাপের অসারতা এবং তাদের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছে। অস্ত্রবিরতি এবং সংলাপের সমুদয় প্রক্রিয়া সন্ত্রাসীদের তোষণের পর্যায়ে চলে গেছে। এ প্রক্রিয়াকে সরকারের দুর্বলতা হিসেবে ধরে নিয়ে জনসংহতি সমিতি অনেকটা সরাসরি বলতে চেয়েছে বিচ্ছিন্নতার পথ থেকে তারা মোটেই সরে আসবে না।

চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আবদার আলোচনার টেবিলেই তাদেরকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার মতো নিশ্চয়তা-সম্বলিত চুক্তিতে আসতে হবে, তা না হলে সন্ত্রাসী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

১৯৯৪ সনের সান্টু লারমা সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধিকে সাক্ষাৎকার দানকালে সংলাপ এবং তার সংগঠনের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছেন তাতেই সংলাপের অসারতা ও উদ্দেশ্যহীনতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ঐ প্রতিনিধিকে তিনি বলেছেন ঃ ("Although the talks have virtually degenerated into ritual sessions of gossip and feasts. we want to continue the exchange of words in the hope of landing some where near the solution. Frankly speaking we believe that CHT issue cannot be settled at the negotiating table and the path to our goal is armed struggle".)[*] (ভাবানুবাদ ঃ যদিও চলমান সংলাপ ইতোমধ্যেই নিছক গল্প-গুজব ও ভোজের আসরে পরিণত হয়েছে, তথাপি সমাধানের কাছাকাছি কোথাও পৌছার প্রত্যাশায় আমরা মত বিনিময় অব্যাহত রেখেছি। অকপটে বলতে চাই যে, আমাদের বিশ্বাস আলোচনার টেবিলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হবে না এবং সশস্ত্র সংগ্রামই হলো আমাদের লক্ষ্যে পৌছার একমাত্র পন্থা)।

এ ধরণের স্পষ্ট ও খোলাখুলি বক্তব্যের পরেও সান্টু লারমাদের রাজকীয় সম্মান দিয়ে তথাকথিত সংলাপের টেবিলে এনে মুখোমুখি বসানো কোন আত্মসম্মান সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষ্যে নিঃসন্দেহে দুরূহ ব্যাপার। অথচ সরকার লারমার এই মন্তব্য শুনেও না শোনার ভান করেছেন। সান্টু লারমাকে এ ধরণের আপত্তিকর বক্তব্য প্রত্যাহার করতেও বলা হয় নি। অথচ উচিত ছিল এ বক্তব্য প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত পুনরায় সংলাপে না বসা অথবা সংলাপ হতে অন্ততঃ সান্টু লারমাকে বাদ দিতে জনসংহতি সমিতিকে বাধ্য করা।

এ ধরণের বক্তব্য সংবাদপত্রে আসার সাথে সাথে সংলাপের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় কমিটির নিকট হতে তীব্র প্রতিবাদ আসা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। এই ব্যর্থতা তথা আপোষকামিতার মূল কারণ হলো **পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা শক্তহাতে সমাধান করার জন্য সুদৃঢ় জাতীয় পরিকল্পনা বা নীতি নেই। যখন যে সরকার আসে সে তার নিজস্ব খেয়াল-খুশিমত একটা কিছু চাপিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়।** সরকারকে এ ব্যাপারে পরামর্শ দানের জন্যও কোন বিশেষজ্ঞ দল নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা দেখাশুনার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর অধীনে Special

---

[*] The Holiday : June 10, 1994.

Affairs Division কে দেয়া হয়েছে যে সংস্থাটি এমন কতিপয় আমলা-নির্ভর, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্বন্ধে যাদের কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই। এ সংস্থার কর্মচারীরা অন্যান্য মন্ত্রণালয় হতে আসে বা অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে চলে যায়। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একদল বিশেষজ্ঞ-আমলাশ্রেণী গড়ে ওঠেনি। সুস্পষ্ট নীতিমালা এবং বিশেষজ্ঞদের অভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে আমরা বারবার রাজনৈতিকভাবে হেরে যাচ্ছি। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের হাতে Special Affairs Division কে সমর্পণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে মূলতঃ ঘনীভূত করাই হচ্ছে। Special Affairs Division কার নির্দেশে এবং কোন নীতিমালার ভিত্তিতে চলে তাও স্পষ্ট নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং সমর বিশারদদের মতামত কখনো নেয়া হয় বলে মনে হয় না। ফলে জাতীয় অস্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত ও নীতিমালার অভাবে দিন দিন ঘনীভূত হচ্ছে। **এ চক্রান্ত হতে বেরিয়ে আসতে আমরা নিজস্ব মেধা ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর না করে জনসংহতি সমিতি কিংবা ভারতের ইচ্ছ-অনুকম্পার ওপর উদ্দেশ্যহীনভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি।**

ফলে বারবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন, হত্যা, গুম, অপহরণ, অগ্নিসংযোগ, চাঁদাবাজি তথা দেশোদ্রোহীতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকা সত্বেও তথাকথিত অস্ত্রবিরতির পবিত্রতা রক্ষায় বাংলাদেশ সরকার এক পায়ে দাঁড়ানো। **শান্তিবাহিনীর অব্যাহত অস্ত্রবিরতি লঙ্ঘনের মুখে তাদেরকে প্রতিহত কিংবা শাস্তি প্রদানে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ না দিয়ে তাদেরকে একেবারে ক্ষমতাহীন ও বিকলাঙ্গ করে রাখা হয়েছে।**

এ কারণেই সান্টু লারমা ও জনসংহতি সমিতি সরাসির দেশোদ্রোহীতামূলক বক্তব্য রাখতে কিংবা কর্মতৎপরতা চালাতে দ্বিধা করছে না। ১৯৯৪ সনে প্রদত্ত সান্টু লারমার দাবী ও হুশিয়ারি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"We will return to the armed struggle if the present government fails to guarantee our fundamental and economic rights in CHT.

"We want autonomy and a separate entity for the Chittagong Hill Tracts. We are not fighting whimsically but for the cause of our historically recognised rights to our homeland.

"We can't give up our basic demand for separate entity of the tribal people".[১৮৬] (ভাবানুবাদ ঃ বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের

---

[১৮৬] The Daily Star : Dhaka : May 6, 1994.

মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানে ব্যর্থ হলে আমরা পুনরায় সশস্ত্র সংগ্রামে ফিরে যাব।

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণের স্বায়ত্বশাসন ও পৃথক স্বত্বার স্বীকৃতি চাই। আমরা উদ্দেশ্যহীনভাবে হেয়ালিপনার বশীভূত হয়ে লড়ছিনা, বরং আমাদের মাতৃভূমিতে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত অধিকারের জন্য লড়ছি।

উপজাতি জনগণের পৃথক স্বত্ত্বা বা পরিচিতি-সম্বলিত মৌলিক দাবী আমরা কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারিনা।)

একটি ক্ষুদ্র উপজাতির অন্তর্ভুক্ত অতি ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের সমন্বয়ে বিদেশী মদদে গড়ে ওঠা জনসংহতি সমিতির এ ধরণের বক্তব্যের পর সংলাপ নামক প্রহসন প্রত্যাখান করাই ছিল সমীচীন। কিন্তু সংলাপ বা অস্ত্র বিরতি অব্যাহত রাখার পক্ষপাতী মহলের যুক্তি হলো এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছুটা হলেও শান্তি বিরাজ করছে। এ পরিস্থিতি ব্যাহত হলে অনেক রক্ষপাত ও জীবনহানির সম্ভবনা দেখা দেবে।

আলোচ্য আশংকা একেবারে বাস্তব ও সুনিশ্চিত । কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন পথ আছে কিনা? যখন সান্টু লারমা বলেই দিয়েছে তথাকথিত স্বায়ত্তশাসনের নামে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার মতো ব্যবস্থা করে দিতে হবে অথবা তারা সশস্ত্র সংগ্রামে ফিরে যাবে, তখন সংলাপে বসার তো আর কোন মানে থাকে না। সান্টু লারমা'র উল্লেখিত মন্তব্য প্রায় ৩ বছর পুরানো। এই তিন বছরের ব্যবধানে তার পরিকল্পনার কোন পরিবর্তন হয়নি। ১২-১৩ মার্চ ('৯৭) ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সাথে সংলাপ শেষে ঢাকা হতে ১৪ মার্চ খাগড়াছড়ি জেলার ভারত সীমান্ত সংলগ্ন দুদুকছড়ির অদূরে এক পাহাড়ী এলাকায় অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে সান্টু লারমা বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামের (তার ভাষায় জুম্মল্যান্ড) ভূমির ওপর 'জুম্মদের' একচ্ছত্র অধিকার, সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার, বাঙ্গালী মুসলমান বাসিন্দাদেরকে (তার ভাষায় সেটেলার) উচ্ছেদ এবং সংবিধান সংশোধনের দাবী থেকে আমরা এক পাও নড়িনি -- নড়বো না।"[১] এ বক্তব্যও প্রমাণ করে যে, সংলাপের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভবনা সান্টুর লারমারাই নাকচ করে দিচ্ছে। সরকারকে সান্টু লারমা প্রদর্শিত শর্তের যে কোনটি মেনে নিতে হবে। হয়তো তাদের স্বাধীনতা দিয়ে দিতে হবে অথবা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে।

---

[১] দৈনিক সংগ্রামঃ ঢাকাঃ ১৫ মার্চ, ১৯৯৭।

দেশদ্রোহীদের নির্মূল করতে গেলে রক্তপাত হবে - এ ভয়ে দেশের এক দশমাংশ ছেড়ে দেয়াই কি সমীচীন হবে, সংশ্লিষ্ট মহলকে তা অবশ্যই ভেবে দখতে হবে। **ফলহীন অনিশ্চিত সংলাপ বৈঠককে উদ্দেশ্যহীন 'গল্প-গুজবে ও ভোজের আসরে পরিণত করে' সন্ত্রাসীদের সময় ও স্বীকৃতি দেবার মতো আত্মঘাতী পদক্ষেপের ইতি হওয়া উচিত।**

অস্ত্রবিরতি, সংলাপ, ছাড়, চুক্তি দিয়ে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন স্তিমিত হয়না, বরং আরো বেগবান ও বিস্তৃত হয় পুনরায় সে প্রসংগে ফিরে আসছি। ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে চুক্তি করেও কোনভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমন করতে পারছে না। এ সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চুক্তি হলো নাগা'দের সাথে ১৯৬০ সনের চুক্তি, শিলং চুক্তি ১৯৭৫ সনে, আসাম চুক্তি ১৯৮৫ সনে, মিজোরাম চুক্তি ১৯৮৬ সনে, ত্রিপুরা চুক্তি ১৯৮৮ সনে, বদো চুক্তি ১৯৯৪ সালে। এ ছাড়া আরও অর্ধ ডজন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বিভিন্ন উপদলের সাথে।[১৮৭] কিন্তু উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন স্তিমিত হওয়া তো দূরের কথা, তা দিন দিন তীব্রতর হচ্ছে, দিন দিন নতুন সংস্থা আত্মপ্রকাশ করছে।

নাগাল্যান্ডের যে ফিজো'র সাথে ভারত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তার কন্যা আদিনো এখন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংস্থা নাগাল্যান্ড সোসালিস্ট কাউন্সিল'এর একটি উপদলের প্রধান নেতা। ফিজো'র সময়ে নাগাল্যান্ডে মাত্র একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংস্থা ছিল এখন সেখানে কমপক্ষে ৭টি বিচ্ছিন্নতাবাদী দল ও উপদল সক্রিয় রয়েছে। ১৯৬০ এর দশকে মনিপুরে বিচ্ছিন্নতাবাদী দলের তেমন অস্তিত্ব ছিল না। এখন মনিপুরের কেবল মেইতি (Mciti) উপজাতির ৬টি জঙ্গী দল রয়েছে। মনিপুরের কুকি উপজাতিরা দুটো জঙ্গী সংস্থা গড়ে তুলেছে। এমনকি পেতি (Paitc), ভাইপি (Vaiphy), ঝো (zou) প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র উপজাতিসমূহের মধ্য হতে জঙ্গী সংস্থা গড়ে ওঠেছে।[১৮৮] এ ছাড়া মিজোরামে তিনটি, ত্রিপুরায় ৫টি, মেঘালয়ে ৩টি, আসামে ৩টি এবং অরুনাচল প্রদেশে তিনটি চোখে পড়ার মতো জঙ্গী দল রয়েছে। ১৯৯৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আসামে বদো চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বদোল্যান্ড স্বশাসিত পরিষদ (Bodoland Autonomous Council) প্রতিষ্ঠিত হয় আসামের বদো উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে। সবাই ভেবেছিলেন এ চুক্তির ফলে বদো সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু তা হয়নি। বদোরা এখন কেবল পৃথক রাজ্যই চায়না, তারা ভারত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে

---

[১৮৭] The Hindustan Times : New Delhi: India : January 16. 1996.

[১৮৮] The Hindustan Times : Ibid.

স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেমেছে। নিখিল বদো ছাত্র ইউনিয়ন ছাড়াও সেখানে এখন আরো ৫টি জঙ্গী সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে। এগুলো হলো People's Democratic Front. (PPF). Bodo Security Force (BDSF). Bodoland Liberation Tiger Force (BLTF). Bodo Womens Justice Forum. Bodoland Army ইত্যাদি। এসব জঙ্গীদের মোকাবেলায় ভারত আসামে এক লাখের বেশী নিয়মিত সৈন্য এবং একই সংখ্যক বিভিন্ন নামের আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য নিয়োগ করেও পার পাচ্ছে না।

সমস্যার এখানেই শেষ নয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা ছাড়া অন্য ছয়টি রাজ্যে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন তারা জঙ্গীদের আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন, এমনকি কৌশলগত তথ্য প্রদান করে বলে অভিযোগ রয়েছে। নাগাল্যান্ড, মনিপুর, আসাম, অরুনাচল প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং পত্র-পত্রিকা প্রায়ই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের রক্ষক ও সহায়ক বলে অভিযোগ করে।

সান্টু লারমা তথা জনসংহতি সমিতিকে ছাড় দিয়ে কোনরূপ সমঝোতায় পৌছলে তা যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ইতি ঘটাবে না উত্তর-পূর্ব ভারতের চলমান পরিস্থিতি তার জলন্ত প্রমাণ। সান্টু লারমা তথা **জনসংহতি সমিতির সাথে চুক্তি করে দেশের সার্বভৌম কর্তৃত্ব দুর্বল করে পার্বত্য অঞ্চলে আরো বেশী স্বায়ত্বশাসন প্রদান করলেই যে, চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্নাবাদী আন্দোলন শেষ হয়ে যাবে তেমন সম্ভবনা নেই বললেই চলে**। সান্টু লারমা পার্বত্য অঞ্চলের কোন উপজাতিরই প্রতিনিধি নয়। সান্টু লারমার সাথে যে তার সংস্থার অন্যসব সদস্যরাও একমত পোষণ করে তেমন নিশ্চয়তাও নেই। তাছাড়া এ **প্রজন্মের নেতৃত্ব যে সব সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে সমঝোতা করবে, পরবর্তী প্রজন্ম যে ঐ সব সুযোগ-সুবিধাকে ব্যবহার করে আরো শক্তিশালী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, এমনকি আন্তর্জাতিক-কূটনৈতিক অবস্থানে থেকে নতুন করে অস্ত্র ধারণ করবে না - এ নিশ্চয়তা কে দেবে?** আজ যতো সহজে সন্ত্রাসীদের দমন করা যাবে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের পরিধি আরো ব্যাপকতর হলে তাদেরকে নির্মূল করা অসম্ভব ধরণের কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সর্বোপরি, সন্ত্রাসীদের মদদ দানকারী ভারত তো যেকোন সময়েই সন্ত্রাসীদের মাঠে নামাতে পারবে। এখানে আরো লক্ষ্যণীয় যে, অস্ত্রবিরতি ও সংলাপ অব্যাহত থাকাকালীন নিরাপত্তারক্ষী, এমনকি বেসামরিক জনগণের ওপর শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র হামলা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, শান্তিবাহিনীর ওপর সান্টু লারমার পুরো কর্তৃত্ব নেই।

Sunday : January 12-18. 1997

সান্টু লারমা'র কর্তৃত্বহীনতার অন্য একটি জ্বাজ্জল্যমান প্রমাণ হলো সাম্প্রতি ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত চাকমা সম্মেলন। সমঝোতা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় সান্টু লারমাদের রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদা দিয়ে সংলাপ অব্যাহত রাখার মুহূর্তে বাংলাদেশ সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক ও মনস্তাত্তিক চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীদের স্বদেশী-বিদেশী সংগঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের উদ্যোগে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে ৪ দিন ব্যাপী (২৩ - ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭) শান্তি সম্মেলনের আবরণে চাকমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকার অনেক চেষ্টা করে বাংলাদেশ হতে সম্মেলনে গমনেচ্ছু ২৬ জন বাংলাদেশী বাঙালী ও উপজাতীয় প্রতিনিধির অংশগ্রহণ প্রতিহত করতে সক্ষম হলেও সম্মেলন অনুষ্ঠান বন্ধ করতে পারেননি। এ সম্মেলন বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতির তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে জনসংহতি সমিতির ৪৭টি দাবীর প্রতি পরোক্ষ অথচ জোরালো সমর্থন জ্ঞাপন করে। বাংলাদেশকে প্রদত্ত খাদ্য ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রতিরক্ষা বাহিনী লালনে যাতে ব্যবহৃত না হয়, তা পর্যবেক্ষণ ও সুনিশ্চিত করতে, সর্বোপরি, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের কাছে অস্ত্র বিক্রি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে প্রদত্ত সার্বিক প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা প্রদান স্থগিত রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সহজেই অনুমেয় যে, জনসংহতি সমিতির সাথে সমঝোতা অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিত্যাগ যে সুনিশ্চিত করবে, তেমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এ পরিস্থিতিতে 'ছাড়' দিয়ে কোন সুফল পাওয়া যাবে না, বরং দেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব চরম দুর্বিপাকে পতিত হবে।

এ অবস্থায় ভারতের মতো দীর্ঘ স্থায়ী সামরিক চাপ অব্যাহত রেখে কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতি ও তার সহযোগীদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোভনীয়ভাবে পুনর্বাসিত হবার সুযোগ দেয়াই হবে বুদ্ধিমত্তার কাজ। পার্বত্য চট্টগ্রামকে কোন ধরণের পৃথক 'ছাড়' ও সুযোগ দেয়ার যেকোন প্রকারের আত্মঘাতী প্রয়াস হতে বিরত থাকা ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। ■

সন্ত্রাসীদের আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশী চরদের সৃষ্ট সন্ত্রাস দমনের কৌশল হিসেবে সরকার শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণের বিনিময়ে কতিপয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এ প্রক্রিয়া দেশের দীর্ঘ মেয়াদী স্বার্থের অনুকূলে যাচ্ছে বলে মনে হয়না। রাজনৈতিক সমাধানের নামে এরশাদ সরকারের আমলে যে ৩ হাজার ৩শ সন্ত্রাসীকে সাধারণ ক্ষমার আওতায় সরকারী চাকরিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছিল, তারা যে মনে-প্রাণে জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা ও চক্রান্ত পরিত্যাগ করেছে এমন বিশ্বাস পোষণ করার পেছনে কোন বাস্তব প্রমাণ নেই। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা সন্ত্রাসীদের মূল নেতৃত্ব সাধারণ ক্ষমার অধীনে তাদের পছন্দসই কিছু সন্ত্রাসীকে অস্ত্রসহ কিংবা অস্ত্র ছাড়া আত্মসমর্পণের ভাওতা দিয়ে নগদ অর্থ এবং সরকারি চাকরি প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে, যা তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অপরিহার্য। সন্ত্রাসীদের অস্ত্রসমর্পণ করিয়ে শান্তিবাহিনী প্রচুর অর্থ বাংলাদেশ সরকার থেকে বকশিস হিসেবে পায়। অর্থ প্রাপ্তির নমুনা দেখুন ঃ সমর্পিত প্রতিটি এলএমজি'র জন্য ৩০ হাজার টাকা; এস এম, জি ২৫ হাজার টাকা; রাইফেল (আধা স্বয়ংক্রিয়) ২২ হাজার টাকা; রকেট লাঞ্চার ২০ হাজার টাকা; রাইফেল (বোল্ট এ্যাকশন) ১২ হাজার টাকা; পিস্তল ১০ হাজার টাকা; শর্টগান ৭ হাজার টাকা; বেতার যন্ত্র ১০ হাজার টাকা; প্রতিটি গ্রেনেড ১ হাজার টাকা; প্রতি রাউন্ড বিস্ফোরক ৫'শ টাকা; প্রতিটি বুলেট ৫ টাকা।

সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে, অনেক ক্ষেত্রে অচল ও অকেজো অস্ত্র জমা দিয়ে শান্তিবাহিনী কোটি কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের কাছ হতে সংগ্রহ করছে। বাংলাদেশ সরকার মনে হয় এই সত্যিটি অনুধাবন করতে পারেননি যে, শান্তিবাহিনীর অস্ত্রপ্রাপ্তির অফুরন্ত ভান্ডার--ভারত--রয়েছে। একটি অস্ত্রের বদলে শান্তিবাহিনী দশটি অস্ত্র ভারত হতে সংগ্রহ করে থাকে। সুতরাং অস্ত্রসমর্পণের নামে সন্ত্রাসীদের ঘুষ প্রদান সন্ত্রাসী আন্দোলনকে সক্রিয় হতেই সাহায্য করছে।

আর্থিক পুরস্কার ছাড়াও প্রতিজন আত্মসমর্পণকারী সন্ত্রাসীকে ৫ একর জমি এবং উপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সরকারী চাকরি দেয়া হয়। চাকরির সুযোগ নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পার্বত্য জেলাসমূহের প্রশাসনে ও পুলিশ বিভাগে তাদের রিক্রুটদের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। পুনর্বাসিত এসব সাবেক সন্ত্রাসীরাই পরবর্তীকালে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অর্থ, আশ্রয় ও তথ্য প্রাপ্তির উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে।

আত্মসমর্পণ ও অস্ত্রসমর্পণে সন্ত্রাসী আন্দোলন নির্মূল হয়না, ইহা সাময়িকভাবে স্তিমিত হয় এবং পুনরায় নতুন শক্তি নিয়ে তীব্র বেগে সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু হয়। অনেকেই আত্মসমর্পণকারী সরকারী চাকরি কিংবা অন্যান্য দায়িত্বে নিয়োজিত শান্তিবাহিনীর সাবেক সদস্যদেরকে শান্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রাখার অভিযোগ এনেছেন। তাদের মতে এসব সাবেক সন্ত্রাসীরা শান্তিবাহিনীর ইঙ্গিতেই সরকারের বিভিন্ন বিভাগে প্রবেশ করার লক্ষ্যে আত্মসমর্পণ করেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরি ও দায়িত্ব প্রাপ্ত সন্ত্রাসীরা তাদের আয়ের একটি অংশ নিয়মিতভাবে শান্তিবাহিনীর তহবিলে জমা দিয়ে থাকে। ফলে এরা শান্তিবাহিনীর তহবিল পুষ্ট করার ক্ষেএে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া এরা শান্তিবাহিনীর সোর্স হিসেবেও কাজ করে বলে জানা গেছে। সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গোপণীয় তথ্য এদের মাধ্যমে শান্তিবাহিনীর কাছে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

বাহ্যতঃ এরা শান্তিবাহিনীর কট্টর সমালোচক এবং শান্তিবাহিনী যে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায় এমন উড়ো চিঠি তারা সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনে। মাঝে মাঝে ২/৪ জন সত্যিকার সন্ত্রাস বিরোধী উপজাতীয়কে হত্যা করার মাধ্যমে শান্তিবাহিনী আত্মসমর্পনকারী সতীর্থদের অসহায়ত্ব প্রমাণে সচেষ্ট হয়। আত্মসমর্পণকারী সন্ত্রাসীরা জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে এখনো বিভোর। এদের দু'টো মুখ রয়েছে। তারা সরকারী কর্মকর্তাদের সামনে বিচ্ছিন্নতাবাদের সমালোচক ও শত্রু, কিন্তু তাদের পেছনে শান্তিবাহিনীর সহায়ক শক্তি। আত্মসমর্পণের পেছনে আরো বেশ ক'টি কারণ আছে বলে জানা গেছে। আত্মসমর্পণকৃত শান্তিবাহিনীর কোন কোন সাবেক সদস্য নিরাপত্তার অজুহাতে নিরাপত্তা বাহিনীর শিবিরের আশেপাশে অবস্থান করে। এরা নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে প্রায়ই যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। ফলে তাদের মাধ্যমে নিরাপত্তা রক্ষীদের লোকবল, অস্ত্রবল, অস্ত্রের প্রকারভেদ, চলাচল, অভিযান সংক্রান্ত পরিকল্পনাসহ নানা ধরণের গোপন তথ্য শান্তিবাহিনীর কাছে পৌছার যথেষ্ট সম্ভবনা থাকে।

কোন কোন বিশ্লেষক মনে করেন শান্তিবাহিনীর শিক্ষিত সদস্যদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সরকারী চাকরির সুবাধে বিভিন্ন দফতরে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাদের প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজে দক্ষ করে তোলা হচ্ছে যাতে কখনো কল্পিত জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হলে দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অভাব না হয়। একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, শান্তিবাহিনীর অনেক সাবেক সদস্য উপজেলা চেয়ারম্যান, জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানের পদসহ নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ পদে ইতোমধ্যেই অধিষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন ধরণের সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে এরা ঢুকে পড়েছে।

এই আত্মসমর্পণের অন্যতম লক্ষ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বাঙ্গালী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলা। আত্মসমর্পণকৃত শান্তিবাহিনীর সদস্যদের প্রায় সবাই পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী চাকরিতে নিয়োজিত হতে বেশী আগ্রহী। ফলে বাঙ্গালীদের বিভিন্ন দফতর হতে সমতলে বদলি করে সে স্থানে আত্মসমর্পণকৃত শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসিত করা হয়।

শান্তিবাহিনীর সাবেক সদস্য, বিশেষতঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান একান্ত সাক্ষাৎকারে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্রসমেত আত্মসমর্পণের পরিবর্তে অস্ত্রহীন অবস্থায় আত্মসমর্পণের সুযোগ দানের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। সমীরণ দেওয়ানের মতে অস্ত্রহীন অবস্থায় আত্মসমর্পণের সুযোগ দিলে শান্তিবাহিনীর অস্তিত্ব বহু আগে বিলুপ্ত হতো।

তার এ পরামর্শ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এ ব্যবস্থায় শান্তিবাহিনীর সদস্য নয়, এমন উপজাতীয়ও নিজেকে শান্তিবাহিনীর সদস্য হিসেবে দাবী করে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নেবে। কে শান্তিবাহিনীর সদস্য তার তো কোন প্রমাণ নেই। এ প্রক্রিয়ায় হাজার হাজার সাধারণ উপজাতীয় শান্তিবাহিনীর সদস্য সেজে সরকারী সুবিধা প্রাপ্তির জন্য উদ্যত হবে।

বিভিন্ন ধরণের অস্ত্রের জন্য সরকার যে বিপুল অংকের অর্থ আত্মসমর্পণকৃত শান্তিবাহিনীর সদস্যদের প্রদানের নীতি অনুসরণ করেছেন, তা প্রকৃত অর্থে দেশের সার্বিক স্বার্থের অনুকূলে নয়। কারণ এ ধরণের অস্ত্র আরো কম দামে চোরাচালানীর মাধ্যমে পাওয়া যায় বলে অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। তা'ছাড়া ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর পুরানো অস্ত্র সংগ্রহ করে তা সমর্পণের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। এ অবস্থায় নগদ অর্থ প্রদানের বিধি তুলে দেয়া বাঞ্ছনীয়। আত্মসমর্পণকে শান্তিবাহিনীর অর্থ আয়ের এবং সরকারকে বোকা বানানোর প্রক্রিয়া বলে অনেকেই মনে করেন।

এ ধরণের আত্মসমর্পণ পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস প্রশমনে সামান্যতম ভূমিকা রেখেছে বলেও মনে হয় না। বিশেষত, যারা অসংখ্য নিরাপরাধ নর-নারীর জীবননাশের জন্য দায়ী, যারা দেশোদ্রোহী, তাদেরকে আত্মসমর্পণের আবরণে পুরস্কৃত করা চরম অদূরদর্শিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শান্তিবাহিনীকে সাহায্য করে। কিংবা পুনরায় সন্ত্রাস ফিরে যায়।

আত্মসমর্পণকারী জঙ্গীরা যে পুনরায় তাদের সাবেক তৎপরতায় ফিরে যায় তার অসংখ্য উদাহরণ ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে সৃষ্টি হয়েছে। কলিকাতা হতে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিকী 'সানডে' (১২-১৮ জানুয়ারী ১৯৯৭ সংখ্যা) এক দীর্ঘ প্রতিবেদনে জঙ্গীদের পুনরায় সাবেক জীবনে ফিরে

যাবার বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন। সেসব তথ্যের দিকে তাকানো যাক ঃ

'আল-বারাক' মুজাহিদ গোষ্ঠীর সহকারী প্রধান আবদুল লতিফ খান ১৯৯৫ সনে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি সংগঠনও গঠন করেছিলেন। স্বাধীনতাকামী সহযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায় তার সংস্থা ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। ১৯৯৬ সনে ভারত সরকার কাশ্মীরে যে লোক দেখানো ভূয়া নির্বাচনের ব্যবস্থা করে জনাব আবদুল লতিফ খান তাতে জনতা দলের প্রার্থী হিসেবে কানগান নির্বাচনী এলাকা হতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৯৬ সনের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি হঠাৎ উধাও হয়ে যান। নিরাপত্তা বাহিনীর সন্দেহ ছিল যে, হয়ত জঙ্গীরা জনাব লতিফকে অপহরণ করেছে। পরে কট্টরপন্থী জঙ্গী সংস্থা 'হেজবুল মুজাহেদীন' এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, জনাব লতিফ ৫০ জন সহযোগীসহ ঐ দলে যোগ দিয়েছেন।

সাপ্তাহিকীটির ভাষ্যঃ "Ever Since Farooq Abdullah assumed the chief Ministership of Jammu and Kashmir in October last year (1996), more and more surrendered militants are joining underground outfit. Intellegence reports say that around 100 militants who had surrendered to the army have taken up arms once again in the last three months." (ভাবানুবাদঃ গত বছর (১৯৯৬) অক্টোবর মাসে শেখ আবদুল্লা জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পর বেশী বেশী আত্মসমর্পণকৃত জঙ্গী গোপন সংগঠনে যোগ দিচ্ছে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এমন প্রায় ১০০ জন জঙ্গী গত তিন মাসে পুনরায় অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে।)

পত্রিকাটির ভাষ্যে বলা হয় ঃ

- গত ডিসেম্বর (১৯৯৬) মাসে ২৭ জন সরকারপন্থী জঙ্গী 'তেহরিকুল মুজাহেদীন' নামক সংস্থায় যোগ দিয়েছে।
- সরকারপন্থী 'কাদরা' গ্রুপের শীর্ষ পর্যায়ের ৫জন জঙ্গী হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার পর ধারণা করা হয় যে, তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গীদের সাথে হাত মিলিয়েছে।
- তিনজন খ্যাতিমান কাশ্মীরী আত্মসমর্পণকৃত মুক্তিযোদ্ধা সম্প্রতি সেনা শিবির থেকে পালিয়ে যায়। এর হলেন মোহাম্মদ ইউনুস, সরফরাজ আহমদ ওয়াজা

এবং জামসেদ। নিরাপত্তা বাহিনী মনে করে যে, এরাও পুনরায় অস্ত্র হাতে নিয়েছে।

- ১৯৯৬ সনের ৭ ডিসেম্বর ৪ জন বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তা (Special Police Officer) এবং ৩ জন আত্মসমর্পণকারী জঙ্গী আজাস গ্রাম হতে অপহৃত হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে যে, তারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে হাত মিলিয়েছে।

- কাশ্মীর উপত্যাকায় নামকরা স্বপক্ষত্যাগী জঙ্গী হলো কুকা প্যারী। আত্মসমর্পণের পরপরই সে তার অনুসারীদের নিয়ে 'ইখওয়ান' নামে একটা সংস্থা খোলে। সেনাবাহিনীর নিরাপত্তাধীনে প্যারী এবং তার অনুসারীরা অন্যান্য সংগঠন হতেও জঙ্গীদের সংগ্রহ করে এবং স্বাধীনতাকামী জঙ্গীদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করে। তার সংস্থা 'আওয়ামী লীগ' নামক একটা রাজনৈতিক দলও গঠন করেছে। এবং এই দল ১৯৯৬ সনের নির্বাচনে অংশ নেয়। কিন্তু বর্তমানে সংস্থাটি মারাত্মকভাবে দলছুট সমস্যার সম্মুখীন। একটি দৈনিকের সাথে এক সাক্ষাতকারে কুকা প্যারী স্বীকার করেছেন যে, তার দলের ৭৫ জন সদস্য পাকিস্তানপন্থী জঙ্গীদলে যোগ দিয়েছেন।

সুতরাং আত্মসমর্পন সন্ত্রাস দমনে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে। **আত্মসমর্পণ হবে সম্পূর্ণরূপে স্বার্থহীন, শর্তহীন। যদি কেউ তার অতীত কর্মকান্ডকে ভুল মনে করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তাকে শাস্তিহীন থাকতে দেয়াটাই বড় পুরস্কার** ।

আত্মসমর্পণের বিনিময়ে সুযোগ-সুবিধা দানের প্রক্রিয়া সাধারণ উপজাতীয়দের শান্তিবাহিনীর সদস্য সাজতে প্ররোচিত ও উৎসাহিত করছে। কেননা যেকোন উপায়ে একটা অস্ত্র প্রদর্শন করতে পারলেই নগদ অর্থ, জমি, চাকরি প্রভৃতি পাওয়া যায় - যা' সাধারণ উপজাতীয়রা পায় না। সুতরাং এ পদ্ধতির ইতি হওয়া দরকার।

এ ধরণের আপোষকামিতা তথা আত্মসমর্পণের নামে ঘুষ প্রদানের পেছনে বিভিন্নভাবে শান্তিবাহিনীকে কি পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছে, আত্মসমর্পণকৃতদের কতজন বাস্তব অর্থে শান্তিবাহিনীর সাথে সম্পর্ক ছেদ করেছে তার একটি যথার্থ ও বস্তুনিষ্ঠ শ্বেতপত্র প্রকাশিত হওয়া উচিত। সর্বোপরি আত্মসমর্পণকৃতদের পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবর্তে দেশের অন্যত্র পুনর্বাসিত করা যেতে পারে। এর ফলে তাদের জীবন যেমন নিরাপদ হবে, তেমনি তাদের মধ্য কেউ ইচ্ছা করলেও শান্তিবাহিনীর গোপন সোর্স ও সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারবে না। ■

আরো কিছু কথা

পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যাকে হালকা করে দেখার কোন সুযোগ নেই। ইহা যতোখানি রাজনৈতিক, তার চেয়ে বেশী সামরিক। কেননা রাজনৈতিকভাবে দাবী উত্থাপনের কোনরূপ যৌক্তিক কারণ না থাকা সত্ত্বেও জনসংহতি সমিতি সরাসরি সামরিক উপায়ে দেশকে বিভক্ত করার আত্মঘাতী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সুতরাং যেকোন বিবেচনায় **সশস্ত্র সন্ত্রাসকে সামরিক উপায়ে মোকাবেলা করাই সার্বিক বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত**। তথাপি শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে অহিংস্র ও অসামরিক পন্থায়ও সমস্যাটি সমাধানে তৎপর হওয়া বাঞ্ছনীয়। দেশের বরণীয় বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক. রাজনীতিক, সমর বিশারদ, অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরের সচেতন নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে এ সমস্যা সমাধানে বেসামরিক পন্থা নিয়ে দীর্ঘ সংলাপ হয়েছে। সেসব সংলাপের পরামর্শধর্মী সার-সংক্ষেপ দেশবাসী ও সংশ্লিষ্ট মহলের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি, যা হয়ত সন্ত্রাস দমনে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখতে পারে।

সরকার পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা নিরসনের জন্য যে সংসদীয় কমিটি গঠন করেছেন, তার কাছে দেশবাসী অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। দেশবাসী দেখতে চায় এরশাদ সরকারের আমলে রাজনৈতিক সমাধানের নামে পার্বত্য অঞ্চলের প্রশাসনে সরকারের কর্তৃত্ব যতখানি শিথিল করা হয়েছে, গণতান্ত্রিক সরকার তা পুনরুদ্ধার করবেন। ঐ প্রক্রিয়ায় বাঙ্গালীদের প্রতি যে বৈষম্যমূলক অবিচার করা হয়েছে; তা দূরীভূত হবে। পুলিশ বিভাগসহ সর্বক্ষেত্রে সংখ্যানুপাতে বাঙ্গালীদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। পার্বত্য অঞ্চলে বাঙ্গালীদের জমি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান. ক্রয়-বিক্রয় তথা মালিক হওয়ার ওপর যে অসাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে, তা অচিরেই প্রত্যাহার করা হবে।

সংলাপসহ যেকোন ধরণের শান্তি প্রক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১৩টি উপজাতি সম্প্রদায় এবং বাঙ্গালীদের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত। মনে রাখতে হবে যে, **জনসংহতি সমিতি বা শান্তিবাহিনী পার্বত্য অঞ্চলের বৈধ প্রতিনিধি নয় এবং এদের সাথে পার্বত্যবাসী সমুদয় জনগণের ব্যাপক মত পার্থক্য রয়েছে**। সুতরাং স্থায়ী শান্তির স্বার্থে পার্বত্যবাসীদের সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠক হওয়া উচিত, যেখানে জনসংহতি সমিতিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পার্বত্য অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য সেনাবাহিনীর অধীনে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত 'কমান্ডো বাহিনী' গঠন

করতে হবে। সেনাবাহিনী এবং কমান্ডো বাহিনীকে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে দেশের স্বার্থে যেকোন পদক্ষেপ নেবার আইনগত ও বৈধ ক্ষমতা দিতে হবে। ভারত তার বিচ্ছিন্ন-প্রবণ এলাকাসমূহে নিরাপত্তারক্ষীদের যেভাবে অবাধ ক্ষমতা দিয়েছে, প্রয়োজনবোধে তেমন পদক্ষেপ নিতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়-জঙ্গলাকীর্ণ বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থার কথা মনে রেখে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত সেনা সদস্যদের সমন্বয়ে 'মাউন্টেন ব্যাট্যালিয়ন' (পার্বত্য বাহিনী) গড়ে তোলা প্রতিরক্ষার স্বার্থে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতসহ বিশ্বের প্রায় সব ক'টি পাহাড়-পর্বতময় দেশে এ ধরণের বাহিনী রয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চলের কোথাও সন্ত্রাসী তৎপরতা দেখা দিলে তাকে 'গোলযোগপূর্ণ এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করে সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে হবে। গোলযোগপূর্ণ এলাকার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত টাডা'র অনুকরণে বিশেষ বিধি প্রবর্তন করা উচিত। সন্ত্রাসীদের দমনার্থে শ্রীলংকা ও ভারত কর্তৃক অনুসৃত নীতি, আইন ও কৌশলকে পর্যালোচনা করে অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে হবে।

পার্বত্য অঞ্চলকে দেয় সার্বিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধাদি শর্তাধীন হতে হবে। অর্থাৎ স্বাধীনতা বিরোধী কার্যক্রম একেবারে দূরীভূত না হলে প্রদত্ত সব ক্ষমতা ও দায়িত্ব স্থগিত রাখার, কিংবা প্রত্যাহার করার অথবা এ ব্যবস্থা বাতিল করার একচেটিয়া অধিকার সরকারের থাকতে হবে।

সন্ত্রাসী এবং তাদের স্থানীয় সমর্থক-পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রয়দানকারীদের নাগরিকত্ব ও নাগরিক অধিকার বাতিল করতে হবে। তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিধি তৈরী করতে হবে। প্রয়োজনবোধে এ ধরণের লোকদের পার্বত্য অঞ্চল থেকে সরিয়ে এনে দেশের অন্যত্র পুনর্বাসিত করতে হবে। **শান্তিপ্রাপ্ত অথবা সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্টদের যেকোন ধরণের সাধারণ ক্ষমা অথবা আত্মসমর্পণের নামে পুরস্কার প্রদানের রীতি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে।**

পার্বত্য অঞ্চলের বেসামরিক জনগণ তথা দেশবাসীকে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যক্রমের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন করার ব্যাপক কর্মসূচী নেয়া উচিত। সরকারী-বেসরকারী প্রচার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের চলমান ঘটনা প্রবাহ তেমন স্থান পায়না। অজ্ঞাত কারণে দেশবাসীকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে অন্ধকারে রাখা হচ্ছে। সরকারী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সংলাপের খবর ছাড়া সরকারী, এমনকি, বেসরকারী প্রচার মাধ্যমে অন্য কোন তথ্য তেমন পরিবেশন করা হয়না। অথচ ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য জনমত গড়ে তোলা

সম্ভব। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা-সমালোচনা, বিতর্ক হওয়া উচিত।

চাকমা সন্ত্রাসীদের জনবিরোধী এবং দেশদ্রোহীতামূলক কার্যক্রমের বিশদ বিবরণ ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। জনসংহতি সমিতি, শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদসহ বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সংগঠনসমূহের বিভিন্ন দাবী বা বক্তব্যে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিরোধী যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো জনসমক্ষে বিশদভাবে আলোচিত হওয়া উচিত। **শান্তিবাহিনী ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো যে ভারতের লেলিয়ে দেয়া চর এবং তাদের পরিকল্পিত জুম্মল্যান্ড যে কোনভাবেই স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকতে পারবে না, এবং তার ভূ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো উপজাতিদের মধ্যে তুলে ধরা দরকার**। তথাকথিত জুম্মল্যান্ড চূড়ান্ত পর্যায়ে যে অন্য **১২টি** উপজাতিকে চাকমাদের জিম্মিতে পরিণত করবে এই সত্যটি অন্যান্য উপজাতীয়দের মধ্যে ব্যাপক প্রচার পাওয়া উচিত। রেডিও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম কেন্দ্র হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের জন্য যে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় তার সময় সীমা আরো বাড়িয়ে সন্ত্রাসীদের আসল চেহারা এবং তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিবরণ প্রচার করা দরকার। পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম বিভিন্ন ধরণের সুযোগ-সুবিধা এবং তার অনুকূল ফলাফল উপজাতি সম্প্রদায়গুলো দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তুলনায় কত বেশী পাচ্ছে তার তুলনামূলক চিত্র উপজাতীয়দের নিকট তুলে ধরা উচিত। এমন কি **ভারত ও মায়ানমারের উপজাতীয়দের তুলনায় বাংলাদেশী উপজাতীয়রা কত বেশী সুবিধা পাচ্ছে সে সব তথ্য সরকারী প্রচার মাধ্যমে স্থান পাওয়া উচিত**। সন্ত্রাসীদের আক্রমণ ও অত্যাচারের শিকার পার্বত্যবাসীদের সাক্ষাতকার রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রচারের ব্যবস্থা করা হলে সন্ত্রাসীরা শান্তিপ্রিয় উপজাতীয়দের কাছ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পরিতাপের বিষয় এই যে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাবলীর প্রকৃত স্বরূপ দেশবাসীর অগোচরে রাখছেন। এই প্রবণতা দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়।

সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, এমন শান্তিপ্রিয় পাহাড়ীদের (উপজাতি-বাঙ্গালী) সমন্বয়ে সন্ত্রাসবিরোধী বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। তবে এই বাহিনীর সদস্যরা যাতে কোনভাবেই সন্ত্রাস, খুন, লুট, চাঁদাবাজি, নারী অপহরণ বা ধর্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এই বাহিনী সরকার বা সেনাবাহিনীর চর হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে বেসামরিক পাহাড়ীদের বন্ধু হিসেবে কাজ করতে পারে।

আত্মরক্ষার জন্য বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারী সক্ষম নারী-পুরুষকে হালকা অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে সেনাবাহিনীর ওপর তাদের নির্ভরশীলতা হ্রাসের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। সিরিয়ার বেকা উপত্যকা, জর্ডনের পশ্চিম তীর, মিশরের গোলান হাইডস দখলকারী ইসরাইল সারা বিশ্ব থেকে ইহুদীদের খুঁজে এনে দখলীকৃত অঞ্চলে জড়ো করেছে। সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগে বেসামরিক ইহুদীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্বলিত বাসগৃহ, শিল্পকারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে ঐসব দখলকৃত অঞ্চলে বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

ইসরাইলের অনুকরণে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে, পাঞ্জাবে, উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রতিহত করার জন্য প্রধাণতঃ হিন্দু বহিরাগতদের সমন্বয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের একইভাবে আত্মনিরাপত্তার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙ্গালীরা নিরস্ত্র হওয়ায় তারা শান্তিবাহিনীর সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে। গভীর অরণ্যে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের রক্ষা করা অনেক সময়ই সেনাবাহিনীর পক্ষে সম্ভব হয়না। আমাদের সেনাবাহিনী এতো বৃহদাকার নয় যে, তারা প্রতিটি জনপদ পাহারা দিতে সক্ষম। এই অবস্থায় বসতি স্থাপনকারীদের আত্মনিরাপত্তা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই।

চাকমা সন্ত্রাসীদের আশ্রয়, অর্থ, অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির একমাত্র উৎস হল ভারত। সন্ত্রাসীরা অধিকাংশ সময়ই ভারত হতে আক্রমণ চালায়। পার্বত্য অঞ্চলের তাদের অস্থায়ী আস্তানায় তারা অতি অল্প সময় অবস্থান করে। **সন্ত্রাসীদের অবাধ যাতায়াত বন্ধ করতে হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংলগ্ন ভারতের মিজোরাম এবং ত্রিপুরা সীমান্ত জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করা একান্ত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।** কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ নিঃসন্দেহে ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ হলেও দেশের সংহতি ও আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষার জন্য এর কোন বিকল্প নেই। পার্বত্য অঞ্চলে দুস্কৃতকারীদের প্রতিহত করার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, প্রাচীর নির্মাণ-ব্যয় তার চেয়ে বেশী হবে না। এ ধরণের একটি কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে সময়ে সময়ে বেসামরিক উপজাতীয়দের ভারতে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়া, মাদকদ্রব্য পাচার ও চোরাচালানী কার্যক্রম একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। বাংলাদেশের প্রতিবাদ সত্বেও ভারত ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়ে কোন কোন পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করেছে। সুতরাং এখন বাংলাদেশ মিজোরাম-ত্রিপুরা সীমান্ত জুড়ে একই ধরণের বেড়া নির্মাণ করলে ভারতের পক্ষ থেকে বাধা আসার কথা নয়। আর বাধা আসলেও তা অগ্রাহ্য করার মতো যৌক্তিক অধিকার বাংলাদেশের আছে। এ ছাড়া সমগ্র সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে পাকা

সড়ক নির্মাণ করা জরুরী, যাতে সামরিক-বেসামরিক যানবাহণ সহজে চলাচল করতে পারে।

পার্বত্য জনগণের যৌক্তিক সমস্যা নিরসনে কাগুজে প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেসব উপজাতীয় পরিবারের সহায়-সম্পত্তি বেদখল হবার অভিযোগ রয়েছে তা যথার্থ ও নিরপেক্ষ তদন্তের পর প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তরিত হওয়া আবশ্যক। কোন উপজাতীয় যাতে বেসামরিক বাঙ্গালী, নিরাপত্তা রক্ষী কিংবা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের হাতে অত্যাচারিত কিংবা প্রবঞ্চিত না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। উপজাতীয়দের মনে এই আস্থা ও নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে যে, তারা কোনভাবেই অবিচার-অন্যায়ের শিকার হবেনা। কোন উপজাতীয় নর-নারী অকারণে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

সরকারী কার্যে নিয়োজিত উপজাতীয়দের পার্বত্য অঞ্চলে না রেখে দেশের অন্যত্র নিয়োগ করতে হবে। এর ফলে পাহাড়ী ও সমতলের জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ভাব গড়ে উঠবে। উপজাতীয়দের সমতলে বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সমতলে পুনর্বাসিত হতে ইচ্ছুক উপজাতীয়দের সরকারী খরচে বাসভবন নির্মাণ, চাকরি বা ব্যবসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ধরণের পদক্ষেপ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি আরো জোরদার হবে।

বাংলাদেশের যেকোন অঞ্চলের যেকোন শান্তিপ্রিয় নাগরিকের পার্বত্য অঞ্চলের যেকোন স্থানে অবাধে জমি কেনার, বসতি স্থাপনের, শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার, ব্যবসা-বাণিজ্য করার শাসনতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে এবং কোন অজুহাতেই এই মৌলিক অধিকার হতে বাঙ্গালীদের বঞ্চিত করা যাবেনা। পার্বত্যবাসী বাঙ্গালীদেরকে কোন অজুহাতেই অধিকারহীন অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা যাবেনা। পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রতিনিধিত্ব জনসংখ্যানুপাতে হতে হবে। পুলিশ বিভাগসহ সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে বাঙ্গালীদের চাকরি প্রাপ্তির পথে যে অন্যায় ও অমূলক বাধা রয়েছে তা অচিরেই দূরীভূত হওয়া উচিত। এ ধরণের বিধিনিষেধ ও বৈষম্য অদূর ভবিষ্যতে দেশের স্বাধীনতা ও সংহতির জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

পার্বত্য অঞ্চলের চলমান ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশ রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠন একেবারে উদ্বেগহীন এবং নির্বিকার। তাদের ধারণা পার্বত্য চট্টগ্রাম রক্ষা এবং এর সমস্যা সমাধান করার

দায়-দায়িত্ব সরকারের, অন্যান্যদের নয়। এ ধরণের মানসিকতা দায়িত্বহীনতা এবং জাতীয় সমস্যা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার শামিল। এ প্রবণতা জাতীয় স্বার্থ ও সংহতির পরিপন্থী। দলমত নির্বিশেষে সব সংগঠনকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে আরো সচেতন, সক্রিয় এবং সোচ্চার হওয়া দরকার।

পার্বত্য চট্টগ্রাম রক্ষার জন্য সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করার সময় বয়ে যাচ্ছে । পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত সমস্যা, এর রহস্য ও সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া এবং সমাধানের প্রকৃষ্ট পন্থা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা ও জনমত গঠনে দল-মত নির্বিশেষে সবারই সক্রিয় ভূমিকা থাকা দরকার। এই উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় বা দলগত কর্মসূচী ও কর্মকৌশল গ্রহণ করা উচিত। সন্ত্রাসী হামলার শিকার পার্বত্যবাসীদের পুনর্বাসনে বেসরকারী উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন। বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, পার্বত্য অঞ্চলে এমন সব সংগঠনকে আর্থিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন দানের জন্য সরকারী বেসরকারী প্রয়াস চালাতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে সবগুলো রাজনৈতিক দলগুলোকে পার্বত্য অঞ্চলে তাদের দলের শাখা গঠনে উদ্যোগী হতে হবে। এসব সংগঠন পার্বত্য অঞ্চলে ঘন ঘন সভা-সেমিনারের আয়োজন করলে পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান এক কেন্দ্রীক ও একদেশদর্শী রাজনীতি ও জনমতের অবসান হবে এবং জাতীয় জীবনের মূল স্রোতধারার সাথে পার্বত্যবাসীরা ধীরে ধীরে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে।

সাবেক মুক্তিযোদ্ধা, নিরাপত্তা বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত সদস্য, বিডিআর, পুলিশদের সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা দরকার, যারা একান্ত জরুরী মুহূর্তে সশস্ত্র বাহিনীকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে যাবে।

সরকার ভারত হতে প্রত্যাবর্তনকারী উপজাতীয় পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের জন্য যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেগুলো যথাযথরূপে বাস্তবায়ন করতে হবে। এরা যাতে কোনভাবেই হয়রানি, প্রতারণা কিংবা দীর্ঘসূত্রিতার শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেসব শরণার্থী সন্ত্রাসীদের উপদ্রবমুক্ত এলাকায় কিংবা শহরাঞ্চলে বসবাস করতে ইচ্ছে প্রকাশ করে তাদের সে সুযোগ দেয়া উচিত। সন্ত্রাসীরা যাতে কোনভাবেই প্রত্যাবর্তনকারীদের উপর কোন উপদ্রব চালাতে না পারে কিংবা তাদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ফেরত আসা শরণার্থীদের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর দিতে হবে। কেননা, এদের মধ্যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' কিংবা শান্তিবাহিনীর চর

থাকতে পারে। এরা যাতে কোনভাবেই আইন-শৃংখলার জন্য হুমকি হয়ে না দাঁড়ায় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ব্যাহত করার জন্য অথবা পুনর্বাসিতদের পুনরায় ভারতে চলে যেতে প্ররোচিত করার জন্য শান্তিবাহিনী কিংবা তাদের 'চর'রা পুনর্বাসিতদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তার দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশের নিরাপত্তারক্ষী কিংবা পার্বত্যবাসী বাঙ্গালীদের ওপর চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা চালাতে পারে। তাদের এ ধরণের অপচেষ্টা যে কোন মূল্যে ব্যর্থ করতে হবে।

সর্বোপরি, সমঝোতার নামে চাকমাদের এমন কোন ছাড় দেয়া যাবে না যাতে নিকট কিংবা সুদূর ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব কোনভাবেই দুর্বল কিংবা হুমকির সম্মুখীন হয়। কোন বহির্শক্তির চাপে নমনীয় পন্থা অবলম্বনের কোন সুযোগ নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা অবৈধ ও দখলকার শক্তি নেই যে, ছাড় দিয়ে কোনমতে সেখানে টিকে থাকতে হবে। শান্তিবাহিনীর সাথে চলমান সংলাপ ব্যর্থ হলে এবং তারা অবৈধ দাবী ও চাপ অব্যাহত রাখলে তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষিত সব সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাদের মুরুব্বী - ভারত যেভাবে নিজস্ব বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নির্মূল করছে, সে পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে পারে এমন যে কোন ধরণের প্রবণতা সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করতে হবে।

চলমান সংলাপ ব্যর্থ হলে জনসংহতি সমিতির সাথে সব ধরণের আপোষকামিতার ইতি হওয়া উচিত। এর বিপরীতে কঠোর সামরিক অভিযানই হবে একমাত্র অবলম্বন। সামরিকভাবে পর্য্যুদস্ত হলেই তারা পুনরায় নমনীয় অবস্থানে ফিরে আসবে।

জনসংহতি সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট সব ধরণের সহযোগী সংস্থা নিষিদ্ধ করে এদের কর্মতৎপরতা বন্ধ করা সময়ের দাবী। এসব প্রকাশ্য সহযোগী সংগঠনসমূহই শান্তিবাহিনী ও জনসংহতি সমিতির প্রাণ। সন্ত্রাস দমনের স্বার্থে এদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সন্ত্রাসীদের অর্থ সংগ্রহের উৎস বন্ধ করলেই তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হয়ে যাবে। চাঁদা ও টোল আদায় বন্ধ করার জন্য উপজাতীয়দের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালানো উচিত এবং এ মর্মে কড়া নির্দেশ থাকা উচিত যে, চাঁদা ও টোল প্রদান আইনতঃ দন্ডণীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। একই সাথে উপজাতীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর অবস্থান আরো জোরদার

হতে হবে, যাতে শান্তিবাহিনীর হামলা হতে জনগণকে রক্ষা করা যায়। অবাধে বাঁশ ও কাঠ কাটা অন্তত দু'বছরের জন্য বন্ধ হওয়া উচিত। কর্ণফুলী পেপার মিল ও রেয়ন মিল এবং অন্যান্য যেকোন প্রয়োজনে বাঁশ ও কাঠ কাটার স্থানে ও সেগুলো আনা-নেয়ার পথে নিরাপত্তা বাহিনীর সরব উপস্থিতি থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ও দেশ প্রেমিক একদল কাঠুরিয়াকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকেও শান্তিবাহিনীর চাঁদাবাজির বন্ধের কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তি করা যেতে পারে।

১৩টি উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে যে পর্বত-প্রমাণ বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ জরিপ হওয়া উচিত। পশ্চাদপদ উপজাতিসমূহকে উন্নত ও আধুনিক সমাজের সমপঙক্তীয় করার উদ্দেশ্যে বিশেষ আর্থিক সুবিধা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক ঘটনাবলী, এর সাথে সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক বিষয় সংক্রান্ত শ্বেতপত্র প্রকাশিত হওয়া উচিত। সেখানকার অভূতপূর্ব উন্নতি এবং সন্ত্রাসীদের মিথ্যে প্রচারণার অসারতা সংক্রান্ত তথ্যাদি দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া দরকার। বর্তমানে সন্ত্রাসীরা একচেটিয়া প্রচারের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। এর বিপরীতে বাংলাদেশ সরকারের তেমন কোন তৎপরতা নেই। এতে দেশে-বিদেশে এমন অবান্তর ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে যে চাকমাদের প্রচারণাই সত্য ও যথার্থ এবং এর বিপরীতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবাদ কারা মতো কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। ফলে বাংলাদেশ অকারণে বহির্বিশ্বে সমালোচিত ও নিন্দিত, এমনকি একঘরে হবার ঝুঁকি নিচ্ছে। চাকমা সন্ত্রাসীরা মাঝে মাঝেই বিশ্বের অন্যত্র চাকমা-সম্মেলন, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করে। অথচ বিদেশে তো দূরের কথা, স্বদেশেও সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে এ ধরণের্র তেমন কিছুই হয়না।

যেকোন ধরণের অস্ত্রবিরতি কিংবা সংলাপ অবশ্যই শর্তসাপেক্ষ হওয়া উচিত। অস্ত্রবিরতির অজুহাতে নিরাপত্তা বাহিনীকে সব ধরনের তৎপরতা ও অভিযান হতে বিরত রাখলেও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাদের তৎপরতা কোনভাবেই বন্ধ করেনি। অথচ এই সময়ে হত্যা, অপহরণ, চাঁদা আদায়সহ সব ধরণের সাংগঠনিক ও সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ রাখা আবশ্যিক হওয়া উচিত ছিল।

ভারত ও মায়ানমার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বাঙ্গালী বসতি নির্মাণ করতে হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা রোধকল্পে চীন এবং ভারত তাদের আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর ইতোমধ্যেই কট্টর দেশপ্রেমিক নাগরিকদের বসিয়ে দিয়েছে। ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের পূর্বপাশে বাংলাদেশ-সংলগ্ন ত্রিপুরা সীমান্ত ঘেঁষে যে নতুন

ঘর-বাড়ী দৃষ্টিতে পড়ে, সেগুলো ভারত সরকার কর্তৃক সরাসরি পুনর্বাসিত পরিবার, যাদের মূল দায়িত্ব হলো সীমান্ত পাহারা দেয়া।

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের প্রদত্ত বৃত্তি, চাকরী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তির কোটা প্রভৃতি ৫ বছর পর পর পর্যালোচিত হওয়া উচিত। এসব সুবিধাদি কোনভাবেই উপজাতীয়দের জন্য একচেটিয়া না হয়ে পার্বত্যবাসী বাঙ্গালীদের জন্য, এমনকি দেশের অন্যত্র বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্যও সম্প্রসারিত হওয়া উচিত। সার্বিক সুবিধা শর্ত সাপেক্ষ হওয়া বাঞ্চনীয় এবং ধীরে ধীরে এসব সুবিধা অগ্রসরমান উপজাতীয়দের পরিবর্তে কেবলমাত্র পশ্চাদপদ উপজাতীয়দের জন্য হওয়া উচিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশে নারাইছড়ি হতে সাজেক পর্যন্ত ১১৯ কিলোমিটার এবং আন্দারমানিক হতে মদক পর্যন্ত ১২৮ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তীর্ণ ভূ-খন্ডে বাংলাদেশের কোন সীমান্ত চৌকি নেই। ফলে এলাকা দুটি সঙ্গত কারণেই সন্ত্রাসীদের নিরাপদ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও আহরণ, খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান করা এবং সন্ত্রাসীদের আস্তানা স্থাপন ও বিচরণ বন্ধের উদ্দেশ্যে উল্লেখিত অঞ্চলদ্বয়ে অনতিবিলম্বে সড়ক যোগাযোগ সম্প্রসারণ করতঃ বেশ ক'টি সীমান্ত চৌকি নির্মাণ অপরিহার্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

এদেশ আমাদের সবার। এদেশকে গড়ে তোলা যেমন আমাদের দায়িত্ব, দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমি রক্ষা করাও আমাদের কর্তব্য। সে মহান কর্তব্য পালনে সামান্যতম অসতর্ক হবার সুযোগ আমাদের নেই। ■

গবেষক-সাংবাদিক জনাব জয়নাল আবেদীন ১৯৫১ সনের ২২ আগষ্ট নোয়াখালী জেলার মহতাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি. এড (১ম শ্রেনী ১ম) ডিগ্রী লাভ করেন। মেধাবী শিক্ষার্থী ও সংগঠক হিসাবে জনাব আবেদীন ১৯৬৫ সনে ছাত্র রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। অকপটতা, সততা, কঠোর শ্রম ও দায়িত্ব নিষ্ঠার কারণে অতি দ্রুত তিনি ছাত্র রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে তিনি ঐতিহাসিক ৬- দফা ও ১১-দফা আন্দোলনে ও মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৬৭ সনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নোয়াখালী জেলা শাখার সাংস্কৃতিক সম্পাদক, ১৯৬৮ সনে নোয়াখালী কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক, ১৯৬৯ সনে নোয়াখালী জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ১৯৭২ সনে নোয়াখালী জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সনে তিনি নোয়াখালী সরকারী কলেজ ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৮ সনে তাকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে এবং ১৯৬৯ সনে সামরিক আইনে দীর্ঘদিন যাবত আটক রাখা হয়।

১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে নোয়াখালী এবং নোয়াখালী জেলার পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। মুজিব বাহিনীর সদস্য হিসেবে তিনি আসামের 'হাফলং' - এ গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। 'হাফলং' - এ তার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক 'এক নদী রক্ত' লিখিত এবং মঞ্চস্থ হয়। সম্ভবত ইহাই ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে দেশগড়ার পরিবর্তে এক শ্রেণী রাজনীতিকের স্বার্থন্বেষী এবং বিদেশী শক্তির স্বার্থবাহী ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে ১৯৭৪ সনে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে তিনি ছাত্র রাজনীতি হতে সরে আসেন। সে হতে তিনি রাজনীতি হতে সম্পূর্ণরূপে দূরে অবস্থান করলেও দেশের সার্বিক স্বার্থরক্ষায় কলমযুদ্ধে লিপ্ত রয়েছেন।

১৯৭২ সনের ১১ ডিসেম্বর থেকে নোয়াখালী হতে প্রকাশিত নাজিমুদ্দিন মানিক সম্পাদিত 'দৈনিক বাংলাদেশ' (অধুনা লুপ্ত) নামক পত্রিকার মাধ্যমে তিনি সংবাদপত্র জগতে আসেন। তিনি দৈনিক 'গণকণ্ঠ' ও সাপ্তাহিক 'ইত্তেহাদ' এর নোয়াখালীস্থ প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন। 'ফ্রী-লান্স' হিসেবে তিনি ঢাকাস্থ ইনকিলাব, নিউনেশনসহ বহু সংখ্যক শীর্ষস্থানীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশ করে সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। তার রচিত রাজনীতিতে শ্রেণী সংকট (১৯৭২), জিয়া হত্যার নেপথ্যে (১৯৮৭), India Needs Veto Power (১৯৯৩) এবং অবিস্মরণীয় গ্রন্থ RAW AND BANGLADESH (১৯৯৫) দেশে-বিদেশে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। বর্তমানে তিনি একটি বিদেশী সংবাদ সংস্থায় বাংলাদেশস্থ প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত আছেন। ■